তাফসীরে সাঈদী

تفسير سعيدي

সূরা লূক্‌মান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

تَـــفْـــسِـــيْـــرِ سَـــعِـــيْـــدِىْ

তাফসীরে সাঈদী

সূরা লুকমান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com

تفسير سعيدى

তাফসীরে সাঈদী

সূরা লূকমান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

কোরআন, হাদীস, দর্শন, ইতিহাস ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের অতুলনীয় সমাবেশ ঘটেছে সূরা লূকমানের এই তাফসীরে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামের বিশাল প্যারেড ময়দানে পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কোরআন তাফসীর মাহ্ফিলে সূরা লূকমানের তাফসীর শুনে প্রায় অর্ধ শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

তাফসীরে সাঈদী- সূরা লুকমান
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০৫ সেপ্টেম্বর
প্রথম প্রকাশ-২০০৪ অক্টোবর
প্রচ্ছদঃ মাসউদ সাঈদী
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণে ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা মাত্র।

Tafsir-e-Sayedee- Sura Lookman
Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global publishing network
66 Paridhash Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Second Edition 2005-September
First Edition 2004- October
Price : Three Hundred Tk Only
Twenty Doller (U.S.) Only
Fifteen Pound Only

www.pathagar.com

ভূমিকা

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ-সূরা ফাতিহার তাফসীর, আমপারার তাফসীর ও মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সবথেকে ছোট সূরা- সূরা আল-আসরের তাফসীর গ্রন্থাকারে মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে পেশ করার পর সূরা লূকমানের তাফসীর গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো। পৃথিবীর সবথেকে বিশাল তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামে। পাঁচদিন ব্যাপী উক্ত তাফসীর মাহফিলে মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা লূকমান থেকে ১৯৯৯ সনে দুই রুকুর তাফসীর পেশ করা হয়েছিলো। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর নানা ধরনের তথ্য ও তত্ব সংযোজন করে সূরা লূকমানের দুই রুকুর তাফসীর গ্রন্থাকারে মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে পেশ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকর আদায় করছি।

কোরআনের তাফসীর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন। কোরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দিয়েই করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টি এক আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আয়াতে সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে। মহান আল্লাহর রহমতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থানুসারে আমি কোরআন দিয়েই কোরআনের তাফসীর করার চেষ্টা করে থাকি। ভিন্ন বিষয় যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে।

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা খুবই পছন্দ হয়েছিলো এবং তিনি পবিত্র কোরআনে তা উল্লেখ করেছেন। হযরত লূকমানকে আল্লাহ তা'য়ালা যে সূক্ষ্ম জ্ঞান দিয়েছিলেন, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে- তা সর্বোত্তম পন্থায় সন্তানকে বুঝিয়েছেন। পিতা যখন তার সন্তানকে আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালাও এর বিনিময় হিসেবে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সন্তানকে সতর্ক করলেন।

সূরা লূকমানের আলোচ্য দুই রুকুতে মহান আল্লাহ এক, একক, ও অবিভাজ্য, তিনি অংশীদারহীন, তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার, পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের চরিত্রে যেসব উৎকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটলে মানুষ প্রকৃত অর্থেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসনের সম্মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, শোষণ, বৈষম্যহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়তে সক্ষম হয় এবং সেই সাথে মানুষ পরস্পর পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হতে পারে, এসব উপাদান-উপকরণ সম্পর্কে সূরা লূকমানের আলোচ্য দুই রুকুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমি আমার সাধ্যানুসারে এসব দিক সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

প্রায় চার যুগ অতিক্রান্ত হতে চললো, আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে কোরআনের কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন। প্রায় দুই যুগ পূর্ব থেকেই আমার শুভাকাংখী মহল বিশেষ করে আল

www.pathagar.com

কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর ডাইরেক্টর, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক ও অমর শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) কর্তৃক রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এর অনুবাদক এবং আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হাফেজ মাওলানা মুনির উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব আমাকে তাগিদ দিয়ে আসছেন কোরআনের তাফসীর গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য। আমার মনেও প্রবল আকাংখা ছিল কোরআন থেকে যে কথাগুলো মহান আল্লাহ তাঁর এই গোলামকে বলার তাওফীক দিয়েছেন, তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু আমার নিদারুণ ব্যস্ততার কারণে মনের আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেয়া ইতোপূর্বে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে আমার শুভাকাংখী মহলের তাগিদ বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই তাফসীর গ্রন্থে সূরার বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে হাফেজ মাওলানা মুনির উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব কর্তৃক অনুবাদ কৃত 'কোরআন শরীফের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' থেকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে দান করুন এর সর্বোত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

ময়দানের বক্তব্য বহুলাংশে ময়দানেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আলোচিত বিষয় স্থায়ীভাবে পৌঁছে দেয়ার মানসে শব্দধারণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে বর্ণমালায় সুন্দর ও সুপাঠ্য করে সাজিয়েছে আমার সন্তানতুল্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক আব্দুস সালাম মিতুল। শুধু শব্দ ধারণ যন্ত্রের সাহায্যই নয়-সে আমাকে ছায়ার মতোই অনুসরণ করে আমার সফর সঙ্গী হিসাবে আমার পাশে অবস্থান করে এবং বাসায় এসে আমার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহন করে পান্ডুলিপি রচনা করেছে এবং পরবর্তীতে আমি প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করেছি।

আমার নিদারুণ ব্যস্ততা, দেশে অনুপস্থিতি ও সময়ের স্বল্পতার কারণে এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের প্রতি যতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। এ কারণে মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোনো তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তা আমাকে জানানোর জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করছি। ভুল-ত্রুটি সংশোধনে যে কোনো পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণীয়। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। অনুলিখক এবং প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

www.pathagar.com

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর
তাফসীরে সাঈদী
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

❑ আমাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে তার নাম 'তাফসীরে সাঈদী'। নাম দেখে যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, এর সাথে বিশেষ একজন ব্যক্তির নাম জড়িত আছে।

❑ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' হাতে নিয়ে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে, এর সাথে আল্লামা ইবনে কাছীরের নাম জড়িত, 'তাফসীরে ওসমানী' নিয়ে আমরা এর অমর রচয়িতা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদকে অনুভব করি, তেমনি 'তাফসীরে সাঈদী' দেখেও আমরা বুঝতে পারি এই গ্রন্থের সাথে জড়িত আছে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী এদেশের মানুষের প্রিয় মোফাস্‌সের আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

❑ এ বছরের প্রথম দিকের ঘটনা, 'তাফসীরে সাঈদী' প্রথম খণ্ড সূরা 'আল ফাতেহা' তখন সবে মাত্র বাজারে বেরিয়েছে। মোহ্‌তারাম মওলানা কোরআনের এই অমূল্য তোহফাটি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে কেমন লাগলো-জানাতে বললেন। কোরআনের পাঠশালায় তাফসীরের একজন নগণ্য ছাত্র হওয়ার কারণে এই সুবাদে মোহ্‌তারাম মওলানার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের ভালোবাসার কারণে তার রচিত তাফসীরের প্রতি আমার আগ্রহ থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক, আর এ স্বাভাবিক আগ্রহের কারণেই বাসায় এসে তাফসীর খণ্ডটি পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে আমি নিজেই যেন স্মৃতির পাতায় হারিয়ে গেলাম......।

❑ দিন তারিখ ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে সময়টা যে ১৯৭৩ সালের শেষের দিককার হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ আমি তখন খুলনা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের নির্বাহী সম্পাদক। একদিন আমার এক সহকর্মী এসে আমাকে খবর দিলেন আজ আসরের পর শহরের টুটপাড়া জামে মসজিদে একটি তাফসীর মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হবে, শহরের গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত থাকবেন। জানতে চাইলাম কোরআনের তাফসীর পেশ করবেন কে-তিনি বললেন, মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। সহকর্মী বন্ধুটি আমাকে বিশেষভাবে সেখানে হাযির থাকার অনুরোধ জানালেন। আমিও যথারীতি সে মাহ্‌ফিলে হাযির হলাম। সম্ভবত সেখানেই আমি মওলানা সাহেবকে সর্বপ্রথম দেখেছি। যদ্দুর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেক আমি মওলানা সাহেবের মুখে কোরআনের তাফসীরও শুনেছি।

www.pathagar.com

❑ গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে আমি ও আমার স্ত্রী বিশিষ্ট লেখিকা মোহ্তারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাণী নিয়ে কানাডার শিল্প নগরী টরেন্টো সফরে গিয়েছিলাম। মাহ্ফিল শেষে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জীবন্ত চেহারা দেখার জন্যে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। নায়াগ্রা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট শহর আছে-নাম হ্যামিলটন, প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে আমাদের কিছুক্ষণের যাত্রা বিরতি করার কথা। বিরতির এই পর্বে আশ-পাশ থেকে কয়জন বন্ধু-বান্ধব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় মওলানা সাঈদী সাহেবের তাফসীর মাহফিলের প্রসঙ্গ এলো। তারা বললেন, পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের এই দূরতম শহরে অবস্থিত প্রায় সব কয়জন বাংলাদেশী কোনো না কোনোভাবে তাঁর তাফসীর শুনেছেন। কেউ সামনে বসে, কেউ টিভির পর্দায়, কেউ অডিওর ফিতায়, কেউবা আবার ভিডিও ও সিডির স্ক্রীনে। তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কথা তারা অনেকেই প্রথম তার অডিও ভিডিও থেকেই শুনেছেন বলে আমাদের বললেন।

❑ ১৯৭৩ সালের খুলনার টুটপাড়া জামে মসজিদ থেকে ২০০১ সালে কানাডার হ্যামিলটন শহরে অবস্থিত আমার বন্ধুর ড্রয়িং রুম পর্যন্ত-সময়ের হিসেবে তা ৩ দশকের মতো, ভৌগোলিক দূরত্বে তা প্রায় ১৪ হাজার মাইল। এতো বিশাল সময় ধরে এই বিস্তৃত ভূখন্ডে কোরআনের ভূবনে যার একচ্ছত্র উপস্থিতি বিরাজমান তিনি হচ্ছেন আমাদের কালের একজন শীর্ষস্থানীয় কোরআনের মোফাস্সের আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আজ মুসলিম মিল্লাতের একজন বড়ো মাপের আলেমে দ্বীন ও বাংলাদেশের একজন সুদক্ষ পার্লামেন্টারীয়ান, তার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা আজ দেশে-বিদেশে অনেকের কাছেই ঈর্ষার বস্তু।

❑ ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান, ২০০০ সালে একই তাফসীরের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে 'কোরআন শরীফের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' প্রকল্পের দু'দিন ব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার এ বিপুল জনপ্রিয়তা দেখতে পেয়েছি। হাজার হাজার মানুষ কিভাবে একজন মানুষের কথা শুনার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারে তা শুধু বাস্তবে দেখেই অনুভব করা যায়। এই বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এসব অনুষ্ঠানে আমি একান্ত কাছে থেকে কোরআনের প্রতি তার অগাধ ভালবাসাও লক্ষ্য করেছি। একথা বলা আমার মনে হয় আজ মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্য কোনো আলেমে দ্বীন ও রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যেই এতো জনপ্রিয়তা ও এতো পরিমাণ ভালোবাসা এক সাথে জোটেনি। এদিক থেকে নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ইতিহাসের এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

❑ হ্যাঁ, আমি আপনাদের যে গ্রন্থের কথা বলছিলাম তা হচ্ছে 'তাফসীরে সাঈদী'। বাংলা ভাষায় তাফসীরের ক্রমিক ধারায় যার বয়েস নিতান্ত কম, সম্ভবত মাস চারেকের বেশী নয়। এই চার মাস সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থটির ৩টি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। এতো স্বল্প সময়ে কোনো বইয়ের এতো বিপুল গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের কোরআন কেন্দ্রিক সাহিত্যে একটি বিরল ঘটনা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১৭ সূরা লুকমান
২৩ বাংলা অনুবাদ
২৫ প্রথম রুকুর তাফসীর
২৫ হূরুফে মুক্বাত্বাআ'ত
২৬ জ্ঞানগর্ভ কিতাব
৩২ জ্ঞানগর্ভ কিতাব যাদের পথনির্দেশনা

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩৪ মুহসিনীনদের প্রধান তিনটি গুণ
৩৫ প্রথম গুণ– নামায
৪৩ নামায কি ও কেনো
৫১ আল্লাহর গোলামী ও নামায
৫৪ নামায অপরাধ থেকে বিরত রাখে
৫৭ দ্বীনের কাঠামোয় নামাযের গুরুত্ব
৬৩ প্রভাবহীন নামায
৬৬ নামাযের মূল উদ্দেশ্য
৭১ নামায আদায়ের পূর্ব শর্ত
৮০ নামাযের সূচনাতে কি ওয়াদা করা হচ্ছে?
৮৩ নামাযে কি বলা হচ্ছে?
৮৮ নামাযে সূরা ও অন্যান্য দোয়া-কালামে কি বলা হচ্ছে?
৯৫ নামাযে কি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?
৯৮ নামায সাংগঠনিক জীবনের বাস্তব প্রশিক্ষণ
১০৮ নেতা নির্বাচনে নামাযের ভূমিকা
১১১ নামায সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়
১১৭ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নামাযের গুরুত্ব
১২৬ নেতৃত্বের গুণাবলী ও নামায

তৃতীয় অধ্যায়

১২৯ যাকাত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ
১৩২ যাকাত কি ও কেনো
১৩৮ যাকাত দানের উদ্দেশ্য
১৪৩ যাকাত বন্টনের খাতসমূহ
১৪৫ যাকাত নতুন কোনো বিধান নয়
১৫০ যাকাত ঈমানের মানদন্ড
১৫৫ তৃতীয় গুণ– আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
১৫৫ এই সফলতা ব্যর্থতার ধ্বংস গহ্বর
১৫৭ মনোমুগ্ধকর ব্যর্থ কাহিনী
১৬০ নৃত্য-গীত ও বাদ্যযন্ত্র
১৬৩ আত্ম-সমাহিত করার উপকরণ
১৬৬ গান-খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের সীমারেখা
১৭২ যেনো তাদের কান দুটো বধির
১৭৩ যদি তারা ফিরে আসে
১৭৭ আকাশ রয়েছে শূন্যমার্গে

পঞ্চম অধ্যায়
১৮০ প্রথম রুকুর সাথে দ্বিতীয় রুকুর যোগসূত্র
১৮১ হযরত লুকমান পরিচিতি
১৮৩ সুক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয়
১৮৭ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিজেরই কল্যাণ
১৯২ শিরক হলো সবথেকে বড় জুলুম
১৯৬ শিরক ও তাওহীদ সম্পর্কে জানার মাধ্যম
২০২ প্রয়োজন বিচারক সুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি
২০৬ তাওহীদ ও শিরক
২০৮ তাওহীদের প্রথম পর্যায়
২১৩ তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায়
২১৮ আল্লাহর অবস্থান ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপক ধারণা
২৩০ তাওহীদের তৃতীয় পর্যায়
২৪২ তাওহীদের চতুর্থ পর্যায়
২৪৪ আইন-বিধান প্রণয়ন ও তাওহীদ
২৪৯ আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ
২৫৩ শরীক বা অংশীদারিত্বের প্রয়োজন নেই
২৫৭ শিরক সবথেকে বড় জুলুম হবার কারণ
২৬২ তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার

ষষ্ঠ অধ্যায়
২৬৪ অধিকার সচেতন করা আল্লাহর নিয়ম
২৬৮ পিতামাতার অধিকার
২৭১ পিতামাতার সম্মুখে সন্তানের বিনীত আচরণ
২৭৩ সর্বপ্রথমে আল্লাহর হক কেনো আদায় করতে হবে
২৭৮ গর্ভধারিণী মাতার অধিকার
২৮১ মায়ের নেক দোয়া ও অসন্তুষ্টি
২৮৩ পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা
২৮৮ সন্তানের অর্থ-সম্পদ ও পিতামাতা
২৯০ পিতামাতার অবাধ্যতা ঘৃণ্য অপরাধ
২৯১ মৃত পিতামাতার অধিকার
২৯৪ ইসলাম বিরোধী পিতামাতার অধিকার

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

৩০১ মুসলিম পিতামাতা ও সন্তান

৩০৫ পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার

৩০৭ শিশু সন্তানের প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা

৩১১ আকীকা-পুত্র সন্তানের খাত্না ও নামকরণ

৪১৬ সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৩২৪ উপহার দেয়ায় ও আদর-ভালোবাসায় সমতা রক্ষা

৩২৮ সন্তানের প্রয়োজন পূরণ পিতামাতার দায়িত্ব

৩৩৩ কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর নে'মাত

৩৩৯ সন্তান-সন্ততির বিয়ের অধিকার

অষ্টম অধ্যায়

৩৪১ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি একত্রিত করবেন

৩৪৭ প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব অর্পণ

৩৫২ স্রোতের বিপরীতেই বীরের সংগ্রাম

৩৬২ অহঙ্কার বশে কাউকে অবজ্ঞা করোনা

৩৬৬ অহঙ্কার সবথেকে ঘৃণিত গুণ

৩৭০ পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না

৩৭৫ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা

৩৭৯ উপদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি

৩৮৪ তরুণ-যুবকদের জন্য সর্বোত্তম উপহার

৩৯২ সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জী

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ
الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ
مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَه اٰنَاءَ
الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আল্লাহ! আমায় কবরে আমার একাকীত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে
কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ! কোরআন দিয়ে
তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম,
নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ! আমি এর যা
কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু
আমি–আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তার জ্ঞান তুমি
আমায় প্রদান করো, তুমি আমাকে দিবানিশি এর
তিলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের
মালিক! তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে
চূড়ান্ত দলিল বানিয়ে দিয়ো।
আমীন ! আমীন !!

www.pathagar.com

❑ 'তাফসীরে সাঈদী'কে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের এক সুবিন্যস্ত নির্যাস বলা যায়। তার এই বিশাল জ্ঞান কোষের সূচনা পর্ব হচ্ছে সূরা আল ফাতেহা। ৫২০ পৃষ্ঠা জুড়ে সূরা আল ফাতেহার যে বিষদ তাফসীর তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন সত্যিকার অর্থে তা শুধু তার জন্যেই মানায়। আমাদের সময়ের অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থগুলোর সাথে এর মূল্যায়ন করলে এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সহজেই একজন পাঠকের সামনে ভেসে উঠবে। একজন নিষ্ঠাবান পাঠক যখন এই তাফসীরের পাতায় কোরআনের মর্মার্থ খুঁজতে থাকবেন তখন তার মনে হবে বিজ্ঞ মোফাস্সের বুঝি নিজেই তার সামনে বসে তার কাছে কোরআনের দরস পেশ করছেন। মূল তাফসীরকারকের সাথে তাঁর পাঠকের এ সরাসরি সম্পর্কের কারণেই এ তাফসীরের প্রতিটি বর্ণনাকেই পাঠকের কাছে জীবন্ত মনে হবে। সে কারণেই কোরআনে বর্ণিত দৃশ্যগুলো ও কোরআনে বর্ণিত সে দৃশ্যের চরিত্রগুলোকে এখানে আর ইতিহাসের বিষয় বলে মনে হয় না। ইতিহাসের এ বিষয়গুলোকে অতীতের ঘটনা থেকে একটি চলমান চলচিত্রে উপস্থাপন করার এ দুরূহ কাজটি, এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। এটা আসলেই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পাদনের জন্যে 'তাফসীরে সাঈদী' দীর্ঘদিন ধরে এখানকার তাফসীর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রাখবে।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রায় ৪ দশক ধরে কোরআনের চর্চা করছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে কোরআনের তাফসীর পেশ করে আসছেন। বাংলাদেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের শত শত শহর বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষদের সামনে তিনি কোরআনের কথা পেশ করছেন। মনে হয় আজ গোটা পৃথিবীতে এমন একটি জনপদও খুঁজে বের করা যাবে না যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা তাঁর সুললিত কণ্ঠে কোরআনের তাফসীর শুনেননি, কিংবা তারা তাঁর তাফসীরের কোনো অডিও ভিডিও দেখেননি।

❑ গত চার দশক ধরে তাঁর লক্ষ কোটি ভক্তরা তাফসীর মাহ্‌ফিলের শুধু অডিও ভিডিও ভিসিডিই দেখে আসছেন। তারা এখন 'তাফসীরে সাঈদীর' পাতায় তাঁকে এক নতুন রূপে দেখতে পাবেন। যে মানুষটির কণ্ঠের সাথে তারা এতদিন ধরে পরিচিত ছিলেন তারা এখন তাঁর তাফসীরের পাতায় পাতায় অর শানিত লেখনীর গভীর আবেদনের সাথেও পরিচিত হতে পারবেন। আমি একথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর যাদুময় কণ্ঠের মতো তাঁর লেখনীও একজন পাঠককে কোরআনের প্রেমে আকৃষ্ট করতে পারবে।

❑ হাজার বছরের আমাদের তাফসীর শাস্ত্র, 'তাফসীরে তাবারী' থেকে 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এ এক সুদীর্ঘ পথ। এ পথের সর্বত্রই কোরআনের মহান তাফসীরকারকরা নিজেদের জ্ঞানদীপ্ত যোগ্যতা দ্বারা কোরআনকে মানুষের কাছে পেশ করেছেন। আরব-আজম ও পূর্ব পশ্চিমে যেখানেই কোরআনের যে তাফসীরটি প্রকাশিত হয়েছে তার সবকয়টিই ছিল এক একটি নতুন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এর প্রত্যেকটি তাফসীরের রয়েছে আবার একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আর তা হচ্ছে সে তাফসীরগুলো সে কালের প্রয়োজন পূরণ করতে পুরোপুরিই সক্ষম হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় কালের আবর্তনের সাথে যুগ ও জগতের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আমাদের তাফসীরকারকরা এগিয়ে গেছেন। কোরআনকে প্রিয় নবীর হাদীসের আলোকে বুঝার প্রয়োজনে 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' রয়েছে। 'ফেকার' প্রয়োজন পূরণের জন্যে রয়েছে 'জাওয়ামেউল আহকাম'। কোরআনের

www.pathagar.com

ভাষা ব্যাকরণের সৌন্দর্যের প্রয়োজনে রয়েছে তাফসীরে 'কাশশাফ' ও বায়যাভী'। মূলত এর সবকটিই ছিল যুগের প্রয়োজন। আবার কোরআনকে ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে বুঝার জন্যে এসেছে 'তাফহীমুল কোরআন' ও 'তাদাব্বুরে কোরআন'। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কার উদ্ভাবনীর আলোকে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের জবাবের জন্যে এসেছে সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'। আসলে এর প্রতিটি তাফসীরই ছিল আধুনিক, কারণ এগুলো সে যমানায় সমস্যাকে সামনে রেখেই কথা বলেছে।

❑ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের কালে এসে পৃথিবী অতীতের সব কয়টি সময়ের চাইতে বেশী জটিল হয়ে পড়েছে। আবু জেহেল আবু লাহাবদের শেরকী আচরণকে এ কালের মোশরেকরা বিজ্ঞান ও যুক্তির লেবাস পরিয়ে পেশ করছে, মানবীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এদের হাতে পড়ে আজ যেন নিজেই চলার পথই হারিয়ে ফেলেছে। গোটা দুনিয়া জাহানে আজ যখন মানবীয় চিন্তা দর্শনের ভয়াবহ আকাল দেখা দিয়েছে, তখন আল্লাহর বান্দাহদের সামনে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যাকে পেশ করার জন্যে সাহসী ও যোগ্য বান্দাদের কলম নিয়ে এগিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমাদের কাছে 'ইবনে কাছীর' আছে, আমাদের কাছে 'তাফহীমুল কোরআন' ও 'ফী যিলালিল কোরআন' আছে, তাই আর নতুন তাফসীরের প্রয়োজন নেই'-আমি ব্যক্তিগতভবে এমন মতবাদে বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ তায়ালা এ যমীনে মানুষদের পাঠিয়ে তার উন্নতি ও উৎকর্ষের ধারাকে স্থবির করে রাখেননি, আর রাখেননি বলেই এখানে প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও চিন্তা-দর্শনে নতুন নতুন জিনিস এসে জমা হচ্ছে। আমরা যদি আজ আল্লাহ্র কোরআন দিয়ে এসব নতুন নতুন জিনিসের মোকাবেলা করতে না পারি তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমরাও আল্লাহর কেতাবকে বাইবেলের মতো বাস্তবতা বিবর্জিত একটি সেকেলে গ্রন্থে পরিণত করে ফেলবো।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দেশ-জাতির এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তাফসীর লেখার কাজে হাত দিয়েছেন, এটা আমাদের জন্যে একটি আশা ও আনন্দের সংবাদ, এ কাজটি সম্ভবত তাঁর আরো আগেই করা উচিৎ ছিলো। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' 'তাফসীর ফী যিলায়িল কোরআন' এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার সময়ই আমি তাঁকে এমনি একটি মৌলিক তাফসীর রচনা করতে অনুরোধ করেছিলাম, সেই থেকে গত ছয় সাত বছরে আমি তাঁর কাছে অসংখ্যবার এই একই অনুরোধ জানিয়েছি। এক পর্যায়ে আমি তাঁকে আরবী কবিতার এই বিখ্যাত পংক্তিটি উল্লেখ করে বলেছি, 'মান হাফেযা শাইয়ন ফাররা, ওয়া মান কাতাবা শাইয়ান কাররা' (কেউ যদি কিছু জিনিস মুখস্ত করে রাখে, দেখা যায় কালের আবর্তনে এক সময় তা হারিয়ে যায়, আর কেউ যদি সেই জিনিসটি লিখে রাখে তাহলে তা স্থায়ীভাবে চিরদিনের জন্যে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)। আমি যখনি এ কথাগুলো তাকে বলতাম তখন তিনি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মৃদু হেসে নিজের অক্ষমতার কথা বলতেন, কিন্তু তাঁর এ অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে আমার এমনি ধরনের একটি কাজের প্রত্যাশা ছিল। আজ গোটা দেশ ও জাতির সাথে আমিও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যাশার মৃত্যু হতে দেননি। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আমাদের সবার দোয়া ও কামনা যে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে আজ বিশাল তাফসীর রচনায় তিনি হাত দিলেন তা অচিরেই সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছুক, পথ যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো তাঁর পাথেয় যদি লোভনীয় হয় তাহলে তার দূরত্ব এমনিই কমে আসে।

www.pathagar.com

❑ পাঠকদের অনেকেরই উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোফাসসের মওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত তাফসীর 'তরজুমানুল কোরআন-'এর সাথে পরিচয় থাকার কথা। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এই তাফসীরের 'উম্মুল কিতাব' নামে সূরা ফাতেহার তাফসীর প্রকাশ করেছিলেন, 'উম্মুল কিতাব' উর্দু সাহিত্যে কোরআন গবেষণার ক্ষেত্রে এমন একটি যুগের সূচনা করেছিল যার প্রয়োজন মনে হয় সময়ের ব্যবধানে কখনো শেষ হয়ে যাবে না।

❑ এই তাফসীরের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আল্লামা সাঈদী এক জায়গায় বলেছেন, তার মুখ থেকে সূরায়ে ফাতেহার এই তাফসীর শুনে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রায় অর্ধশত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেখানে তাঁর মুখের কথা শুনে অমুসলিমরা মুসলমান হলেন সেখানে তার লিখিত তাফসীর পড়ে আমরা কি খাঁটি মুসলমান হতে পারি না?

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তাফসীর থেকে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তাঁর এ সাধনা কোরআনের অমূল্য কীর্তিকে কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছে দেবে বলে আমরা আশা করি।

❑ টলমল নদীর উচ্ছল রূপ যেমন মাঝিকে তীরের কথা ভুলিয়ে দেয় তেমনি 'তাফসীরে সাঈদী'ও আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে তার অন্যান্য প্রসঙ্গ ভুলিয়ে রেখেছিলো। তাছাড়া তাঁর এ মহান গ্রন্থের ওপর আমি জানি আরো অনেকেই লিখবেন, আমি তো সূচনা করলাম মাত্র। আমি চেয়েছিলাম আমার এ 'সূচনা' শুধু সূচনা হয়েই থাক। ❑

(২০০২ সালের ২৩শে মে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)

www.pathagar.com

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

আমি এ কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি, এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা ক্বামার-৪০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ

وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ-وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ-وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ

هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ-

**এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে।
যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে।
যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায়
বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান
জানিয়েছে, সে সহজ-সরল
পথের দিকে আহ্বান
জানিয়েছে।**

www.pathagar.com

সূরা লুকমান

পবিত্র কোরআনের সূরা নং- ৩১

মক্কায় অবতীর্ণ

শানে নুযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় ঃ আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় রুকুতে প্রাচীন যুগের লুকমান নামক এমন একজন মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি নবী বা রাসূল ছিলেন না বটে, কিন্তু পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে- স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে সেই স্বচ্ছ ধারণানুযায়ী তিনি স্বয়ং জীবন পরিচালনা করতেন, নিজের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে পরিচালনা করতেন এবং সাধারণ মানুষকেও সেই মহাসত্যের পথ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন। শিরক্ মুক্ত জীবন-যাপনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন, সৃষ্টি হিসাবে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে জীবন-যাপনের ধরন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যতামূলক আচরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি তাঁর সন্তান ও অন্যান্য লোকদেরকে যে জ্ঞানগর্ভ নসিহত করতেন, তা সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্য সর্বকালে ও সর্বযুগের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়। আলোচ্য সূরায় যে কয়টি কারণে লুকমান নামক মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লেখিত কারণসমূহ তার মধ্যে অন্যতম। এ কারণেই এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'লুকমান।'

আলোচ্য সূরাটি মক্কার ঠিক সেই পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপরে অত্যাচার-নির্যাতনের সর্বাত্মক সয়লাবের সূচনা হয়েছিলো বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত লোমহর্ষক নির্যাতনের প্লাবন আছড়ে পড়েনি। সাধারণভাবে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হতো, উপদেশ দেয়া হতো, ক্ষেত্র বিশেষে প্রহার করাও হতো, ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করা হতো, তাদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হতো, রাস্তা-পথে, জনসমাবেশে অপমান করা হতো, আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কের ধূয়া তুলে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করা হতো। মানুষকে তাওহীদী আলোর পৃথিবী ত্যাগ করে শিরকের পূতিগন্ধময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য করার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করা হতো।

কোরআনের গবেষকগণ মন্তব্য করেন, সূরা আনকাবুত ও সূরা লুকমান সমকালীন পরিবেশে ও একই সময়ে অবতীর্ণ করা হয়েছিলো। তবে অধিকাংশ গবেষকদের মতামত হলো, সূরা লুকমান প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকাল অতিবাহিত হয়ে তা এক বিশেষ অবস্থার মোকাবেলা করছিলো, চারদিক থেকে ইসলামী আদর্শকে মিটিয়ে দেয়ার লক্ষ্য প্রবল বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠছে এবং মুসলমানদের ওপরে নির্যাতনের প্রাথমিক কার্যক্রম ইসলাম বিরোধিরা শুরু করে দিয়েছে। তবে তখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপরে বিপদ-মুসিবত ও নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েনি বা চূড়ান্ত পর্যায়ে অত্যাচার শুরু হয়নি।

www.pathagar.com

অপরদিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী কার্যক্রম ক্ষণিকের জন্যও থেমে থাকেনি। বিরোধিতাকারীদেরকে হতবাক করে দিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রমও ক্রমশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। প্রতিদিনই কোনো গোত্রের বা পরিবারের কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে শামিল হওয়ার ধারাবাহিকতা জারী ছিলো। এই সূরার বিষয় বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে এ কথা অনুভব করা যায় যে, এ সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের দলে তরুণ আর যুবকদের সংখ্যাই ছিলো ভারী। শিরক আর পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা ও অসরতা উপলব্ধি করে যারা শির্ক-মূর্তি, মানুষের বানানো আইন-কানুন ও প্রচলিত ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ ত্যাগ করে নির্ভেজাল তাওহীদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামী করার জন্য দৃঢ় মনোভাব পোষণ করছিলো, তারা সফলতা অর্জন করবে বলে এই সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে।

অপরদিকে যারা শির্ক-মূর্তিপূজা, মানুষের বানানো আইন-কানুন ও প্রচলিত রসম-রেওয়াজের অনুসরণ করছিলো, তাদের ব্যর্থতা ও শির্ক এবং প্রচলিত রসম-রেওয়াজের অসারতা-অযৌক্তিকতা সম্পর্কে এই সূরায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ অজ্ঞতার কারণে যেসব ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে আসছে, তা ত্যাগ করে আমার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ তোমাদের সামনে পেশ করছেন, তা গ্রহণ করো। আমার রাসূল তোমাদেরকে যে আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সে আদর্শের সততার সাক্ষ্য দিচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগৎ এবং তোমাদের দেহ কাঠামো। মাথার ওপরে উন্মুক্ত বিশাল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, কোনো ধরনের স্তম্ভ ব্যতীতই বিশাল আকাশকে তোমাদের জন্য ছাদ হিসাবে স্থির রাখা হয়েছে।

সৃষ্টি জগতের সমস্ত কিছুই আমার রাসূল ও তাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা বিধানের সততার সাক্ষ্য বহন করছে। আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি। আমার রাসূল তোমাদেরকে যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, এটা কোনো নতুন আহ্বান নয়– ইতোপূর্বেও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে আমার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং আমার রাসূলের আহ্বান মোটেও নতুন কিছু নয় এবং তিনি তোমাদেরকে কেনো অপরিচিত পথের দিকে ডাকছেন না।

তোমরা স্মরণ করো ঐ ব্যক্তির কথা, যিনি তোমাদের কাছে লুকমান নামে পরিচিত। যাঁর জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধির কাহিনী তোমাদের কাছে একান্তভাবেই পরিচিত এবং তোমরা পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর বলা কথা উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করে থাকো। তোমাদের মধ্যে যারা কাব্য প্রতিভার অধিকারী এবং যারা বাগ্মী, তারা প্রায়ই সেই লুকমানের কথা বলে থাকে। তোমরা যে লুকমানের কথা প্রায়ই বলে থাকো, সেই লুকমানের চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনধারা সম্পর্কে কখনো ভেবে দেখেছো কি? তিনি জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন্ নিয়ম নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করতেন? যে নিয়ম-নীতি ও আদর্শের দিকে তোমাদেরকে আমার

www.pathagar.com

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানাচ্ছেন, সেই একই নিয়ম-নীতি ও আদর্শের কথা তোমাদের সেই পরিচিত লুকমান একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতেন, জনগণের মাঝে সেই আদর্শ প্রচার করতেন এবং তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানাতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের আকীদা ভিত্তিক জীবন-যাপনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তখন শির্কের অন্ধ পূজারীরা তাওহীদের আলোকিত জগৎ থেকে মানুষকে শির্কের অন্ধকারের দিকে টেনে হিঁচড়ে নেয়ার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সূরা অবতীর্ণ করে তাওহীদের যৌক্তিকতা ও শির্কের অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। যদিও সম্পূর্ণ সূরাটির মধ্যেই মানুষকে তাওহীদের দিকে আকর্ষণ করার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়, তবুও বক্তব্যের দিক থেকে এই সূরাটির চারটি রুকুকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম রুকুর প্রথম অংশে আলোচনা করা হয়েছে, ঐ জ্ঞানগর্ভ-বিজ্ঞানময় কিতাব সম্পর্কে- যে কিতাব মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের প্রতি মানব জাতির হিদায়াতের লক্ষ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব থেকে কোন্ শ্রেণীর লোকজন হিদায়াত লাভ করতে সমর্থ হবে।

এরপর বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে এমন শ্রেণীর লোকজন রয়েছে, যারা হিদায়াতের কিতাব ত্যাগ করে এমন সব অর্থহীন বিষয় নিয়ে মেতে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে ভ্রান্ত পথ তথা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়। তবে যারা এসব অর্থহীন বিষয় বস্তু থেকে নিজেকে হেফাজত করে তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে, তারাই সফলতা অর্জন করবে এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করবেন বলে অকাট্য ওয়াদা করেছেন। তাওহীদের আকীদা ভিত্তিক জীবন পরিচালনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীকে তোমাদের বসবাসের উপযোগী করে গড়েছি আমি এবং তোমরা যা কিছু ভোগ করে নিজেদেরকে টিকিয়ে রেখেছো, তা সব আমারই সৃষ্টি। সুতরাং আমার দাসত্ব ত্যাগ করে তোমরা যা মনগড়া যেসব কল্পিত শক্তির দাসত্ব করছে, তারা কি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম?

এরপর দ্বিতীয় ভাগে লুকমান নামক সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কথা আলোচনা করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, লুকমান নামক যে জ্ঞানী ব্যক্তির কথা তোমরা এবং তোমাদের কবি ও বাগ্মীগণ প্রায়ই উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করে থাকো, তিনিও একনিষ্ঠভাবে তাওহীদ ভিত্তিক জীবন-যাপন করতেন এবং মানুষকে তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানাতেন। লুকমান শুধু লোকদেরকেই তাওহীদ ভিত্তিক জীবন-যাপন করার আহ্বান জানাতেন না, তিনি স্বয়ং যেমন তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতেন তেমনি নিজ পরিবারের সদস্যদেরকেও অনুরূপ জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে পৃথিবীর সমস্ত নে'মাত মানুষের অনুগত ও বশীভূত করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঐ সকল লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মা'বুদের পূজা-আরধনা করে– এরা নির্বোধের মতো মহান আল্লাহর একত্ব, তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক প্রশ্ন এবং বিতর্ক করে। এরা কোনো ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীতই পূর্ব পুরুষের ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজ অনুসরণ করে ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এরপর রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য তথা গোটা সৃষ্টি জগতের কলা-কৌশলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিশ্বাসী ও শিরকে নিমজ্জিত লোকদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের প্রতিপালকের অবাধ্যতা প্রদর্শন করার কারণে প্রতিপালক তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হতে পারেন। আর প্রতিপালক যদি ক্রোধান্বিত হন, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ উন্মুক্ত থাকবে না। সেই বিচার দিবস সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, যেদিন কোনো আপনজনই কাজে আসবে না। পরিশেষে বলা হয়েছে, তোমরা যারা আপন মনিবকে ত্যাগ করে মনগড়া মনিবের দাসত্ব করে যাচ্ছো, প্রকৃত পক্ষে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন তিনি– যিনি যাবতীয় দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

www.pathagar.com

সূরা লুকমান-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৩৪-রুকু-৪

الٓمّٓ ۚ (১) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ (২) هُدًى وَّ رَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ (৩) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ (৪) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (৫) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (৬) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا
كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (৭)
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ (৮)
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৯) خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ
تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۭ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (১০) هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ
فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ۧ (১১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۭ وَمَنْ

www.pathagar.com

يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝١٢

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝١٣ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ

اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ

وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝١٤ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ

مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا

مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٥ يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ

يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝١٦ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ

مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝١٨ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝١٩

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদ

প্রথম রুকু

(১) আলিফ লা-ম-মী-ম।

(২) এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

(৩) পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য।

(৪) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

(৫) এরাই তাদের রব-এর পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই হবে সফলকাম।

(৬) আর মানুষদের মধ্যে এমন নিকৃষ্ট মানুষও রয়েছে যে, অর্থহীন মনোমুগ্ধকর কাহিনী কিনে আনে অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর পথের আহ্বানকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনামূলক শাস্তির ব্যবস্থা।

(৭) এদেরকে যখন আমার আয়াত শোনানো হয় তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়- যেনো তারা তা শুনতেই পায়নি, যেনো তাদের কান দুটো বধির। সুতরাং এদেরকে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

(৮) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

(৯) সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর অকাট্য অঙ্গীকার এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(১০) আকাশসমূহ তোমরা দেখতে পাচ্ছো কোনো স্তম্ভ ব্যতীতই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যমীনের ওপরে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন যেনো তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সব প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এরপর সেখানে নানা ধরনের উত্তম বস্তু উৎপন্ন করি।

(১১) এসবই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এবার আমাকে দেখাও তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে মা'বুদ বানাচ্ছো তারা কি সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই জালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

দ্বিতীয় রুকু

(১২) আমি লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলাম যেনো সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য

www.pathagar.com

লাভজনক। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে, সে ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত যে- আল্লাহ কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(১৩) স্মরণ করো যখন লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কারণ শিরক হলো সবথেকে বড় জুলুম।

(১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে জেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কারণ তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছরে উপনীত হয়ে সে দুধ পান করা ছেড়েছে। (এ কারণেই আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা মাতারও প্রতিও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং সব শেষে তোমাদের সবাইকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

(১৫) (পিতামাতার অধিকার আদায় করতে গিয়ে মনে রাখবে) যদি তারা তোমাকে এরই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। তবে পৃথিবীর জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে, আর (নির্দেশ মানার ব্যাপারে) তুমি শুধু তার কথাই মেনে চলবে যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে এসেছে (আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করছে।) এরপর (পরিশেষে) তোমাদের সকলকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো (পৃথিবীর জীবনে) তোমরা কেমন কাজ করছিলে।

(১৬) (আর লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বললো) হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানার মতোও (ক্ষুদ্রও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতরে, আকাশে অথবা পৃথিবীতে কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা (হাশরের ময়দানে) বের করে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত আছেন।

(১৭) (লুকমান তাঁর সন্তানকে আরো বললো) হে পুত্র! নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। (আর এই আদেশ-নিষেধ করতে গিয়ে) তোমার ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে ধৈর্য ধারণ করো, আর (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার বিষয়ে) নিদের্শ দেয়া হয়েছে।

(১৮) (হে পুত্র!) কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীর বুকে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না, কারণ আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।

(১৯) (হে পুত্র! পৃথবীতে চলার সময়) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বরকে নীচু করো। কেননা সব আওয়াজের মধ্যে নিকৃষ্টতম-অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার।

www.pathagar.com

প্রথম রুকুর তাফসীর

حروف مقطعات-হুরুফে মুক্বাত্ত্বাআ'ত

الم-আলিফ লা-ম-মী-ম। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বা খন্ডকৃত অক্ষর তথা হুরুফে মুক্বাত্ত্বাআ' মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিভিন্ন সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অক্ষরগুলোর তাফসীর সম্পর্কে কোরআনের গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ কারণে অধিকাংশ মুফাস্‌সির এসব অক্ষরের তাফসীর করেন না। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন, 'এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের তাৎপর্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন।' আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সির এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, আরবদের মধ্যে খন্ডকৃত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহার করে বাকরীতির প্রচলন ছিলো এবং এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের তাৎপর্য কি, এসব অক্ষর দিয়ে কি বুঝানো হচ্ছে, তা তারা বুঝে নিতো। তারা কথার মধ্যে ও কবিতা রচনায় বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে বিশেষ কোনো শব্দের সংকেত বুঝাতো। যেমন আরবী কবিতায় রয়েছে-

ناديتهم ان الجمعوا الاتا- قالوا جميعا كالهم الا فا

এই কবিতার প্রথম পংক্তির শেষ শব্দে ت তা অক্ষরের সাথে। আলিফ যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষ শব্দে ف ফা অক্ষরের সাথে। আলিফ যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম লাইনের শেষ শব্দ আলিফ-যুক্ত তা-অক্ষর দিয়ে لاتركبون। বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দ আলিফ যুক্ত ফা অক্ষর দিয়ে الافاركبوا। বুঝানো হয়েছে। এই দুই লাইন কবিতার অর্থ হলো, 'আমি অভিযাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমরা যাত্রা করবে নাকি? তখন তারা সবাই বললো, চলো যাত্রা করি।'

আরবদের মধ্যে সাংকেতিক অক্ষর ব্যবহারের রীতি চালু ছিলো বিধায় যখন কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখন তারা অন্য ব্যাপারে বিরোধিতা করলেও এই বিচ্ছিন্ন অক্ষর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলেনি এবং আল্লাহর রাসূলের কোনো সাহাবী এসব সাংকেতিক অক্ষরের তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন বলে কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে আরবী ভাষায় এই বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহারের রীতি পরিত্যক্ত হয় বিধায় এসব অক্ষরের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই কোরআনের গবেষকদের মধ্যে এসব অক্ষরের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে কোরআন থেকে হিদায়াত লাভের ক্ষেত্রে এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের তাৎপর্য কোনো বাধা নয়। এসব অক্ষরের সঠিক ব্যাখ্যা জানা না জানার ওপরে কোরআন বুঝার শর্ত নির্ভর করে না।

এই কোরআন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্ মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি। বান্দাহ্দের জন্য কোরআন বুঝা তিনি অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং কোরআনের মধ্যে এমন কোনো কথা তিনি বলেননি, যা অনুধাবন করতে না পারলে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হবে- এমন কোনো বিষয়

www.pathagar.com

বা কথা আল্লাহ তা'য়ালা বলেননি। বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যদি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী হতো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এসব অক্ষরের স্পষ্ট ব্যাখ্যা জানিয়ে দিতেন। অতএব এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষরের সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য অযথা মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট না করে কোরআন বুঝার জন্য সময় ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জ্ঞানগর্ভ কিতাব

আলোচ্য সূরায় যে কথাগুলো মানব জাতির সামনে পেশ করা হবে, সে কথাগুলো কোন্ ধরনের কিতাবের কথা? এই প্রশ্ন ওঠা একান্তই স্বাভাবিক। যেমন কেউ যখন কোনো গ্রন্থ ক্রয় করে বা কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে আগ্রহী হয়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই জেনে নেয় যে, সে কোন্ ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থ ক্রয় করছে বা পাঠ করতে যাচ্ছে। গ্রন্থ পাঠকারীর মনে গ্রন্থকারের পরিচিতি জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক।

অনুরূপভাবে এই কোরআন যাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাদের মনের গহীনে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হবে– মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন সৃষ্টি হবার পূর্বেই পাঠককে দিয়ে দিয়েছেন। কোরআন অধ্যয়নকারী পবিত্র কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে এর থেকে হিদায়াত গ্রহণ করে পৃথিবীতে সহজ-সরল পথে চলে আখিরাতের জীবনে মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে, সেই কোরআন কোন্ ধরনের কিতাব– এই প্রশ্ন সৃষ্টি হবার পূর্বেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন অধ্যয়নকারীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'এগুলো হচ্ছে একটি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত'। আলোচ্য সূরা অধ্যয়নের শুরুতেই প্রথমে এ কথাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অধ্যয়নকারী এমন একটি কিতাবের কথা অধ্যয়ন করতে যাচ্ছে, যে কথাগুলো অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ।

পৃথিবীর দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ তাদের কথা ও মতামতসমূহ অপরিবর্তনীয় এবং অকাট্য বলার দুঃসাহস প্রদর্শন করেন না। আজ যিনি যে মতামত দিচ্ছেন, সময়ের বিবর্তনে তা পরিবর্তন করছেন। একদল বিজ্ঞানী যে থিওরী দিচ্ছেন, আরেক দল বিজ্ঞানী তার বিরুদ্ধে মতামত পেশ করছেন। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মতামত সার্বজনীন বা চিরন্তন নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে যা কিছু বলেছেন, তা সার্বজনীন ও চিরন্তন।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন এমনি এক কিতাব, যে কিতাবের একটি শব্দও কালের আবর্তনে বিবর্ণ হবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, যে কথা বা মতামত পবিত্র কোরআন অবতীর্ণের মুহূর্তে মানব জাতির সামনে একবার পেশ করেছে, তা কখনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ যে কথা সঠিক জ্ঞান নির্ভর, তা কখনো কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয় না বা পুরনো হয় না। নির্ভুল জ্ঞান নির্ভর কথা সর্বযুগে ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। এ জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে এই কিতাবের কথাগুলোকে 'জ্ঞানগর্ভ কিতাবের কথা' বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা এই কিতাব সর্বযুগের ও সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এক পয়গাম। এই কিতাব সকল আসমানী কিতাবের নির্যাস এবং এসবের সত্যতা প্রমাণের জন্যই এসেছে- খণ্ডনের জন্য নয়। পূর্বে অবতীর্ণ করা কিতাবের শিক্ষা এই কোরআন বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। এই কিতাব অকাট্য সত্য এবং সত্য সহকারে তা নাযিল হয়েছে এবং এতে বর্ণিত প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব অটল, অবিচল ও অপরিবর্তনীয়- যা কোনো প্রকার হাসি-তামাসার বিষয় নয়।

এই কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবী ভাষা হলো পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই উত্থান ও পতন হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত হচ্ছে। আরবী ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো একটি ভাষাও বর্তমান সময় পর্যন্ত দাবি করতে পারবে না যে, সে ভাষাটি উৎকর্ষতার শেষ সোপান পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভাষাই ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। একমাত্র আরবী ভাষা এমন একটি ভাষা, যে ভাষাটি পরিপূর্ণতার শেষ সোপানে উন্নীত হয়েছে এবং এই ভাষায় আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হবে না।

আল্লাহর কোরআন কোনো দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে না, এই কিতাবের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সত্য বর্ণনাকারী এবং এতে সত্য পরিপন্থী কোনো কথাবার্তা নেই যা মেনে নিতে একজন সত্যপন্থী মানুষ ইতস্তত করতে পারে। জ্ঞানগর্ভ এই কিতাব মানুষের স্বভাবের বিপরীত কোনো শিক্ষা পেশ করে না, মানুষের স্বভাবধর্মী শিক্ষা পেশ করে এই কিতাব এবং এর আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। সত্যপন্থীদের জন্য এই কিতাব ফায়সালার মানদণ্ড এবং যাবতীয় আইনের উৎস। তাই বলে এই কিতাব শুধুমাত্র আইনের কিতাব নয় বরং হিদায়াতের কিতাব এবং এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করা মানব মণ্ডলীর প্রতি মহান আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহের প্রকাশ।

কোরআন সেসব ভেজাল থেকে পবিত্র, যা দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ অপবিত্র হয়েছে। এই কোরআন ব্যতীত অন্যান্য যেসব গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বর্তমানে পৃথিবীতে দাবি করা হয়ে থাকে, সেসব গ্রন্থের একজন হাফেজও সারা পৃথিবীময় অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাবে না এবং অন্য কোনো গ্রন্থের হাফেজ হওয়াও সম্ভব নয়।

এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব হলো মহান আল্লাহর বাণী এবং এটা যে মহান আল্লাহর বাণী তার অকাট্য প্রমাণই হলো, এই কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করতে পারে এবং স্মৃতিতে ধারণ করে কিতাব না দেখে তা অবিকল তিলাওয়াত করতে পারে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন বেদ,গীতা, বাইবেল, ত্রিপটক, জিন্দাবেস্তা, গ্রন্থসাহেব, বাইবেলের লূক, মার্ক, মথি, যোহন, ওল্ডটেষ্টামেন্ট-নিউটেষ্টামেন্ট- এসব গ্রন্থগুলোর মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও নেই, যা মানুষ পরিপূর্ণভাবে স্মৃতির পাতায় ধারণ করে মূল গ্রন্থ না দেখে অবিকল আবৃত্তি করতে পারে।

৫০০ বছর পূর্বের বাইবেলের সাথে বর্তমান বাইবেলের কোনো সাদৃশ্য নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত বাইবেলের মধ্যে একটির সাথে আরেকটির সামঞ্জস্য নেই। খৃষ্টানদের মধ্যে

www.pathagar.com

বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাইবেল রয়েছে। একদলের বাইবেলের সাথে আরেক দলের বাইবেলের কোনো সাদৃশ্য নেই। খৃষ্টানদের পাদ্রীরা বলে থাকে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টার বাণী। কিন্তু যখন প্রমাণ চাওয়া হয়েছে, তারা প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান যুগে খৃষ্টানদের কাছে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে খৃষ্টানদের কাছে যে বাইবেল রয়েছে, এই বাইবেলের মধ্যে মহান আল্লাহর একটি বর্ণও নেই।

এই চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করতে সাহস করেনি। কারণ, খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ-পাদ্রীরা বাইবেলের এভাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত করেছে যে, নিজেদের ইচ্ছানুসারে ধর্মগ্রন্থের ভেতরে কথামালা সাজাতে সাজাতে মূল কিতাবের শেষ শব্দটি পর্যন্ত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাইবেলের নামে বর্তমানে যে কিতাবকে মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ-পাদ্রীদের কথামালার সমাহার ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আল্লাহর এই কোরআন- যা অবতীর্ণ হওয়ার কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, এর একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবেও না।

কারণ এই কিতাবকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি- যিনি এই কিতাবকে তাঁর বান্দাহদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এই কিতাবকে হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞানগর্ভ এই কিতাব কখনো পুরনো হবে না, এর আবেদনও কখনো শেষ হবে না। এই কোরআনের যাবতীয় কিছু চিরন্তন ও অকাট্য। বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ এই কোরআন মহান আল্লাহর এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব। এই কিতাব যাঁর ওপরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই মহামানব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছেন-

ظَاهِرُه اَنِيْقٌ وَبَاطِنُه عَمِيْقٌ-لَه نَجُوْمٌ وَعَلى نَجُوْمِه لاَتُحْصى عَجَائِبُه وَلاَ تُبْلى غَرَائِبُه فِيهِ مَصَابِيْحُ الْهُدى وَمَنَارُالْحِكْمَةِ-

অর্থাৎ কোরআন কোনদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের কোরআনের বাইরের দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ, তার ভেতরের দিক অত্যন্ত গভীর। তার অনেকগুলো তারকা রয়েছে, তারকাসমূহের ওপর আরো অনেক তারকা। কিন্তু কোরআন কোনদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কোরআন হচ্ছে হেদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন অগাধ জলধী।

কোরআনের ভেতরে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অনায়ত্ব অসংখ্য দিক-দিগন্ত। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান-ভান্ডার থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন।

www.pathagar.com

কোরআনের তাফসীর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا-

কোরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের তাফসীর করে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-

كِتٰبُ اللّٰهِ تُبْصِرُوْنَ بِهٖ وَتَنْطِقُوْنَ بِهٖ وَتَسْمَعُوْنَ بِهٖ وَيَنْطِقُ بَعْضُهٗ بِبَعْضٍ وَيَشْهَدُ بَعْضُهٗ عَلٰى بِبَعْضٍ-

আল্লাহর কিতাব এমন যে, এর দ্বারা তোমরা দেখবে, কথা বলবে ও শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

কোরআনের তাফসীর যুগের চাহিদা পূরণ করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেন-

اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُهُ الزَّمَانُ-

নিশ্চয়ই কাল ও সময়ই কোরআনের ব্যাখ্যা করে।

কোরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দিয়েই করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টি এক আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আয়াতে সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ-وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ-وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ-وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ-

এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

জ্ঞানগর্ভ এই কিতাবের আইন-কানুন ও বিধান সর্বযুগে এবং সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন যোগ্য- এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং ঐ কথার স্বপক্ষে যেমন মহান আল্লাহর সাক্ষ্য বিদ্যমান, অনুরূপ পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাস এবং মুসলিম ও অমুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ ও চিন্তানায়কগণের সাক্ষ্যও বিদ্যমান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের পার্থিব জীবনে কল্যাণ ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

এই কিতাবের বিধি-বিধানের কারণ অনুসন্ধান করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বের আসমানী কিতাবের আইনের পরিবর্তে এই কোরআনকেই পৃথিবী ধ্বংস

www.pathagar.com

কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত গোটা মানব মন্ডলীর জন্য একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করেছেন। মহা বিজ্ঞানী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হিকমত অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল নবী-রাসূলের শরীয়াত সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ছিলো এবং এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ হেকমত ও কল্যাণ নিহিত ছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানব সভ্যতা এমন অবস্থায় উপনীত হয়নি যে, তাদের জন্য সর্বকালের ও সর্বযুগের তথা চিরন্তন সাধারণ বিধান প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা ছিলো। মানব সভ্যতা যখন সেই পর্যায়ে উপনীত হলো এবং চিরন্তন বিধান লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করলো, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা চিরন্তন বিধান প্রদান করার লক্ষ্যে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে তাঁর ওপরে মানব জাতির জন্য চিরন্তন বিধান অবতীর্ণ করলেন। এর পূর্বে মানব জাতি চিরন্তন বিধান লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলো না বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণকৃত বিধানের পবিত্র উৎস সমূহকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, বিকৃতি ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার কোনো চিরন্তন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

অনুরূপভাবে ঐসব যুগের নবী-রাসূলের প্রতি অবতীর্ণকৃত বিধানের হেফাজতকারী, নবী-রাসূলের সুন্নাত রক্ষাকারী মুজাদ্দিদ বা কোনো সংস্কারকও প্রেরণ করেননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহে শাব্দিক ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন এমনভাবে সাধিত হয়েছে যে, বর্তমানে সেসব কিতাবের নামে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তার ভেতরে মহান আল্লাহর একটি শব্দও উপস্থিত নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে জ্ঞানগর্ভ কিতাব মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী জীবন বিধান হিসাবে প্রদান করেছেন, এই বিধানে এমন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব রয়েছে যা এই বিধানকে সর্বযুগে, সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন যোগ্য করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে যারা কোরআনের ঘোষণাকে যথেষ্ট মনে করেন না বা করলেও বাস্তব প্রমাণ অবলোকন করে নিজের মনকে সন্তুষ্ট করতে ও প্রত্যয়কে অধিক দৃঢ় করতে আগ্রহী, তারা পৃথিবীর মানোবেতিহাসের দিকে উন্মুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন যুগের ইসলামী উদাহর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসের মধ্যে অবশ্যই তারা এ প্রসঙ্গে মনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন এবং প্রত্যয় দৃঢ় করার সপক্ষে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপাদান লাভ করতে পারবেন।

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, কোনো জীবন ব্যবস্থা চিরন্তন ও সার্বজনীনভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য হবার সপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এমন দুটো শর্তের ওপর নির্ভরশীল- যার একটি অপরটির সম্পূরক। প্রথম শর্ত হলো, যে মতবাদ বা আদর্শকে চিরন্তন বা সার্বজনীন বলা হচ্ছে, সেই মতবাদ বা আদর্শের উৎস ও ভিত্তিসমূহ দীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে এবং মানব মন্ডলীর বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে নিত্য-নতুন জটিলতা, সমস্যা ও

www.pathagar.com

ঘটনাবলীর সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে- এই প্রমাণ থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, সেই মতবাদ বা আদর্শ কার্যত বাস্তবায়ন করার পরে তা মানব জাতির জন্য ফলপ্রসু হয়েছিলো, শাসনাধীন জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ সাধন করে তাদের ব্যাপক মান উন্নয়নে সমর্থ হয়েছিলো এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সার্বিক কল্যাণ, ইনসাফ, নিরাপত্তা, শান্তি-সমৃদ্ধি ও উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানে সমর্থ হয়েছিলো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর যে কিতাবকে আলোচ্য সূরায় 'জ্ঞানগর্ভ কিতাব' ও সূরা ইয়াছিনে 'বিজ্ঞানময় কিতাব' বলে উল্লেখ করেছেন, সেই কিতাবের যাবতীয় বিধি-বিধানে উপরোক্ত দুটো শর্তই বিদ্যমান- এ কথা ঐতিহাসিকভাবে মানব মন্ডলীর কাছে প্রমাণিত সত্য। বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা বিজয়ের আসনে আসীন এবং কোরআনের রঙে রঙিন মুসলমান খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুসলমানদের এই অধঃপতন, লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের যুগেও অন্য জাতির তুলনায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে অপরাধ প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। যদিও কোনো মুসলিম রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রীয়ভাবে কোরআনের বিধান পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত নেই। তবুও যেসব দেশে কোরআনের দু'একটি বিধান প্রয়োগ হচ্ছে এবং যেসব দেশের জনগোষ্ঠী ইসলামী মূল্যবোধ কিছুটা হলেও অনুসরণ করে, সেসব দেশে সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান ও পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান তুলনা করলে এ কথা প্রমাণ হবে যে, কোরআনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী সততা, ন্যায়-পরায়ণতা, ইনসাফ, মানবতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর অলঙ্কারে তাদের তুলনায় অধিক সজ্জিত, যারা পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী।

(কোরআন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল কোরআন পরিচিতি' শিরোণাম থেকে 'কোরআনের আংশিক অনুসরণ করা যাবে না' শিরোণাম পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন।)

www.pathagar.com

জ্ঞানগর্ভ কিতাব যাদের পথনির্দেশনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কিতাবকে 'জ্ঞানগর্ভ কিতাব' হিসাবে উল্লেখ করলেন, সেই কিতাবটি কাদের জন্য এবং কি ধরনের- এই প্রশ্ন সৃষ্টি হবার পূর্বেই আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে জবাব দিয়ে দিলেন, 'জ্ঞানগর্ভ এই কিতাব পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য।' আলোচ্য আয়াতে 'হুদা, রাহ্মাত ও মুহ্সিনীন' এই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবের কথাগুলো মুহ্সিনীনদের জন্য হুদা এবং রাহ্মাত।

আরবী অভিধানে হুদা শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'পথ দেখানো, হিদায়াত, হিদায়াত করা ইত্যাদি।' এই শব্দটি বিশেষ্য এবং ক্রিয়ামূল- উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে হুদা বলা হয় ঐ নিয়ম-পদ্ধতিকে- 'যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মানুষকে মূর্খতা-অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতার নিকষ কালো অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে তথা দুনিয়া ও আখিরাতে মহামুক্তির পথে নিয়ে আসে। মানুষের চেতনার জগতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দেয় এবং আপন স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করে।' পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

রমযানের মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (সূরা বাকারা-১৮৫)

মানুষের প্রয়োজন অসীম- শুধুমাত্র খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তাই মানুষের প্রয়োজনের শেষ সীমা নয়, বরং এর বাইরে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মানুষের রয়েছে। সেই প্রয়োজনটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সবথেকে অধিক। সেটা হলো, এই পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক পথে জীবন-যাপনের জন্য তার একটা নির্ভুল-অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা প্রয়োজন। মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তার সাথে, নিজের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার সাথে, পৃথিবীতে যেসব দ্রব্যসামগ্রী-বস্তু নিচয় ও সাজ-সরঞ্জামের ওপর সে কর্তৃত্বশীল তার সাথে এবং শত-সহস্র মানুষের সাথে সে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন দিক দিয়ে সম্পর্ক যুক্ত তাদের সাথে, এক কথায় যে বিশ্বব্যবস্থার অধীনে থেকে মানুষ কার্য-ক্রিয়া সম্পাদন করে তার সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, কার প্রতি কি ধরনের অধিকার আদায় করবে তা সঠিকভাবে জেনে নেয়া একান্তই জরুরী।

মানুষের জানা প্রয়োজন, কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করলে সামগ্রিকভাবে তার জীবন সফল হবে এবং তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম-মেহনত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে তার জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না। এই নির্ভুল-অভ্রান্ত পথ ও পন্থার দিকে যে নেতৃত্ব মানুষকে পরিচালিত করে- কোরআনের ভাষায় সেটাই হলো হুদা বা হিদায়াত।

www.pathagar.com

সূরা লুকমানের তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব মুহসিনীনদের জন্য হুদা এবং রহমত। প্রকৃতপক্ষে হুদা বা হিদায়াত শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এখানে আমরা সংক্ষেপে এই শব্দটির মূল অর্থ আলোচনা করলাম। জ্ঞানগর্ভ এই কিতাব তথা কোরআনকে মুহসিনীনদের জন্য রহমত হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাহ্‌মত শব্দটি পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে মানুষ বাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করে অতীব সুন্দর কাঠামোয় মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু নিচয়কে মানুষের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করেছেন এবং সমস্ত কিছু যেনো মানুষ নিজের স্বাধীন ক্ষমতা অনুসারে ব্যবহার করতে পারে, সে যোগ্যতাও তিনি প্রদান করেছেন। জটিল এই পৃথিবীতে মানুষ যেনো যথাযথভাবে টিকে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। মহাকাশ তথা উর্ধ্ব জগৎ থেকে প্রতি মুহূর্তে তীব্র বেগে ছুটে আসা নানা ধরনের বায়বীয় পদার্থ, কঠিন পদার্থ ও নানা ধরনের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করেছেন।

মানুষের দেহ থেকে শুরু করে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি বালি কণা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই যেখানে যা প্রয়োজন– তাই দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সজ্জিত করেছেন। পায়ের নীচের ছোট্ট একটি তৃণখন্ড ও বালি কণা থেকে শুরু করে ঐ তুষার আবৃত হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত– সমস্ত কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই মহান আল্লাহর রহমতের বৃষ্টিধারা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ–

আমার রহমত সমস্ত জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ-১৫৬)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার যেসব রহমতের কারণে মানব জাতিসহ অন্যান্য সৃষ্টি টিকে রয়েছে, এসব রহমতই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষের জন্য আরেকটি রহমতের প্রয়োজন এবং সেটা হলো, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্রান্ত জীবন বিধানের। যে জীবন বিধান মানুষের কাছে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, তার পরিচিত-অপরিচিত, অধিনস্থ-অনুগত ও অন্যান্য সকলের প্রতি ইনসাফ করার সঠিক পথপ্রদর্শন করবে। সর্বোপরি মানুষকে তাঁর আপন স্রষ্টার সন্ধান দেবে এবং স্রষ্টার সাথে সঠিক পথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সেতু নির্মাণের উপকরণের সন্ধান দেবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে মানুষের এই প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর এটাই হলো মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার সবথেকে বড় রহমত। এ জন্য আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে কোরআনকে মুহসিনীনদের জন্য রহমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবই মানুষের সবথেকে বড় প্রয়োজন পূরণ করে।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, জ্ঞানগর্ভ এই কিতাব হূদা ও রহমত মুহসিনীন তথা সৎকর্মশীল লোকদের জন্য। মুহসিনীন অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত বেশ কয়েকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য যেসব ব্যক্তিবর্গ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, পবিত্র কোরআন সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোক হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি তাফসীরে সাঈদী-সূরা আসরের তাফসীরে করেছি। সূরা আল আসরে যে চারটি প্রধান গুণ এবং সেই গুণের সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুণের কথা বলা হয়েছে, তা আমি আমার সাধ্যানুসারে সূরা আসরের তাফসীরে আলোচনা করেছি।

মুহ্সিনীনদের প্রধান তিনটি গুণ

জ্ঞানগর্ভ কিতাব পথনির্দেশনা ও রহমত হলো মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের জন্য। মুহ্সিনীনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে বলেন, 'যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।' অর্থাৎ মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের প্রধান তিনটি গুণই হলো, তারা নামায আদায় করে, সম্পদশালী হলে যাকাত আদায় করে এবং মৃত্যুর পরের জীবন তথা বিচার দিবসের প্রতি দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। এই তিনটি গুণই যে মুহ্সিনীন বা সৎকর্মশীলদের লোকদের একমাত্র গুণ– এ কথা কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়নি।

আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, এই কিতাব মুহসিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। এ কথা বলে মুহ্সিনীন বা সৎকর্মশীল লোকদের পরিচয় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তারা জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাজে একমাত্র এই কিতাব থেকেই পথনির্দেশনা গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই কিতাবের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে। এই কিতাবের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে তিনটি গুণ একান্ত প্রয়োজন, সেই তিনটি গুণের কথাই আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নামায আদায় করে, যাকাত দান করে এবং আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

কারণ মুহ্সিনীন বা সৎকর্মশীল হতে হলে মানব চরিত্রে এই তিনটি গুণের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, এই তিনটি গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়, অপরাপর সৎ গুণাবলীর সমাহার তার চরিত্রে এমনিতেই ঘটে। এই তিনটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হলে, কোরআন-হাদীসে বর্ণিত অপরাপর সৎ গুণ ক্রমশ ব্যক্তির চরিত্রে প্রকাশ পেতে থাকে। অর্থাৎ নামায, যাকাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস– এই তিনটি গুণ অন্য সকল সৎ গুণের আমদানি কারক বা স্রষ্টা। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় যারা নামায আদায় করে, তাদের মধ্যে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশ পালন করার এক স্থায়ী অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং তাদের হৃদয়ে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। ফলে সেই ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই সহজ বিষয়ে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় যারা যাকাত আদায় করে, তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবণতা ক্রমশ দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে থাকে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি তাদের হৃদয় থেকে লোভ-লালসা বিদূরিত হতে থাকে এবং মন-মানসিকতা ক্রমশ আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের পথের দিকে ধাবিত হতে থাকে। কৃপণতার মতো খারাপ গুণ চরিত্র থেকে বিদায় নেয়। ফলে এসব লোক পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যায়-অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ার নেশায় মেতে ওঠে না। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অন্যায়-অবৈধ পথে ধন-সম্পদ অর্জন করতে যাওয়ার অর্থই হলো নানা ধরনের দুষ্কৃতির মধ্যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা এবং সমাজ কাঠামোয় দুর্নীতি নামক ঘুন সৃষ্টি করা।

তৃতীয় যে গুণের কথাটি বলা হয়েছে, তাহলো তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন নয়– মৃত্যুর পরেও আরেকটি অনন্ত জীবন রয়েছে এবং সেই জীবনে এই পৃথিবীতে করে যাওয়া যাবতীয় কর্মের হিসাব মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদালতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পেশ করতে হবে। হিসাবের পরে সৎ ও অসৎ কর্মানুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে। এই বিশ্বাস যাদের মধ্যে সক্রিয় থাকে, তাদের মধ্যে অসংখ্য সৎ গুণাবলীর সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এই গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে তারা স্বেচ্ছাচারী হয় না, মন যা চায়– তাই তারা করতে পারে না। এদের জীবন হয় পরিমার্জিত, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত এবং প্রত্যেকটি কথা ও কাজের মধ্যে সততা-ন্যায় পরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম গুণ– নামায

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহ্সিনীন তথা সৎ লোকদের প্রধান যে তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, এই তিনটি গুণ এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে– উল্লেখিত তিনটি গুণ যে ব্যক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তির চরিত্রে অন্যান্য সকল ভালো গুণসমূহ ক্রমশ বিকশিত হতে থাকবে। তিনটি গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা বলা হয়েছে। কারণ একমাত্র এই নামাযই মানুষকে ক্রমশ আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত করে এবং ব্যক্তির চরিত্রে অসংখ্য সৎ গুণসমূহ বিকশিত করে। মানুষের চরিত্র থেকে যাবতীয় খারাপ গুণ বিদূরিত করে এবং গর্হিত কাজ ও মানুষের মধ্যে ক্রমশ যোজন যোজন ব্যবধান সৃষ্টি করে।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, নামায জিনিসটা কি এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ও রাসূলের হাদীসে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে নামায আদায়ের ব্যাপারে কেনো এত তাগিদ করা হয়েছে? এ জন্য নামায সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত আবশ্যক। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ-يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوْا لَايُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا-قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا-

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-তোমরা ভেবে দেখো, তোমাদের কারোর দরজার সামনে দিয়ে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে কি? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না- তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসূল বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা গোনাহ্সমূহ মুছে ফেলে দেন। (বোখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বাড়ির সামনে যদি নদী থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি উক্ত নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে সেই ব্যক্তির শরীরে কোনো ময়লা জমার অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থানুসারে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তি পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়- আর পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অর্থই হলো সেই ব্যক্তি যাবতীয় গর্হিত কর্মকান্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখে। একজন মানুষ যখন নিজেকে অসৎ গুণাবলী থেকে নিজেকে দূরে রাখে, তখন তার মধ্যে অনিবার্যরূপে সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে।

এই বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একান্তভাবেই একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, সে কোন্ নামায- যে নামায আদায় করলে পাপের ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায় এবং স্বভাব-চরিত্রে অনিবার্যরূপে সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে? সেই নামায সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন 'ইবাদাত' শব্দটির মর্মার্থ অনুধাবন করা। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টিই করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে। এ জন্য 'ইবাদাত' বলতে কি বুঝায়, কোন্ বস্তুর নাম 'ইবাদাত', আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কাছ থেকে কোন্ 'ইবাদাত' চান এবং মানুষকে কোন্ 'ইবাদাত' শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে তিনি অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন- এ বিষয়টি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে।

এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইবাদাতের সঠিক ও তাত্ত্বিক অর্থ বর্তমানে মুসলিম জনগোষ্ঠী ভুলে গিয়েছে। মুসলমানরা নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য সামান্য কিছু কাজের নাম দিয়েছে ইবাদাত এবং এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, এসব কাজ করার অর্থই হলো ইবাদাত করা এবং এসব কাজ আঞ্জাম দিয়ে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা

www.pathagar.com

যে, ইবাদাতের হক আদায় হয়ে গিয়েছে। এই বিরাট ভুলের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের সাধারণ মানুষ যেমন নিপতিত হয়েছে, অনুরূপভাবে নিমজ্জিত হয়েছে মুসলিম মিল্লাতের অধিকাংশ চিন্তানায়কগণ। জীবনের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশ 'ইবাদাত' নামক এই কাজের জন্য বরাদ্দ করে জীবনের অবশিষ্ট বিরাট অংশ তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত থেকে নিজেদেরকে স্বাধীন বানিয়ে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো, তারা 'ইবাদাত' শব্দের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআনেও এ কথাটি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং এই ইবাদাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। কারণ যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বান্দার যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তার মানব জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

একজন ছাত্র যদি লেখাপড়ায় কৃতকার্য হতে না পারে, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে- ছাত্র তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বুণন শিল্পী যদি যথাযথভাবে বুণন কাজে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে সে এ কথাই প্রমাণ করবে যে- বুণন শিল্পী হিসাবে সে ব্যর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে একজন মানুষ যদি তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানে, তাহলে এ কথাই প্রমাণ হবে যে, মানুষ হিসাবে তার গোটা জীবনই সে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। মানুষ হিসাবে এই বিষয়টি সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে চেতনার জগতে জগরুক রাখতে হবে যে, একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা।

আরবী ভাষার عبد 'আব্‌দ' শব্দ থেকে 'ইবাদাত' শব্দটি এসেছে এবং 'আবদ' শব্দের অর্থ হলো চাকর, ভৃত্য, দাস বা গোলাম। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় Servant। সুতরাং ইবাদাত শব্দের অর্থ হলো, গোলামী করা বা দাসত্ব করা। ইংরেজী ভাষায় দাসত্ব বলতে Slavery বুঝায় এবং ইবাদাত শব্দের অর্থ এভাবে করা যেতে পারে Work or serve as a slave। কোনো দাস বা ভৃত্য যদি যথার্থভাবেই তার মনিবের আজ্ঞানুবর্তী হয় বা মনিবের আদেশানুসারে যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দেয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, লোকটি তার মনিবের দাসত্ব করছে। আর ইসলামী পরিভাষায় একেই বলা হবে লোকটি তার মনিবের ইবাদাত করছে।

আর মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও যে চাকর যথারীতি তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে না, মনিবের আদেশের বিপরীত কাজ করে তাহলে এ ধরনের চাকরকে বলা হবে অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ চাকরটি সুস্পষ্টভাবে মনিবের নাফরমানীমূলক কাজ করে যাচ্ছে। চাকরের কাজ হয় সাধারণত তিনটি। চাকরের প্রথম কাজ হলো, সে যার চাকর প্রথমে তাকে মনিব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কারণ মনিব তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছেন। এ কারণে চাকর একমাত্র মনিবের আদেশ ব্যতীত অন্য কারো আদেশ মানবে

www.pathagar.com

না এবং মনিবের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করবে না। মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কারণে চাকর মনিবের দেয়া দায়িত্বের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করবে না এবং মনিবের অপছন্দনীয় কোনো কাজে সে নিজেকে জড়িত করবে না।

মনিব চাকরের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছেন, এ জন্য চাকরের এটা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সে মনিবের প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করবে। মনিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করবে, মনিবের সম্মান-মর্যাদার বিপরীত কোনো কাজ করবে না বা এ ধরনের কোনো চিন্তাও মনে স্থান দেবে না। এই তিনটি কাজ যথাযথভাবে যে চাকর আঞ্জাম দেয়, তাকেই সঠিক অর্থে চাকর বলা যেতে পারে। এভাবে যে চাকর কাজ করে, সেই চাকর সম্পর্কেই বলা যায় যে, চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে যথাযথভাবে টিকে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অনুগ্রহ করে করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা হলেন মনিব আর মানুষ হলো তাঁর গোলাম বা চাকর। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁরা এই কথাটিই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- তোমাদের মনিব হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমরা কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে- অন্য কারো নয়। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যে পৃথিবীতে তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন- সেই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য তিনিই বাসোপযোগী করেছেন, এখানে সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা একমাত্র তিনিই পূরণ করেছেন। আর এই কাজে তাঁর সাথে অন্য কেউ শরীক নেই।

সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁকেই মনিব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই আনুগত্য করবে, তাঁরই আইন অনুসরণ করবে, তাঁরই দেয়া জীবন বিধান অনুসারে পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালনা করবে এবং তাঁর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজে নিজেদেরকে জড়িত করবে না। সংক্ষেপে এটাই হলো ইবাদাত শব্দের মূল অর্থ।

চাকর মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে মনিবের আদেশানুসারে যদি নিজেকে পরিচালিত করে, তাহলে বলা যেতে পারে যে- চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে। আর চাকর যদি মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে মনিবের আদেশ অনুসরণ না করে, তাহলে বলা যেতে পারে যে- চাকরটি মনিবের নাফরমানী করছে বা মনিবের আদেশ অমান্য করছে। চাকর যদি মনিবের দেয়া বাসস্থানে অবস্থান করছে, মনিবের দেয়া যাবতীয় উপকরণে জীবন ধারণ করছে।

মনিব সেই চাকরকে তার চব্বিশ ঘন্টার কর্মসূচী দিয়ে দিলো। কখন সে কোন্ কোন্ কাজ আঞ্জাম দেবে, কখন সে আহার করবে, কখন বিশ্রাম করবে, নিদ্রা যাবে, মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য চিত্ত বিনোদন করবে- অর্থাৎ একজন মানুষের জন্য সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন ধারণের উপযোগী কর্মসূচী মনিব প্রদান করলেন। কর্মসূচী অনুসারে চাকর মনিবের দেয়া আদেশসমূহ পালন করতে থাকবে- এটাই হলো চাকরের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

কর্মসূচী অনুসারে মনিবের সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসা ও নিয়ে আসার সময় হলো। বাগানের গাছগুলোয় পানি সিঞ্চনের সময় হলো। বাগানের আগাছাসমূহ পরিষ্কার করার সময় হলো। পশুদল এসে সাজানো বাগান তছনছ করতে থাকলো, চাকর পশুদলকে তাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলো না। সে কোনো দায়িত্ব পালন না করে মনিবের দেয়া ঘরে অবস্থান করে মনিব যে লিখিত কর্মসূচী দিয়েছেন, তা মধুর স্বরে বার বার আবৃত্তি করতে থাকলো আর মনিবের প্রশংসা করতে থাকলো।

এই ধরনের চাকর সম্পর্কে তো এ কথাই বলা হবে যে, চাকরটি মনিবের ইবাদাত করছে না-বরং সে মনিবের দেয়া যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে প্রত্যেক পদে মনিবের আদেশ অমান্য করছে। মনিবের বাগানের সবুজ-শ্যামল সজিব গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রখর রৌদ্রতাপে গাছগুলো সজিবতা হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ছে, পশুদল বাগানে প্রবেশ করে সাজানো বাগান তছনছ করে দিচ্ছে। আর চাকর সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মনিবের দেয়া কর্মসূচী মধুর স্বরে পড়ছে এবং মনিবের প্রশংসা করছে। সুতরাং এই চাকর মনিবের ইবাদাত না করে মনিবের নাফরমানী করে যাচ্ছে। এই ধরনের চাকর সম্পর্কে লোকজন মনিব লোকটিকে তো এই পরামর্শই দেবে, 'ঐ অকৃতজ্ঞ চাকরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে একজন আনুগত্য পরায়ণ চাকর বহাল করুন।'

মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই কথা প্রযোজ্য হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ঐসব চাকর সম্পর্কে কি বলা যাবে? যে চাকরকে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন নামক কর্মসূচী দিয়েছেন, কিন্তু সেই চাকর কোরআনের কোনো আদেশ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র কোরআন তিলাওয়াত করছে, আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে একের পর এক সিজ্দা দিয়েই যাচ্ছে, বার বার আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবী নামক বাগানকে সুন্দর সজিব রাখার লক্ষ্যে তাঁর চাকরকে কোরআনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার আদেশ দিলেন, কিন্তু চাকর সে আদেশ পালন না করে কর্মসূচী তিলাওয়াত করতে থাকলো।

ফলে পৃথিবী নামক এই বাগানে শয়তান নানা ধরনের আগাছা সৃষ্টি করতে লাগলো, গোটা বাগানকে তছনছ করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালাতে থাকলো। গোটা পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে পৃথিবীময় অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিলো। আল্লাহর সেই চাকর এসব দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রেখে- অশান্তি, অনাচার, অত্যাচার-জুলুম, নির্যাতন-নিষ্পেষন বিদূরিত করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যে কর্মসূচী দিয়েছেন, তা তিলাওয়াত করতে থাকলো।

এই ধরনের চাকর সম্পর্কে কি এ কথা বলা যাবে যে, সে আল্লাহর ইবাদাত করছে? অবশ্যই সে আল্লাহর ইবাদাত করছে না- বরং সে প্রত্যেক পদে আল্লাহর নাফরমানী করে যাচ্ছে। অথচ দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, ইবাদাত শব্দের সঠিক অর্থ জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ঐসব নাফরমান চাকরদের সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধার সাথে মন্তব্য করে

www.pathagar.com

থাকে, 'লোকটি আল্লাহর ইবাদাত গুজার বান্দাহ্– লোকটি অত্যন্ত পরহেজগার মানুষ।' একটি অফিসে একজন লোক চাকরী করে। সে যার চাকরী করে সেই মনিব তার চাকরকে ডিউটি চলাকালে পরিধানের জন্য বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মনিব যখন অফিসে আসবেন, চাকর মনিবকে সালাম জানাবে– এ আদেশও তিনি দিয়েছেন। সেই সাথে অফিসের যাবতীয় আসবাব পত্র রক্ষাণাবেক্ষণসহ অফিসের নিরাপত্তার দায়িত্বও তার প্রতি অর্পণ করেছেন। কোনো দুর্বৃত্তের দল অফিসে প্রকাশ্যে বা চুপিসারে প্রবেশ করে অফিসের যেন ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেটা প্রতিরোধ করার জন্য মনিব সেই চাকরকে অস্ত্রও প্রদান করেছেন। চাকরের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে অফিসকে কর্মচঞ্চল ও অফিসে সার্বিক শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করে চাকরের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

এখন এই চাকর যদি শুধুমাত্র বিশেষ পোষাক পরিধান করে অফিসে হাজিরা দেয় এবং মনিবকে সালাম জানায়, অথচ তার ওপরে অর্পিত কোনো দায়িত্ব সে পালন না করে– দুর্বৃত্তদল কর্তৃক অফিস আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু চাকর মনিবের দেয়া অস্ত্র ব্যবহার না করে দুর্বৃত্তদলকে নির্বিঘ্নে অফিস লুট করার কাজে সহযোগিতা করে। তাহলে এই চাকরকে কি মনিবের অনুগত চাকর বলা যাবে? সাধারণ জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই ধরনের চাকরকে নানা ধরনের খারাপ বিশেষণে বিশেষিত করবে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহর কোনো চাকর যখন এই ধরনের আচরণ স্বয়ং আল্লাহর সাথে করছে– আমাদের সমাজের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী-পন্ডিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা সর্বশ্রেণীর লোকদের কাছে আল্লাহর সেই চাকর অত্যন্ত পরহেজগার, ইবাদাত গুজার, আল্লাহভীরু, ধর্মভীরু, সৎলোক ও ন্যায়-পরায়ণ ইত্যাদি উত্তম বিশেষণে বিশেষিত হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, ইবাদাত বলতে কি বুঝায়– তা আমরা অনুধাবন করিনি এবং সঠিক ইবাদাতের সাথে আমাদের পরিচয় নেই।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবী নামক এই অফিসে শান্তি, শৃংখলা, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মুসলমানদের প্রতি। এই পৃথিবীতে খোদ শয়তান এবং মানুষের মধ্যে যারা তার মুরীদ রয়েছে, তারা যেনো তাদের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ, আদর্শ, নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রকাশ্যে বা চুপিসারে চালু করে পৃথিবীর শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে না তোলে, সেদিকে মুসলমানদের সজাগ দৃষ্টি রাখার আদেশ দিয়েছেন। তাকে কোরআন নামক সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার দিয়ে সজ্জিত করেছেন– যে হাতিয়ার দিয়ে মুসলমানরা শয়তানের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করবে।

অথচ মুসলমানরা সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। বরং এদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআন নামক সেই হাতিয়ারকে রুটি-রুজি অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে, কেউ কোরআনকে তাবিজের কিতাবে পরিণত করেছে। কেউ মাথায় টুপি-পাগড়ী ও গায়ে জুব্বা পরিধান করে ঐ দুর্বৃত্তদলকে সহযোগিতা করছে, যারা মন-মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারা, মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি সমাজ ও দেশে চালু করে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনের দুশমনদের সহায়তাকারী একশ্রেণীর টুপি, পাগড়ী, জুব্বা পরিধানকারী আলিম, পীর-মাশায়েখ উপাধিধারী লোকগুলো দ্বীনদার, ঈমানদার, পরহেজগার ইবাদাত গুজার নামে লোকদের কাছে আখ্যায়িত হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, ইবাদাত সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, টুপি-পাগড়ী, জুব্বা পরিধান করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমজান মাসের রোজা পালন করা এবং সামর্থ থাকলে যাকাত আদায় করা ও মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করে আসার নামই শুধু ইবাদাত নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যে পূরণ হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা যে ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ইবাদাত হলো- মানুষ তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল দিক, বিভাগ ও স্তরে, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তেই একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে জীবন পরিচালিত করবে এবং কোরআন-হাদীসের বিপরীত যা কিছুর অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে রয়েছে, তা অনুসরণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে। মানুষের মনিব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর গোলামদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সীমার মধ্যেই গোলামদের যাবতীয় তৎপরতা ও গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকবে। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করে জীবন পরিচালিত করবে, তার জীবনের সবটুকুই ইবাদাত হিসাবে গণ্য হবে।

কোরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে রাজনীতি করা, দেশ পরিচালনা করা, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আচরণ করা, কারো সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করা, নিজের পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা, সমরাঙ্গণে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করা, দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির প্রতি মহব্বত পোষণ করা, আহারাদি করা, বিশ্রাম গ্রহণ করা বা নিদ্রা যাওয়া, মলমুত্র ত্যাগ করা, কোনো বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা, কোনো কারণে দুঃখ প্রকাশ করা বা রোদন করা, কারো সাথে লেন-দেন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকরী করা, কাউকে শিক্ষা দেয়া, ক্ষেতে হাল-চাষ করা, এক কথায় রান্না ঘর আর বাথরুমের কাজ থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ পরিচালনা করার যাবতীয় কাজই ইবাদাতের মধ্যে গণ্য।

অর্থাৎ যেসব কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এই ধারণা অর্জন করেছে যে, এসব কাজ হলো, 'দুনিয়াদারীর কাজ' এসব কাজই ইবাদাতের মধ্যে শামিল হবে, যদি তা কোরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে সম্পাদন করা হয়। আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে একমাত্র তাঁরই দেয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে।

মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন করার পরে যখন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে, তখন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী

www.pathagar.com

জীবন পরিচালনা করার নামই হলো ইবাদাত। শুধুমাত্র নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাতের নামই ইবাদাত নয়। এই ইবাদাত করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করা হয়নি, কোনো সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি এবং এই ইবাদাতের কোনো বাহ্যিক রূপ নেই। পানির অতল তলদেশে, পাতাল গহ্বরে প্রবেশ করে অথবা মহাকাশের শূন্যে গর্ভে অবস্থান করেও এই ইবাদাত করা যায়। অর্থাৎ মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেনো, সর্বত্রই তাকে স্মরণে রাখতে হবে যে– মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার মনিব আর সে হলো ঐ মনিবের গোলাম। আল্লাহর গোলামী থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে মুক্ত-স্বাধীন ভাবতে পারে না। যখন সে নামায আদায় করছে, তখন যেমন সে আল্লাহর গোলাম, আর যখন সে দেশের সর্বময় ক্ষমতার আসনে আসন গ্রহণ করেছে, তখনও সে মহান আল্লাহর গোলাম।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ও কোরআন তিলাওয়াতই যদি শুধুমাত্র ইবাদাত না হয়, তাহলে এগুলো কোন্ নামে আখ্যায়িত করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, অবশ্যই এগুলো ইবাদাত এবং এসব ইবাদাত মুসলমানদের প্রতি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে এ জন্য যে– যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষকে পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা।

নামায এমন একটি ইবাদাত– যে ইবাদাত একজন মুসলমানকে প্রত্যেক দিন পাঁচ বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে মহান আল্লাহর গোলাম এবং একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করাই তাঁর দায়িত্ব।

রোজা এমন একটি ইবাদাত যে, বছরের একটি পূর্ণ মাস সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে একজন মনে এ কথা জাগরূক রাখে– সে মহান আল্লাহর গোলাম। রমজান মাসে দিনের বেলায় হালাল কাজসমূহ থেকে রোজা একজন মুসলমানকে বিরত রেখে এ কথাই জানিয়ে দেয়, 'আল্লাহর আদেশে যেমন তুমি হালাল কাজ থেকে বিরত রয়েছো, তেমনি বছরের অবশিষ্ট মাসগুলোয় মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।' এভাবে রোজা একজন মুসলমানকে সেই ইবাদাতের দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়, যে ইবাদাত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

যাকাত নামক ইবাদাত একজন মুসলমানকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে যা উপার্জন করছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দান করছেন। সুতরাং এই দান সে তার নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারে না। তার উপার্জনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যের যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন, সেই অধিকার তাকে আদায় করতে হবে। এভাবে যাকাতও তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে স্বেচ্ছাচারী নয়– সে মহান আল্লাহর আদেশের অনুগত গোলাম। হজ্জ এমন একটি ইবাদাত যে, এই হজ্জ নামক মহাসম্মেলন একজন মুসলমানের মনে তার মনিব আল্লাহ তা'য়ালার প্রেম-ভালোবাসার প্রবাহিত ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে দেয়। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান, সমস্ত কিছুর উর্ধে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা– এ কথা হজ্জ একজন মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়।

www.pathagar.com

কোরআন তিলাওয়াত নামক ইবাদাত তিলাওয়াতকারীর মনে এ কথাই সৃষ্টি করে দেয় যে, সে তার মালিকের পাঠানো বাণী তিলাওয়াত করছে, মালিক তার জীবন পরিচালনার জন্য যে পথনির্দেশনা অনুগ্রহ করে দিয়েছেন, সে তাই তিলাওয়াত করছে- তথা মালিকের সাথে কথা বলছে। এভাবে এসব ইবাদাত মানুষকে সেই লক্ষ্য পানে এগিয়ে দেয়, যে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

নামায কি ও কেন

সকল নবী ও রাসূলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই ছিলো এবং মহান আল্লাহর গোলামী করার লক্ষ্যে তাঁরা যখন মানুষকে আহ্বান করেছেন, তখন প্রথমেই নামায আদায়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ এই নামাযই মানুষকে আল্লাহর গোলামীতে অভ্যস্থ করে তোলে। পবিত্র কোরআনে নামায বুঝানোর জন্য صَلٰوةٌ 'সালাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে সালাত অর্থ কোনো জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা, অগ্রসর হওয়া ও নিকটবর্তী হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় সালাত শব্দ দিয়ে আল্লাহর দিকে লক্ষ্য আরোপ করা, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া ও তাঁর একান্ত নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়। নামায তাওহীদের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ এবং ঈমানের স্থায়ী নিদর্শন। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাওহীদ যদি পূর্ণ দ্বীনের মূল উৎস হয়, তাহলে আমলের দিক দিয়ে নামায পূর্ণ দ্বীনের আমলী মূলভিত্তি। এর বাস্তবায়ন পূর্ণ দ্বীনেরই বাস্তবায়ন ধরা যায়। তা মু'মিনের কেবল একটি উত্তম আমলই নয় বরং সমস্ত নেক আমলের ভিত্তিমূল।

এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কোরআনে নামায আদায় করার ভাষা প্রয়োগ না করে নামাযের হেফাযত করা ও কায়েম করার ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে নামায অবহেলিতভাবে আদায় করাই ফরজ নয়, বরং পূর্ণ গুরুত্বের সাথে, একাগ্রচিত্তে এর আদব রক্ষা করে যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا-فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ-مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমস্ত লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য

www.pathagar.com

নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁকে ভয় করো নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের দলে শামিল হয়ো না। (সূরা আর রুম-৩০-৩১)

মানুষকে আসলেই আল্লাহর বান্দা বা দাস হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একমুখী হয়ে তার স্রষ্টার বন্দেগীর ওপর দৃঢ় থাকাই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার মন-মস্তিষ্ক ও আচার আচরণ একনিষ্ঠভাবে একাধারে দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার ওপর নামায ফরয করেছেন। বান্দার এ নামায কায়েম করা মানে সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনুশীলন। বান্দা দিনে বার বার হাত বেঁধে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তাঁর বন্দেগীর স্বীকৃতি দেয়, তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে সিজদায় গিয়ে ঘোষণা করে যে, আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একাগ্রচিত্তে একমাত্র এক আল্লাহর দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতিকে সমস্ত কিছুর দাসত্ব পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর গোলামী করার জন্য তাদেরকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা বিদ্রুপ করে বলেছিলো-

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا-اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ-

অরা জবাব দিল, হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথা শেখায় যে, আমরা এমনসব মাবুদকে পরিত্যাগ করব, যাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষরা পূজা করত? অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার থাকবে না? নিশ্চয় তুমিই রয়ে গেছে একমাত্র উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী ও সদাচারী। (সূরা হুদ-৮৭)

হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম নিজের জাতির বাতিল মা'বুদদের সমালোচনা করে জাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতি হচ্ছে, তোমরা জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলবে; তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদিকে পূর্ণ সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধানের বিপরীত আচরণ করা যাবে না।

আল্লাহর নবীর মুখে দ্বীনের এই ব্যাপক দাওয়াত শুনে তার জাতির লোকেরা বলল, হে শু'আইব! তুমি আমাদের এ কোন ধরনের দাসত্বের দিকে আহ্বান করছো এবং কেমন নামায আদায়ের কথা বলছো? আচ্ছা, আল্লাহকে রাজি করতে কি আমাদের কপোলদেশ ঝুকিয়ে দিলেই চলে না? তোমার নামাযের দাবী কি এত ব্যাপক যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় রীতি-নীতিকেই একেবারে বিসর্জন দিতে হবে এবং দেশের চলমান জীবন ধারার সার্বিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে?

নামায যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কার্যকরী মাধ্যম এ আয়াতগুলো সে কথাই ব্যক্ত করে। বস্তুত নামায মানুষকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্থক গোলাম

www.pathagar.com

বানানোর জন্য প্রস্তুত করে থাকে। এ কথা মনে রাখতে হবে, ঈমানের পরে নামাযই সর্বাগ্রগণ্য দাবী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ-وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-

আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বাহা-১৪)

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى-وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ-وَهُوَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-

হে নবী বলুন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হিদায়েতই সত্যিকারের হিদায়াত। তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সারা জাহানের মালিকের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও। নামায কায়েম করো, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকো। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রিত হবে। (সূরা আল আনয়াম-৭১-৭২)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ-

এই কিতাব ঐ সব মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে ও নামায কায়েম করে। (সূরা আল বাকারা-২)

কোরআনের বর্ণানানুযায়ী এক ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ করার পর আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম তার থেকে নামাযকেই দাবী করা হয়। এটা এমন এক আমল যার জন্য শুধু ঈমানই শর্ত হিসেবে রয়েছে। এ জন্য ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা ও নারী-পুরুষ প্রত্যেকের ওপরই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে। নামায ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন-

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّٰى-وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى-

কিন্তু না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করলো, বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করলো এবং ফিরে গেল। (সূরা আল কিয়ামাহ-৩১-৩২)

কোরআনের এ আয়াতগুলোর বাচনভঙ্গীর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঈমান ও নামায পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বিষয়। অর্থাৎ কেউ ঈমান গ্রহণ করলে সে অবশ্যই নামায কায়েম করবে, অপরদিকে কারো বে-নামাযী হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার অন্তর বে-ঈমানী, দুনিয়া পূজা ও অহংকারে পূর্ণ। সূরা মুদ্দাস্সিরের ৪০-৪৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

www.pathagar.com

فِىْ جَنّٰتٍ-يَتَسَاءَلُوْنَ-عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ-مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ-قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ-

জান্নাতীরা অপরাধী লোকদের জিজ্ঞেস করবে, কোন্ জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না।

আল্লাহ তায়ালা জান্নাত-জাহান্নাম এই দুটি ঠিকানা যথাক্রমে মু'মিন ও কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নামে যাবার কারণ মানুষের ঈমান ও কুফরী। আখিরাতের জিন্দেগীতে সমস্ত গায়েবী বিষয় যখন মানুষের সামনে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, তখন জাহান্নামীদের এ জবাব যে আমরা নামাযী ছিলাম না বিধায় জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছি- মূলতঃ এ কথাই প্রকাশ করে যে, নামায ও ঈমান প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস। একই জিনিসের দু'টি বিশেষ দিক। আকীদাগত দিক থেকে ঈমান হলো তাওহীদের স্বীকৃতি, আর আমলের দিক থেকে নামায হলো-তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ। জাহান্নামীদের নামাযী না হবার অর্থ তারা ঈমানদার ছিল না। বস্তুত নামায বঞ্চিত লোক ঈমান থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-

আমাদের এবং অমুসলিমদের মধ্যে (পার্থক্য সূচিত করে) নামাযের প্রতিশ্রুতি, যে নামায পরিত্যাগ করেছে সেই কুফুরী অবলম্বন করেছে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ-

মুমিন বান্দা আর কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। (মুসলিম, আবু দাউদ)

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জীবনের সবটুকুই নামাযের বাস্তব অনুশীলন। এই নামাযই মুসলমানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-لاَ شَرِيْكَ لَه

বলুন আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যই, তাঁর শরীক কেউ-ই নেই। (সূরা আল আনয়াম-১৬২-১৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে চারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে-নামায, কুরবানী, জিন্দেগী ও মৃত্যু। ধারাবাহিকতায় নামাযের মোকাবেলায় জিন্দেগী এবং কুরবানীর মোকাবেলায় মৃত্যুকে রাখা হয়েছে। এভাবে ক্রমিক সাজানোর মধ্যে একটি নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হচ্ছে, নামাযই মূলতঃ জিন্দেগী। যেভাবে আল্লাহর জন্য আমাদের মৃত্যু যা হল কুরবানী, তেমনি আল্লাহরই জন্য আমাদের জিন্দেগী অর্থ আল্লাহর জন্য আমরা নামায কায়েম করবো। যে নামায আদায় করবে না, সে ইসলামের মধ্যে শামিল নেই, এ কথা পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.pathagar.com

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ-

এখন যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম ও যাকাত দেয় তাহ্লে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। (সূরা তাওবা-১১)

সূরা তওবার এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মুশরিক, ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও অসন্তুষ্টির ঘোষণার পাশাপাশি ও মু'মিনদেরকে তাদের থেকে নিজেদের সমাজকে পাক-পবিত্র করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শন ও কলুষিত ধ্যান-ধারণা মুসলিম সমাজের ওপর কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোন সুযোগ তাদেরকে না দেয়ার তাকীদ করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, এখনো যদি তারা নিজেদের কুফরী জিন্দেগী হতে তাওবা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাহলে তাদের কেবল জান-মালের নিরাপত্তাই প্রদান করা হবে না– উপরন্তু তারা মুসলমানদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজ তাদেরকে নিজেদের সমাজে মিলিয়ে নেবে। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও এ সমাজে সব রকমের সামাজিক অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সকলক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ সুবিধার সব পথ তাদের জন্যেও উন্মুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তাদের ঈমানের যথার্থতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই তাদের কার্যতঃ নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের সাক্ষ্য পেশ করা হবে। বস্তুত নামায ও যাকাত ব্যতীত তাদের ঈমান কিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে? কেননা ঈমান তো মৌলিক কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না বরং ঈমান ঐ বিপ্লবাত্মক বাস্তবতা যে, যখন এর শিকড় মানুষের অন্তরের যমীনে মজবুতভাবে প্রোথিত হয়, তখন তার চরিত্রে এমন এক বৃক্ষের জন্ম হয় যার শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে মানুষের গোটা জীবনের ওপর ছায়া ফেলে এবং এর সুমিষ্ট ফলরাজি দ্বারা সার্বিকভাবে সব সময় গোটা সমাজ উপকৃত হতে থাকে।

এমতাবস্থায় কারো ঈমানের যথার্থতা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে যার ঈমান বৃক্ষের দু'চারটি শাখা, জীবন ও সমাজের ওপর ছায়া ফেলেনি? বস্তুত কাফির মুশরিকদের কুফরী জিন্দেগীর বুনিয়াদী ভ্রষ্টতা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে ঐ নামায থাকে না, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে ও আল্লাহর সার্থক বান্দায় পরিণত করে। এভাবে তাদের জিন্দেগীতে যাকাতও থাকে না যা মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে আল্লাহর বান্দাদের অধিকার ও দাবী পূরণের অনুভূতি জন্মায়।

মুসলমানরা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করলে তাদের সর্বপ্রথম কাজ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায ও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামে ক্ষমতা গ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো নামায কায়েম করা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ-

www.pathagar.com

মুমিনরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমি যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)

সমাজে নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই যে ইসলামী ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য উল্লেখিত আয়াত তা অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে। আর নামায ও যাকাত ব্যবস্থা চালু হবার তাৎপর্য হলো, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে জেনে তাঁর দাসত্বের জীন্দেগীতে অভ্যস্ত হবে এবং দুনিয়া পূজার মত জঘন্য অপতৎপরতা থেকে পাক-পবিত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সচেতনার ব্যাপক বিকাশ ঘটাবে।

মুসলিম শাসক গোষ্ঠী নিজেদের জারি করা আইন বিধানের শুধুমাত্র অনুসরণই করবে না রবং সে আইন পালনের ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে এমন পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করবে, যাতে গোটা জাতীর মধ্যে ঐ আইন পালনের সার্থক প্রেরণার উদ্রেক হয়।

মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রে সরকারী সমস্ত ক্ষমতা নামায কায়েম ও সমাজে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যয়িত হবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র নামাযই মানুষকে মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের উপযুক্ত পাত্র হিসেবে গড়ে তোলে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ-وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا-
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّى مَعَكُمْ-لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ-

আল্লাহ বনী ইসরাইলের নিকট হতে দাসত্বের পূর্ণ ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারজন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি যদি তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। (সূরা আল মায়েদা-১২)

বনী ইসরাইলের বারটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্ব-স্ব গোত্র হতে একজন করে নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। নকীবের কাজ ছিল নিজ গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম প্রদর্শিত পথের দিকে আহ্বান করা তথা মহান আল্লাহর গোলামী করার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। আর বনী ইসরাইলদের কর্তব্য ছিল এই নকীবদের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পুরাপুরিভাবে প্রতিপালন করা। আল্লাহ তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহায্য সহযোগিতা তোমাদের প্রতি তোমাদের নামায কায়েম রাখা অবধি অবশ্যই বলবৎ থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামায আদায় ত্যাগ করবে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

নামায আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস তথা একমাত্র নামাযই মানুষকে মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে বলেছিলেন–

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ-قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً-نِّصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً-اَوْزِدْ

عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً-اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً-

হে কম্বল আচ্ছাদনকারী। রাত্রিকালে সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো। কিন্তু কম অর্ধেক রাত্রি কিংবা তা হতে কিছুটা কম করে দাও, অথবা তা হতে কিছু বেশি বৃদ্ধি করে। আর কোরআন থেমে থেমে পড়ো। আমি তোমার ওপর এক দুর্বহ ফরমান পালনের দায়িত্ব অর্পণ করবো। (সূরা আল মুয্‌যাম্মিল-১-৫)

"ভারী ফরমান পালনের দায়িত্ব" বলে উল্লেখিত আয়াতে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব পালন পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব পালনের চেয়ে ভারী এবং কঠিন। মহান আল্লাহর বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত এই গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতি পালন করা করো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ জন্য গভীর রাতে একাকী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় নম্রতা সহকারে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামায আদায় করাই এর জন্য শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম। এতেই মানুষের মধ্যে ঐ রুহানী শক্তির সৃষ্টি হতে পারে যাতে সে সকল বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়পদে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে পারে এবং সর্বপ্রকার নাজুক ও কঠিন মুহূর্তেও দ্বিনী আন্দোলনের কাজ যথাযথভাবে আন্‌জাম দিতে পারে। নামায ধৈর্য ও দৃঢ়তার একমাত্র উৎস এবং এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন-

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا-اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ-وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ-وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ-اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ-ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ-وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ-

হে রাসূল! তুমি ও তোমার সাথীরা, যারা কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিক ফিরে এসেছে সত্য ও সঠিক পথে অবিচল থাকো, যেমন তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমা অতিক্রম করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালিমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে। তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে। আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছুবে না। আর দেখ, নামায কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করার পথ। আসলে সৎকাজ অসৎ কাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক, তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে। আর সবর করো, কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না। (সূরা হুদ-১১২-১১৫)

www.pathagar.com

সূরায়ে হুদ মুসলমানদের মক্কার জিন্দেগীর শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের একটি। এ সময়টা মুসলমানদের জীবনে চরম পরীক্ষার সময় ছিল। মুসলমানগণ এ সময় নিদারুন অসহায় অবস্থায় জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল। মক্কার কাফির মুশরিকরা এই হকপন্থী লোকদের ওপর মক্কার বিস্তীর্ণ এলাকা সংকীর্ণ করে রেখেছিল।

এই অসহায়ত্ব ও জুলুমের নাজুক অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের হিদায়াত প্রদান করে বলেন– দেখ, তোমরা যে সত্য দ্বীন গ্রহণ করেছো, তা ঐ আল্লাহর দ্বীন, যার কর্তৃত্বে নিখিল জাহানের সবকিছুই রয়েছে। যিনি সকল শক্তির উৎস। তোমরা সে শক্তিধর মহান আল্লাহর অনুগত সিপাহী। দেখ, ঐ জালিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঘাবড়ে গিয়ে কল্যাণের খাতিরে কোনো সমঝোতার জন্য তাদের প্রতি ঝুঁকবে না।

অন্যথায় মনে রেখ, কঠোর নীতিধর আল্লাহর আঘাত হতে তোমাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এই আল্লাহ-ই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও ব্যবস্থাপক। একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। তাঁর প্রেরিত দ্বীনে হকের ওপর একাগ্রচিত্তে মজবুত হয়ে থাক। তাঁরই কাছে ধৈর্য ও দৃঢ়তার জন্যে দোয়া করো নামাযের মাধ্যমে, তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করো। সম্পর্ক তার সাথেই মজবুতভাবে গড়ো যথাযথভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমে।

বস্তুত দ্বীনে হকের অনুসরণই উভয় জাহানের কল্যাণের নিশ্চয়তা। অবশ্য এপথ নানা ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ও পরীক্ষার দুর্গম পথ। কিন্তু আল্লাহর অনুগত ধৈর্যশীল বান্দারা পথের এই দুর্গমতা দেখে কখনো হক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয় না। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তোমরা দ্বীনি আন্দোলনের পথের এসব নাজুক অবস্থা ও কাঠিন্য বরদাশত করার শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো। এই নামাযই ধৈর্য ও দৃঢ়তা সঞ্চয়ের উৎস। এর মাধ্যমেই বান্দার মধ্যে ঐ শক্তি অর্জিত হয় যা তাকে বিরোধিতার তীব্র ঝড় ঝঞ্ঝায় পাহাড়ের মত অনড় অটল করে রাখে।

অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে যাও যেন তোমাদের মাঝে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের ঐ অসীম শক্তি সঞ্চিত হয়। ফলে কঠিনতম অবস্থায়ও তোমরা অনড়-অটল থাকতে পারো। আল্লাহভীতি ও নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তাকে সত্যানুসন্ধানী বানায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছতা আনে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ–

হে নবী! তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। (সূরা আল ফাতির-১৮)

www.pathagar.com

আল্লাহর গোলামী ও নামায

প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায একজন মানুষকে এ কথা পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর গোলাম এবং তাকে মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। শুধু মাত্র নামাযের সময়ই মানুষ আল্লাহর গোলাম নয়– নামাযের বাইরের জীবনেও সে আল্লাহর গোলাম, এ কথাটিই নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহকে খুব বেশী পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা জুম'আ-১০)

আল্লাহ তা'য়ালার একনিষ্ঠ গোলাম হওয়ার জন্য এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করার জন্য যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অপরিহার্য, নামায সেসব অপরিহার্য গুণ-বৈশিষ্ট্য কিভাবে মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখিত আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, নামায আদায় হয়ে গেলে নামাযের স্থানে নীরবে বসে না থেকে পৃথিবীতে জীবন ধারনের উপকরণ যোগাড় করার জন্য কর্মক্ষেত্রে যাও এবং নিজের মনিব আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে তথা নিজেকে মালিকের অনুগত গোলাম হিসাবে গড়তে সক্ষম হবে।

নামায আদায় করার জন্য যখন একজন মানুষ দণ্ডায়মান হয়, তখন তার মনে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, সে গোটা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাশক্তিধর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সে সিজ্‌দা নিবেদন করছে। যা কিছুই সে মুখে আবৃত্তি করছে, তা সবই মহান মালিকের উদ্দেশ্যে। নামাযে সে উঠা-বসা, রুকু-সিজ্‌দা দেয়া ইত্যাদি যা করছে, তার সবটাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ নামাযের মধ্যে সে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহকেই স্মরণে রাখছে। এভাবে নামায মানুষকে এ কথাই জানিয়ে দিলো যে, সে নামাযের মধ্যে যেমন আল্লাহকে স্মরণ করেছে, অনুরূপভাবে নামাযের বাইরের জীবনে প্রত্যেক মুহূর্তে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে। মানুষকে তার মনিব মহান আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য শয়তান ও তার অনুচরবৃন্দ সক্রিয় রয়েছে, অনুরূপভাবে মানুষের মনের মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি নামক শয়তান রয়েছে, সে শয়তানও মানুষকে তার আপন স্রষ্টা আল্লাহর দাসত্ব থেকে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য সক্রিয় রয়েছে।

www.pathagar.com

সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে শয়তানি শক্তি মানুষকে তার মনিব আল্লাহর দাসত্বের পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। শয়তানের এই সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ নামায এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, 'শয়তান তোমাকে প্ররোচনা দিচ্ছে তোমার মালিক আল্লাহ তা'য়ালার অপছন্দনীয় কাজ করার জন্য, কিন্তু তুমি এ কথা স্মরণে রাখো যে, তুমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম। তাঁর অপছন্দের কোনো কাজে তুমি নিজেকে জড়িত করবে না।'

একজন মানুষ গোটা রাত ব্যাপী নিদ্রা মগ্ন রইলো, প্রত্যুষে নিদ্রা ভঙ্গ হতেই দিনের শুরুতে সমস্ত কাজের পূর্বে ফজরের নামায তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো, 'তুমি আল্লাহর গোলাম।' দিনের আলোয় মানুষ যখন নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকে, কাজের ঝামেলায় মন-মানসিকতা বিষিয়ে ওঠে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায মানুষকে আল্লাহর গোলামীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরপর গোটা দিনের কর্মক্লান্ত শরীর বিশ্রাম পিয়াসী হয়ে ওঠে। নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার কোলে দেহ এলিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখনও ইশার নামায মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি মহান আল্লাহর গোলাম। এভাবে নামায়ই মানুষকে এ কথা বার বার আল্লাহর গোলামীর কথা স্মরণ করাতে থাকে এবং এই পদ্ধতিতেই একজন মানুষকে নামায আল্লাহর ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে সূরা জুমআ'য় নামাযকে যিকর্ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হলেন মনিব আর মানুষ হলো তাঁর গোলাম, গোলামকে মনিবের আদেশ পালন করতে হবে– এই দায়িত্বানুভূতি নামায মানুষের ভেতরে সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি কাজের জন্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক দেশেরই নানা ধরনের বাহিনী রয়েছে। এসব বাহিনীকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ না দিলে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে কেউ যদি অনিচ্ছুক হয় বা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

অনুরূপভাবে নামায হলো একজন মানুষের জন্য প্রশিক্ষণ বিশেষ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মানুষকে আল্লাহর আইন-বিধান মেনে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। নামাযের মাধ্যমে কেউ যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বা অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে তার পক্ষে মহান আল্লাহর গোলাম হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এ জন্যই হাদীসে নামায আদায় করাকে কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে– যে ব্যক্তি নামায

www.pathagar.com

ছেড়ে দেয় সে ব্যক্তি মুসলমানই নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরে কয়েক যুগব্যাপী এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, যারা নামায আদায় করে না অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেবে- এমন কথা কল্পনাও করা যেতো না।

শুধু তাই নয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে আযান শোনার পরে যারা মসজিদে নামাযের জামাআতে শামিল হতো না, তাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হতো না। স্বার্থের কারণে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, ঐসব মুনাফিকের দলও আযান শোনার পরে মসজিদে নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হতো। কারণ তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত ছিলো যে, মসজিদে এসে নামায আদায় না করলে মুসলমানদের দলে অবস্থান করা যাবে না।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে রাসূলের যুগের মুনাফিকদের নানা ধরনের খারাপ গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনা একত্রিত করলে এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না, যে আয়াতে বলা হয়েছে- মুনাফিকরা নামায পড়ে না। বরং এ কথা বলা হয়েছে যে, তারা নামায পড়ে বটে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করে না। মুসলমানদের দলে শামিল থেকে স্বার্থোদ্ধার করার জন্য একান্ত অনিচ্ছা ও অবহেলার সাথে নামায পড়ে। নামায পড়বে না- অথচ বর্তমান যুগের ন্যায় বেনামাযীকে মুসলমান বলা হবে, এমন কথা সে যুগে কারো চিন্তার জগতেও আশ্রয় পেতো না।

একজন মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে নিজেকে অসংখ্য কাজের সাথে জড়িত হতে হয় এবং নানাবিধ আচরণ করতে হয়। এই নানাবিধ আচরণ ও অসংখ্য কাজ তাকে করতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ পালন করার প্রশিক্ষণ না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টার জীবনে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। চব্বিশ ঘন্টার জীবনে কোনো মানুষ যদি মাত্র পাঁচবার আল্লাহর আদেশে নামাযই আদায় না করে, তাহলে তার পক্ষে কি করে মহান আল্লাহর অন্যান্য আদেশ পালন করা সম্ভব?

এজন্যই একজন মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে পাঁচবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেনো তার ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ পালন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। একনিষ্ঠভাবে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য আদেশ-নিষেধও একনিষ্ঠভাবে পালন করার জন্য তৎপর হবে। আর আযান শোনার পরে যে ব্যক্তি নামাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে নিজের মনিব হিসাবে মানে না, নিজেকে সে আল্লাহর দাস হিসাবে গড়তে ইচ্ছুক নয় এবং আল্লাহর দাসত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নামায অপরাধ থেকে বিরত রাখে

যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না, অথচ মুখে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস আছে বলে দাবি করে, তার এ দাবির পক্ষে কোনো সততা নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মানে না এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি যার বিশ্বাস নেই, তার পক্ষে নামায আদায় করা এক দুঃসাধ্য কাজ এবং অসহনীয় বিপদ বিশেষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ-

নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেও কঠিন নয়, যারা বিশ্বাস করে যে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা-৪৫-৪৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এই বাধ্যবাধকতায় যার বিশ্বাস রয়েছে তার পক্ষে যথারীতি নামায আদায় করা সামান্যতম কষ্টের কাজ তো নয়ই– বরং জ্ঞান থাকতে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়াই তাদের কাছে পৃথিবীর বুকে সবথেকে কঠিন কাজ। যারা জেনে বুঝে একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করে তাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তার প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে।

আলোয়-অন্ধকারে, লোকালয়ে-নির্জনে, পানির অতল তলদেশে, মহাকাশের উচ্চমার্গে যেখানেই সে অবস্থান করুক না কেনো, সর্বত্রই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখছেন এবং সে কি বলছে তা তিনি শুনছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে সক্ষম হলেও আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা সম্ভব নয়। অপরাধ করে গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে সে অপরাধ আড়াল করা গেলেও আল্লাহর কাছে তার অপরাধ অজানা থাকে না। পৃথিবীর মানুষের দন্ড থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা গেলেও আল্লাহর দন্ড থেকে নিরাপদ রাখা যাবে না।

একনিষ্ঠভাবে নামায আদায়কারীর মধ্যে নামায এই চেতনাই জাগ্রত রাখে। ফলে তার পক্ষে কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হওয়া সম্ভব হয় না। নামায সৃষ্ট এই চেতনাই মানুষকে অপরাধ মুক্ত রাখে এবং সে মানুষ যে কেনো কর্মের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধের সীমা অনুসরণ করে চলে। জেনে বুঝে যথাযথভাবে সঠিক অর্থে নামায আদায়কারীর নামায সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

নিশ্চিতভাবেই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত-৪৫)

www.pathagar.com

নামাযের অসংখ্য অবদান রয়েছে, এসব অবদানের মধ্যে এটাও একটি অবদান যে- নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। উল্লেখিত আয়াতে নামাযের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার দুটো দিক রয়েছে। এর একটি গুণ হলো অনিবার্য গুণ ও অপর গুণটি হলো কাঙ্খিত গুণ। অনিবার্য গুণ হলো, নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর কাঙ্খিত গুণ হলো, নামায আদায়কারী কার্যক্ষেত্রে অশ্লীল, নোংরা বা খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে- এটা কাঙ্খিত গুণ।

নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে- অর্থাৎ নামায অবশ্যই নামায আদায়কারীকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবেই। নামায আদায়ের পূর্ব প্রস্তুতি ও নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষকে অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখার যতগুলো হাতিয়ার রয়েছে, একমাত্র নামাযই হলো হলো সবথেকে কার্যকর হাতিয়ার।

নামায প্রতিদিন একজন মানুষকে পাঁচবার জানিয়ে দেয় যে, সে পৃথিবীতে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নয়। বরং সে আল্লাহর গোলাম, যিনি তাকে সর্বত্র দেখছেন, তার মনের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প সম্পর্কেও তিনি অবহিত রয়েছেন। মৃত্যুর পরের জীবনে আল্লাহর আদালতে তাকে যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে। এসব কথা নামায মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েই বিরত থাকে না- বরং কার্যক্ষেত্রে নামায আদায়ের প্রস্তুতি ও নামায আদায় কালে সে যেনো গোপনে আল্লাহর কোনো আদেশ অমান্য না করে, সেই প্রশিক্ষণও নামায দিচ্ছে।

নামায আদায়ের পূর্বশর্ত হলো শারীরিক পবিত্রতা, পরনের বস্ত্রের পবিত্রতা ও ওজু করা। কেনো ব্যক্তি মসজিদে নামায আদায়ের জন্য এলে সে ব্যক্তি শারীরিকভাবে পবিত্র কিনা অথবা তার পরিধানের বস্ত্র পবিত্র কিনা বা সে ওজু করেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার কেনো উপায় নেই। কেউ এ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেনো প্রশ্নও করে না।

তবুও যে ব্যক্তি নামায আদায় করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি জেনে বুঝে অপবিত্র দেহে, অপবিত্র বস্ত্রে বা অপবিত্র স্থানে ওজু ব্যতীতই নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। কারণ তার চেতনার জগতে এই ভয় জাগ্রত রয়েছে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তা'য়ালা দেখেছেন সে ওজু করেছে কিনা। কেউ না জানলেও আল্লাহ তা'য়ালা জানছেন, তার দেহ ও দেহের পোষাক পবিত্র রয়েছে কিনা।

নামায আদায়কালে যথাস্থানে নিয়ম অনুসারে সে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা এবং বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়েছে কিনা, এসব জানার উপায় নেই। কেউ নামায আদায়কারীকে প্রশ্নও করে না, 'আপনি নামাযে সূরা ফাতিহার পরিবর্তে অন্য সূরা দিয়ে বা কোনো কবির কবিতা দিয়ে নামায শুরু করেননি তো? অথবা সিজদায় গিয়ে যথারীতি সিজদার তস্‌বীহ পড়েছেন তো?' তবুও নামায আদায়কারী জেনে বুঝে এ ধরনের কোনো কাজ করে না। যেখানে যে সূরা, দোয়া-দরুদ ও তস্‌বীহ্ পড়তে হবে, সেখানে সে তাই পড়ে।

এভাবে একজন মানুষ যখন প্রতিদিন আল্লাহর বিধান অনুসারে নির্ধারিত নিয়মে পাঁচবার যথারীতি নামায আদায় করে, তার অর্থ তো এটাই দাঁড়ায় যে- এই নামাযই চব্বিশ ঘন্টার

www.pathagar.com

মধ্যে পাঁচবার তার বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করছে, তার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করছে, তাকে দায়িত্ববান মানুষে পরিণত করছে। যে বিধানের প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তা মেনে চলার জন্য পৃথিবীতে কোনো প্রহরার ব্যবস্থা থাক বা না থাক, বাইরের কোনো শক্তি থাক বা না থাক এবং পৃথিবীবাসী তার কাজের অবস্থা জানুক বা না জানুক, আল্লাহর ভয়ে এবং নিজের আনুগত্য প্রবণতার প্রভাবাধীনে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কোনো অবস্থায় সে সেই বিধানই মেনে চলবে, যার প্রতি সে ঈমান এনেছে। নামায এভাবেই একজন মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সুতরাং নামায শুধুমাত্র মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ-গর্হিত কাজ থেকেই বিরত রাখে না বরং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে নামায ব্যতীত এমন কোনো দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নেই, যা মানুষকে যাবতীয় অসৎ, গর্হিত ও দুষ্কৃতিমূলক কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এত অধিক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পৃথিবীতে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক ঘন্টার বা কয়েক দিনেরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অপরাধমুক্ত সমাজ ও প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যেও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাধ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে নানা ধরনের আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু কোনো ধরনের আইন বা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিই মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করতে পারে না। কিন্তু নামায যে প্রশিক্ষণ দেয়, এই প্রশিক্ষণ এত অধিক কার্যকরী যে, মানুষকে গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে।

ইসলামের সোনালী যুগের একটি ঘটনা। দিবাবসানে-গোধূলী লগ্নে একজন সুন্দরী তন্বী যুবতী নারী অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নির্জন পাহাড়ী পথ বেয়ে একাকী তার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলো। ক্রমশ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। যুবতীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সে দ্রুত পদক্ষেপে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। সহসা তার দৃষ্টি পড়লো এক যুবকের দিকে। সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী একজন যুবক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। অলাঙ্কারাদি লুণ্ঠিত ও ধর্ষিতা হবার ভয়ে যুবতীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে কাঁপতে কাঁপতে পথের ওপরে বসে পড়লো।

ধীর পদবিক্ষেপে যুবক ক্রমশ যুবতীর দিকে এগিয়ে এসে তার ভয়বিহ্বলা চোখের ওপরে চোখ রেখে পরম নির্ভরতার কণ্ঠে বললো, 'মা, আমাকে ভয় পেয়ো না, তুমি কোথায় যাবে বলো, আমি প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌছে দেবো। আমার পরিচয় শোনো, আমি মুসলমান।' এ ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। নামায এভাবেই মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রেখেছে।

www.pathagar.com

দ্বীনের কাঠামোয় নামাযের গুরুত্ব

ঈমান আনার অর্থ শুধু মৌখিকভাবে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া নয় যে, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলবো। বরং ঈমান আনার অর্থ হলো, মৌখিকভাবে স্বীকৃতির দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে মহান আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করা বা বাস্তব আনুগত্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা একান্তই অপরিহার্য। পক্ষান্তরে বাস্তব আনুগত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন হলো নামায।

ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে, সেই ওয়াক্তের নামায যথারীতিভাবে আদায় করার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মুহূর্তকাল পূর্বে ঈমান আনলো, সে এ কথারই স্বীকৃতি দিলো যে- সে শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতিই দিলো না, বরং বাস্তবে এ কথা প্রমাণ করে দিলো যে, সে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে চলবে।

কোনো ব্যক্তি যদি সকাল দশটার সময় ঈমান আনে আর মাত্র দুই তিন ঘন্টা পরে যখন তার কানে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি প্রবেশ করে, তখনই তার ঈমান আনার দাবির স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণ পেশ করার সময় এসে উপস্থিত হয়। মুয়াজ্জিনের আহ্বান শোনার সাথে সাথে যদি ঈমানের দাবিদার উক্ত ব্যক্তি নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে জামাআতে শামিল হয়, তাহলে সে তার ঈমানের দাবির স্বপক্ষে বাস্তবে এ কথার প্রমাণ পেশ করলো যে, উক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালিত করবে।

আর যদি সে নামায আদায় না করে, তাহলে এ কথারই প্রমাণ দিলো যে, মুখে যে ঈমানের দাবি সে করেছে- তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পৃথিবীতে সে আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব করতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। সুতরাং নামায আদায় না করার মূল অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করা। আর আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ত্যাগ করে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবি করার কোনো ইখতিয়ার রাখে না। বেনামাযী কোনো ব্যক্তি মুসলিম সমাজ-সংগঠনের কোনো সুযোগ-সুবিধাও লাভ করতে পারে না।

ঐ ব্যক্তির জন্যই আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি তা মানতে ইচ্ছুক এবং এই বিধানের আনুগত্য করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে আগ্রহী। যে ব্যক্তি নামাযই আদায় করেন না, সেই ব্যক্তি তো এ কথারই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে- সে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে রাজী নয়। আল্লাহর বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি নামায আদায়ের মাধ্যমে এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, সে আপন মনিব আল্লাহর বিধান অনুসারে চলবে। এদিকেই ইংগিত করে আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন-

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ-وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهِ-

www.pathagar.com

তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে সে নিজেরই ভালোর জন্য করে। (সূরা ফাতির-১৮)

সুতরাং যাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর ভয় রয়েছে এবং ভয় যে রয়েছে, এ কথার বাস্তব প্রমাণ যারা দেয় নামায আদায়ের মাধ্যমে, আল্লাহর বিধান শুধু তাদেরই জন্য। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার অর্থই হলো দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন করা। আর আল্লাহর বিধান অনুসরণের মাধ্যমে যে ব্যক্তি দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জন করবে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করবে। পরকালের নে'মাত তথা জান্নাত ঐসব লোকদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবন-যাপন করতে চায়। এসব লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ-اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ-

আর যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। এই লোকেরা সম্মান ও মর্যাদা সহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা মা'আরিজ-৩৪-৩৫)

যারা জান্নাতে যাবে নামায আদায়কারী হওয়াটা তাদের প্রথম গুণ। যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা তাদের দ্বিতীয় গুণ। আর নামাযের সংরক্ষণ করা তাদের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের গুণ। নামাযের 'সংরক্ষণ' বলতে নামায সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্বসমূহ বোঝায়। যেমন যথাসময়ে নামায আদায় করা। নামায আদায়ের প্রস্তুতি হিসাবে দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। অজু সহীহভাবে করা এবং অজুতে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সর্বোত্তমভাবে ধৌত করা, যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সে স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। কিবলা নির্ধারণ করা, নামাযের মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা, নামাযের নিয়মাদি ও মূলভাবধারা অনুসরণ করা, নামায যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তার বিপরীত কর্মসমূহ পরিত্যাগ করা, নামাযের উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে নামাযকে ব্যর্থ করে দেয়া। এ ধরনের অনেক কিছুই নামাযের 'সংরক্ষণ' কথাটির মধ্যে রয়েছে।

নামাযে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূর বিষয়টি একান্তভাবে মনের সাথে জড়িত আর মনে যখন খুশূ-খুযূর সৃষ্টি হবে, তখন তার প্রভাব বাহ্যিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। কারো বশীভূত হয়ে, কারো সামনে একান্তভাবে নিজের দীনতা-হীনতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। মনের খুশূ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সিজদা দেয়ার উদ্দেশ্যে নামাযে দন্ডায়মান হলো অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়ালো, তখন তার গোটা সত্তা জুড়ে এ কথার প্রকাশ ঘটবে যে, সে কার সামনে দাঁড়ালো। মানুষ সাধারণত কোনো প্রতাপশালী ক্ষমতাধর লোকের সামনে গেলে তার সার্বিক আচরণে বিনয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে মানুষের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে এই বিশাল আকাশ ও যমিনের মালিক, যিনি অসীম ক্ষমতাধর তাঁর সামনে দন্ডায়মান হলে কতটা বিনয় প্রকাশ করা উচিত।

www.pathagar.com

মুফাস্সিরগণ বলেন, মনের খুশূ হলো, মানুষ আল্লাহর ভয়ে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ভয়ে, তাঁর অসীম প্রতাপ-প্রভাব, ক্ষমতা ও পরাক্রমের কারণে ভয়ে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে। আর শারীরিক খুশূ হলো, মানুষ যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোমল ভঙ্গিতে অবনত হয়ে যাবে। দৃষ্টি থাকবে অবনমিত এবং যা আবৃত্তি করবে, তা পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আবৃত্তি করবে। সমস্ত কিছুর ওপরে যিনি অসীম ক্ষমতাবান, সেই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কারণে তার মধ্যে স্বাভাবিক ভীতি সঞ্চার হবে এবং ভয়ের চিহ্ন তার গোটা অবয়বে ফুটে উঠবে।

নামাযের প্রাণই হলো খুশূ– এই খুশূ না থাকলে সে নামায হবে প্রাণহীন দেহের মতো মূল্যহীন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে নামায আদায়রত অবস্থায় দেখলেন, লোকটি তার মুখের দাড়ি বার বার নাড়াচাড়া করছে। তার এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, যদি তার মনে খুশূ থাকতো, তাহলে তার দেহেও খুশূর সঞ্চার হতো।

খুশূর বিষয়টি যদিও একান্তভাবে মনের সাথে সম্পর্কিত এবং মনে খুশূ সৃষ্টি হলে তার প্রভাব বাহ্যিকভাবে শরীরেও প্রতিভাত হয়। এরপরেও ইসলামী শরীয়াত নামায আদায়ের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করলে নামাযে খুশূ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং খুশূ বৃদ্ধি পেলে বা কমে গেলে নামাযের পদ্ধতিগত দিকসমূহকে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যেমন নামাযে তাড়াহুড়া না করা। যেখানে যা তিলাওয়াত করতে হবে তা যথারীতি ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করা। ওপরের দিকে বা ডানে বামে না তাকানো। দৃষ্টি সিজ্দার স্থানে স্থির রাখা। অকারণে কণ্ঠ দিয়ে কোনো রূপ শব্দ করা। পরিধানের কাপড় বার বার নাড়াচাড়া করা। গর্বিত ভঙ্গিতে না দাঁড়ানো।

মোটকথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে নামায আদায় করতে বলেছেন, অনুরূপভাবে নামায আদায় করা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন কেবলামুখী হয়ে তকবীর বলবে। (বোখারী ও মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা অর্জন। তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো নামাযের মধ্যে হারাম করা হয় এবং সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলোকে হালাল করা হয়। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল নামায আদায়কালে মাথা নীচু করতেন এবং তাঁর পবিত্র দৃষ্টি সিজ্দার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন। নামায আদায়রত অবস্থায় তিনি আকাশ বা ওপরের দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা যখন নামায আদায় করবে তখন এদিক ওদিক দৃষ্টি দেবে

www.pathagar.com

না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নিজের চেহারা বান্দার চেহারার দিকে নিবদ্ধ রাখেন। বান্দাহ্ যখনই সিজ্দার স্থান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালাও সে বান্দার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন।' (আবু দাউদ)

নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, 'এটা হচ্ছে বান্দার নামাযে শয়তানের ছোবল।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে তিনটি কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। প্রথমটি হলো, দুই সিজ্দার মাঝে সোজা হয়ে না বসে মোরগের মতো ঠোকর দেয়া অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে সিজ্দা দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো, কুকুর যে ভঙ্গিতে বসে সেই ভঙ্গিতে না বসা এবং তৃতীয়টি হলো, এদিক ওদিক না তাকানো। নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানোকে শিয়ালের তাকানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এমনভাবে তুমি নামায আদায় করো, যেনো তুমি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখছো। আর যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখো তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখেন।' এই অনুভূতি মনের মধ্যে জাগ্রত রেখে নামায আদায় করলে সেই নামাযে অবশ্যই খুশু সৃষ্টি হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে অজু করে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে, ভালোভাবে রুকু করে তাহলে এই নামায তার ছগীরা গোনাহ্সমূহের ক্ষতিপূরণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ্ থেকে নিজেকে হেফাজত করবে। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল নামাযে কিরাআত শেষ করে দ্রুত রুকুতে যেতেন না। কিরাআত শেষ হবার পরে তিনি ধীর স্থিরভাবে রুকুতে যেতেন। তিনি রুকুতে এমনভাবে পিঠ বাঁকাতেন যে, তাঁর পিঠে পানি ঢেলে দিলেও তা যেনো স্থির থাকে। অর্থাৎ তিনি ধনুকের মতো বাঁকানো ভঙ্গিতে রুকু করতেন না। ধীরে পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি রুকুর তাস্বীহ পাঠ করতেন– তাড়াহুড়া করে রুকুর তাস্বীহ পাঠ করা যাবে না।

তিনি বলেছেন, 'তোমরা রুকু-সিজ্দাহ্ পরিপূর্ণ করো। তুমি যখন তোমার দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখবে তখন আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখবে। তারপর একটু থামবে যে পর্যন্ত না প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিজ স্থানে স্থির হয়। তোমার পিঠ সমানভাবে বাঁকাবে।' হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি পিঠ-মাথা উঁচু-নীচু করতেন না। বরং মাথা পিঠের সাথে সমানভাবে রাখতেন।

একদিন তিনি একজন লোককে দেখলেন যে, লোকটি নামাযে রুকু পরিপূর্ণ করছে না এবং সঠিকভাবে সিজ্দাও দিচ্ছে না। বরং পাখির মতো ঠোকর দিচ্ছে। লোকটিকে এভাবে নামায আদায় করতে দেখে তিনি বললেন, 'ঐ লোকটি এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল হবে না। সে নামাযে কাকের অনুরূপ ঠোকর দিচ্ছে। যে লোক রুকু পরিপূর্ণ করে না এবং সিজ্দায় ঠোকর দেয়, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ক্ষুধার্ত লোকের মতো, যে একটি অথবা দুটো খেজুর আহার করে কিন্তু এতে তার কোনো লাভ হয় না। অর্থাৎ লোকটির ক্ষুধা মিটে না।'

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নামায চোর হচ্ছে সবথেকে নিকৃষ্ট চোর।' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নামায চুরি করা হয়?' তিনি বললেন, 'রুকু-সিজ্দা পরিপূর্ণ না করা।' তিনি আরো বলেন, 'সে ব্যক্তির নামায হয় না, যে রুকু-সিজ্দায় পিঠ সোজা করে না।'

আল্লাহর রাসূল ধীর স্থিরভাবে রুকু করতেন এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে তিনি বেশ সময় ব্যয় করে তারপর সিজ্দায় যেতেন। তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে এতটা সময় ব্যয় করতেন যে, লোকজন ধারণা করতো তিনি বোধহয় সিজ্দায় যাবার কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্তির সাথে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে বলেছেন, 'যখন তুমি রুকু থেকে মাথা তুলবে তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেনো হাড়সমূহ তার গ্রন্থিসমূহের সাথে স্থির হয়ে যায়। এমন না করলে তোমাদের নামায পরিপূর্ণ হবে না।' (বোখারী)

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা সেই লোকের নামাযের দিকে দৃষ্টি দেন না, যে লোক রুকু সিজ্দায় পিঠ সোজা করেনা।' (আহ্মদ)

তিনি এমনভাবে সিজ্দা করতে আদেশ দিয়েছেন, যেন দেহের হাড়ের প্রত্যেকটি গ্রন্থি শান্ত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে বা দৃষ্টিকটু ভঙ্গিতে সিজ্দা করতে নিষেধ করেছেন। সিজ্দায় প্রশান্তির সাথে সিজ্দায় তাস্বীহ তিলাওয়াত করতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। স্পষ্ট উচ্চারণে পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং সিজ্দা করা হচ্ছে অর্থাৎ মাথা রাখা হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতী পায়ের ওপরে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্দা দেয়, তখন সে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং ধীর স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে আপন মালিক মহান আল্লাহকে সিজ্দা দিতে হবে। কোনো ধরনের ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া করা যাবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যাকে আমি কিয়ামতের দিন চিনতে পারবো না।' সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অসংখ্য মানুষের মধ্যে আপনি কি করে চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'ঐ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি, তুমি যদি ঘোড়ার কোনো আস্তাবলে প্রবেশ করো আর সেখানে যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে এমন একটি ঘোড়া থাকে যার পায়ের নীচে ও মুখ সাদা থাকে তাহলে তুমি সেটিকে পৃথকভাবে চিনতে সক্ষম হবে না?' সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, 'অবশ্যই চিনতে সক্ষম হবো।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সিজ্দার কারণে তাদের অবয়ব হবে শুভ্র এবং অজুর কারণেও তাদের হাত-পা শুভ্র দেখাবে।' (তিরমিযী)

বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আখিরাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোনো জাহান্নামীর প্রতি করুণা করতে চাইবেন, তখন তিনি ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দিয়ে বলবেন,

www.pathagar.com

'যারা আমার ইবাদাত করতো (অর্থাৎ যারা আল্লাহর ইবাদাত করতো বটে কিন্তু গোনাহ্গার ছিলো) তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো।' ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর আদেশ পালন করবেন, তাঁরা সিজ্দার স্থান দেখে ঐসব লোকদেরকে চিনতে পারবেন, যারা আল্লাহকে সিজ্দা দিতো। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা সিজ্দার স্থান জাহান্নামের আগুনে পোড়া হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সমস্ত দেহ জ্বালিয়ে দিলেও সিজ্দার স্থান জ্বালাতে পারবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর গোটা জমীন আমার উম্মতের জন্য মসজিদ এবং পবিত্র করা হয়েছে। যখন ও যেখানে যে মুহূর্তে নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তার মসজিদ এবং সেখানেই পবিত্রতা। আমার পূর্বের নবী-রাসূলের উম্মতদের জন্য কঠিন নিয়ম ছিলো। তারা শুধুমাত্র গীর্জায় নামায আদায় করতো।

প্রথম সিজ্দা দেয়ার সাথে সাথে তাড়াহুড়া করে দ্বিতীয় সিজ্দা দেয়া যাবে না। প্রথম সিজ্দা যেমন প্রশান্তির সাথে ধীর স্থিরভাবে দিতে হবে, অনুরূপভাবে প্রথম সিজ্দা দিয়ে এমনভাবে সোজা হয়ে বসতে হবে যেনো দেহের অস্থিসমূহ যথাস্থানে পৌছে যায়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল দুই সিজ্দার মাঝখানে আরেক সিজ্দার সমপরিমাণ সময় ব্যয় করতেন। প্রথম সিজ্দা দিয়ে তিনি কখনো কখনো এতটা সময় ব্যয় করতেন যে, লোকজন মনে করতো, তিনি বোধহয় দ্বিতীয় সিজ্দা দেয়ার কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ এমন না করলে (অর্থাৎ প্রথম সিজ্দা দিয়ে প্রশান্তির সাথে সোজা হয়ে না বসলে) তার নামায পরিপূর্ণ হবে না। (আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় যেমন বিভিন্ন ধরনের দোয়া করতেন অনুরূপভাবে প্রথম সিজ্দা দিয়ে সোজা হয়ে বসেও দোয়া করতেন। কারণ সিজ্দার সময় যে দোয়া করা হয়, তা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল যেভাবে নামায আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে যেভাবে নামাযের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে নামায আদায় করতে হবে, তাহলে অবশ্যই নামাযে একাগ্রতা, বিনয় তথা খুশূ-খুযূ সৃষ্টি হবে। নামাযের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়- এমন কোনো কাজ নামাযের মধ্যে করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নামায আদায়ের সময় যে নিয়ম-নীতি ও আদব-কায়দা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে। নামায আদায়ের সময় জেনে বুঝে নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা ধরনের চিন্তা ও কল্পনা মনের জগতে প্রবেশ করা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। মানুষের মন এমন এক জিনিস যা কখনো নীরব থাকে না। কিন্তু নামায আদায়ের সময় পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় মন যেনো আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেনো তারই আর্জি পেশ করে। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহকে দেখছি না কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন এবং আমার প্রত্যেকটি স্পন্দনের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখছেন' এই অনুভূতি নামায আদায়ের সময় হৃদয়ে জাগ্রত রাখলে মন অন্য

www.pathagar.com

চিন্তা-কল্পনা থেকে মুক্ত থাকবে আশা করা যায়। নামাযের মধ্যে নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন চিন্তা ও কল্পনা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায় তাহলে যখনই অনুভূতি সজাগ হবে যে, 'আমি নামায আদায় করছি এবং আমার মনে কি কল্পনা হচ্ছে, সেটাও আল্লাহ তা'য়ালা জানতে পারছেন' তখনই অবান্তর চিন্তা-কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত করে নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে, কোনো বিষয় প্রকাশ করা হোক বা গোপন করা হোক এবং মনের জগতে যা কিছু চিন্তা ও কল্পনা করা হয়, সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'য়ালা হিসাব গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর না-ই করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

প্রভাবহীন নামায

জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন তথা সচেতন কোনো মানুষের পক্ষে উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ করা সম্ভব নয় এবং যে কাজে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, এ ধরনের কোনো কাজও কেউ করবে না। অর্থাৎ মানুষ এমন কাজের পেছনেই সময় ব্যয় করে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে, অনিবার্যরূপে যে কাজের ফল লাভ করা যাবে।

সুতরাং যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নামায আদায়ের ব্যাপারে এত তাগিদ করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে নামায আদায়কারীকে অবশ্যই অবগত হতে হবে। কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকলে সেই কাজের বাঞ্ছিত ফল আশা করা বৃথা। যে ব্যক্তি নামায আদায় করছে তার অন্তত নামায সম্পর্কে এতটুকু ধারণা থাকতে হবে, কোন্ সে সত্তা যার উদ্দেশ্যে সে সিজ্দা দিচ্ছে। কোন্ সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করছে, নামাযে সে কি পড়ছে এবং এগুলোর অর্থ কি। নামায তাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, নামায সংক্রান্ত এসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সে নামায- নামায আদায়কারীর ওপরে কি করে প্রভাব বিস্তার করবে?

এ কারণেই দেখা যায়, নামায আদায় করে অথচ মিথ্যা কথা ত্যাগ করতে পারেনি। ওজনে কম দিচ্ছে, মানুষকে ঠকাচ্ছে, অপরের স্বার্থ আত্মসাৎ করছে এবং নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হচ্ছে। এ জন্যই অনেককে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়, নামায কি সত্যই মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, নামায আদায় করার পরও অপরাধ মুক্ত থাকা না থাকা নির্ভর করে নামাযী ব্যক্তি আত্মিক সংশোধন ও পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে নামাযের মাধ্যমে কতটা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তার ওপর। ব্যক্তি যদি নামায থেকে উপকৃত হবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে এবং এ জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাহলে নামাযের সংশোধনমূলক প্রভাব নামাযী ব্যক্তির ওপরে

www.pathagar.com

পড়বে। নতুবা পৃথিবীর কোনো সংশোধন ব্যবস্থা এমন ব্যক্তির ওপর কার্যকর হতে পারে না যে ব্যক্তি সংশোধনমূলক প্রশিক্ষণের প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত নয় অথবা জেনে বুঝে তার প্রভাবকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, একজন ছাত্র যদি নিজেকে ভালো ছাত্র হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয় এবং পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল লাভে প্রত্যাশী হয়, তাহলে সেই ছাত্রকে লেখাপড়ার পেছনে সময় ব্যয় করতে হবে। ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক মন্ডলী যে ধরনের পরামর্শ দেন এবং যে পদ্ধতিতে লেখাপড়া করতে বলেন, তা ছাত্রকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ছাত্র যথারীতি শিক্ষাঙ্গনে গেলো, শিক্ষক মন্ডলী যথাযথ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলেন, কিন্তু ছাত্র তা গ্রহণ করলো না। তাহলে সে ছাত্র কি করে ভালো ফলাফল লাভ করবে? অনুরূপভাবে নামায যে শিক্ষা দেয়, সেই শিক্ষা নামাযী যদি গ্রহণ না করে শুধু নামাযের সময় হলে মসজিদে গেলো আর নামাযের নামে ওঠা-বসা করলো। এই নামায তো ব্যক্তির ওপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে, শরীরের পরিপুষ্টি ও প্রবৃদ্ধির জন্য খাদ্য গ্রহণ একান্তই অনিবার্য। খাদ্য তখনই শরীরের পুষ্টি সাধন করবে, যখন পাকস্থলীকে খাদ্য হজম করার সুযোগ দেয়া হবে। যদি কেনো ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করার সাথে সাথে বমি করে গ্রহণকৃত খাদ্য উদগীরণ করে দেয়, তাহলে খাদ্য কিভাবে দেহের পরিপুষ্টি সাধন করবে? খাদ্য গ্রহণ করে সেই খাদ্য বমি করে ফেলে দিয়ে কেউ যদি খাদ্যের দোষ দেয় যে, 'এই খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন করতে সক্ষম নয়' তাহলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলা যাবে? এই ব্যক্তি সম্পর্কে তো এ কথাই বলতে হবে, লোকটি খাদ্য গ্রহণ করে না।

সুতরাং নামায আদায় করার পরও যে ব্যক্তি অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে না, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তো এ কথাই বলতে হবে– প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি নামায আদায় করে না। খাদ্য গ্রহণ করেও বমি করে ফেলে দেয়ার অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে ঐ নামাযী ব্যক্তি, যে নামায আদায় করার পরও নিজেকে অসৎ কাজে জড়িত রাখে। এই ধরনের নামাযী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ–

যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তার নামাযই হয়নি। (ইবনে আবী হাতেম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি কথা এভাবে উদ্ধৃত করেছেন–

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِيْدُ بِهَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا–

যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেনি তাকে তার নামায আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। (তাবারানী)

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

لاَصَلوٰةَ لِمَنْ لَّمْ يَطِعُ الصَّلوٰةَ وَطَاعَةُ الصَّلوٰةِ اِنْ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করেনি তার নামাযই হয়নি আর নামাযের আনুগত্য হচ্ছে, নামুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। (বাইহাকী)

এ জন্য ইমাম জাফর সাদিক (রাহঃ) বলেছেন, নামায আদায়কারী ব্যক্তি তার নামায কবুল হয়েছে কিনা যদি তা জানতে চায়, তাহলে তাকে দেখতে হবে, সেই ব্যক্তি অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে কতটা দূরে অবস্থান করছে। নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, তার নামায কবুল হয়েছে। (রুহুল মা'আনী)

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশায় রোগী চিকিৎসকের কাছে যায় এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্রানুসারে ওষুধ সেবন করে। রোগী যদি অকাট মূর্খ হয়, তাহলে চিকিৎসকের কাছ থেকে ব্যবস্থা পত্র ভালোভাবে বুঝে নেয়, তারপরও বাড়িতে এসে ওষুধ খেতে যেনো কোনো ভুল না হয়, এ জন্য সে লেখাপড়া জানা ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা পত্র অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করতে থাকে। নিজে ব্যবস্থা পত্র অনুসারে ওষুধ ব্যবহার করলে ভুল হতে পারে, এ কারণেই সে ব্যক্তি লেখাপড়া জানা ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করে।

লেখাপড়া না জানার কারণে নিজে জমির দলীল বুঝে না, এ কারণে অর্থ ব্যয় করে উকিলের সাহায্য গ্রহণ করে। যেনো তার জমি কোনোভাবে অন্যের দখলে চলে না যায়। স্বার্থের কারণে একজন মূর্খ লোকও যদি লেখাপড়া জানা ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে যে নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রেখে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত করবে, সেই নামায সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা কেনো অনুভব করা হবে না?

নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বছরের পর বছর অর্থ ব্যয় করে চেষ্টা-সাধনা করা হয় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য, কিন্তু যে নামায মানুষকে অপরাধমুক্ত রেখে পৃথিবী ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করবে, সেই নামায সম্পর্কে জানার আগ্রহ কেনো থাকবে না? আদালতে আখিরাতে এসব প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে এবং জবাব দিতে ব্যর্থ হবার কারণে গ্রেফতার হতে হবে।

www.pathagar.com

নামাযের মূল উদ্দেশ্য

যথাযথভাবে যদি নামায আদায় করা হয়, নামায যে প্রশিক্ষণ দেয় তা অনুসরণ করা হয় তাহলে সেই নামায অবশ্যই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার ভয় সৃষ্টি করবে এবং সেই ব্যক্তি যাবতীয় অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, 'আল্লাহ তা'য়ালা হলেন আমার মুনিব এবং আমি তাঁর গোলাম' এ কথা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে হৃদয়ে জীবন্ত রাখার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা নামায কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ-وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কেনো ইলাহ নেই, সুতরাং তুমি আমার দাসত্ব করো এবং আমাকে স্বরণ করার জন্য নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বা-হা-১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামাযের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর নানা ধরনের হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টি নন্দন দৃশ্যাবলী এবং বিভিন্ন স্বার্থের মোহে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ যেনো কোনোক্রমেই মহান আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে না যায়, সে যেনো সত্য বিমুখ হয়ে না পড়ে এ কথাই চেতনার জগতে শাণিত রাখার উদ্দেশ্যেই নামায ফরজ করে দেয়া হয়েছে। মানুষের মনিব কে এবং মনিবের সাথে কি সম্পর্ক, মনিব তাকে কিভাবে জীবন-যাপন করতে আদেশ দিয়েছেন, সে এই পৃথিবীতে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন নয়– এই চিন্তাকে জীবন্ত ও শাণিত রাখার এবং মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবথেকে বড় মাধ্যম হচ্ছো নামায। প্রতিদিন পাঁচবার মানুষকে পৃথিবীর জটিল কাজকারবার থেকে দূরে সরিয়ে নামায তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে নিয়ে যায়।

নামায ব্যক্তিকে শুধুমাত্র অসৎকাজ থেকেই বিরত রেখেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং সামনে অগ্রসর হয়ে সে সৎকাজে উৎসাহিত এবং সুকৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার জন্য ব্যক্তিকে উদ্যোগী করে। এর কারণ হলো, নামায মানুষের ভেতরে মহান আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখে। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী বলেছেন, 'মহান আল্লাহর স্মরণ নামায পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণের পরিধি এর থেকেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন মানুষ রোজা পালন করে, যাকাত আদায় করে বা অন্য কোনো সৎকাজ করে তখন অবশ্যই সে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করে, কারণ আল্লাহকে স্মরণ করেছে বলেই তো তার দ্বারা ঐ সৎকাজটি সম্পাদিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অসৎকাজ করার সুযোগ লাভ করার পরও তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তখন সেটাও হয় আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণের সুফল। এ জন্য মহান আল্লাহর স্মরণ একজন মুমিনের সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত হয় আর এই কাজটি সম্পাদিত করে নামায।

নামায এমনই এক জিনিস যা মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয়, পবিত্রতার অনুভূতি ও পূণ্যশীলতার নির্মল ভাবধারা এবং আল্লাহর বিধান পালন করে চলার যোগ্যতা ও প্রস্তুতি সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে সর্বোপরি তাকে সব সময়ই সততার ওপর স্থির করে রাখে। বস্তুত এই জিনিসগুলো না হলে মানুষ কোনোক্রমেই সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর আইন-বিধান পালন করে চলতে পারে না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে- সে আল্লাহর গোলাম এবং এই কথাই বারবার স্মরণ করে দেয়ার জন্যই আল্লাহ তায়ালা নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا-فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমস্ত লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তৈরী কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। (সূরা আর রুম-৩০)

মহাসত্য দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হবার পরে সেদিক থেকে দৃষ্টি যেনো শয়তান অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে না পারে, জীবনের জন্য এই সত্য পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কেনো পথের দিকে যেনো দৃষ্টি না যায়, এ জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন- একনিষ্ঠ হয়ে এই দ্বীনের দিকে নিজের দৃষ্টি স্থির করো। আল্লাহর দেয়া দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো এবং এই নামাযই মানুষকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের অনুসারী বানিয়ে দেয়। নামায আদায়ের সাথে নামাযী ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা হতে হবে একজন মুসলমানের মতো এবং তার যাবতীয় পছন্দ-অপছন্দও হতে হবে মুসলমানের অনুরূপ। তার মূলবোধ ও মানদন্ড হতে হবে সেটাই যা ইসলাম তাকে দিয়েছে। তার স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন ও কার্যক্রমের কাঠামো ইসলামের দাবি অনুসারে হতে হবে। ইসলাম যে পথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনধারা পরিচালনার লক্ষ্যে বিধান দিয়েছে, সেই পথেই নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে হবে। কেননা আল্লাহর বিধানের অনুকূল প্রকৃতি দিয়েই মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানব জাতিকে এই প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের আর কোনো স্রষ্টা, রব, মাবুদ ও আনুগত্য গ্রহণকারী নেই। এই প্রকৃতির ওপরই মানুষের প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোনো মানুষ যখন স্বেচ্ছাচারী নীতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে থাকে, তখন সে তার নিজের প্রকৃতির সাথেই বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। আর যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দাসত্বের শিকল নিজের কণ্ঠদেশে পরিধান করে, তাহলেও সে তার নিজের সৃষ্টিগত প্রকৃতির সাথে বিরোধিতা করতে থাকে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে অনুগ্রহ করে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। এখন কেনো মানুষ ইচ্ছে করলেই এই কাঠামোয় কেনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া থেকে মুহূর্ত কালের জন্যও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না এবং অন্য কাউকে নিজের ইলাহ্ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মেকী ইলাহ্ কোনোক্রমেই মানুষের ইলাহ্ হতে পারে না।

www.pathagar.com

মানুষ নিজের জন্য যতো রব, ইলাহ, মালিক, মনিব, উপাস্য যা-ই ইচ্ছা বানিয়ে নিলেও মানুষ যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বান্দাহ্ নয়- এই বাস্তব সত্যটি অকাট্য ও অবিচল রয়ে যায়। মানুষ নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাকে ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারক গণ্য করতে পারে এবং মন চায় তাকে নিজের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার মালিক মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য এটাই যে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কেউ নয়। কেউ তাঁর অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের ভাগ্য ভাঙা-গড়ার শক্তিও একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

আল্লাহ অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো আর নামায কায়েম করো এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যেয়ো না। (সূরা আর রূম-৩১)

আল্লাহর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো- এ কথা বলার পরেই বলা হয়েছে, নামায কায়েম করো। আল্লাহ অভিমুখী হওয়া ও তাঁকে ভয় করা, এ দুটো কাজের কেনো বাহ্যিক রূপ নেই। এই দুটোই কাজ নির্ভর করে মানসিকতার ওপরে। অর্থাৎ কাজ দুটো একান্তভাবেই মানসিক কাজ। একজন আল্লাহ অভিমুখী হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করছে- এই মানসিক অবস্থার প্রকাশ এবং এর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনিবার্যভাবে এমন কেনো শারীরিক কর্মের প্রয়োজন যার মাধ্যমে বাইরের দিকে এর প্রকাশ ঘটবে এবং লোকেরা জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ জগতেও আল্লাহ ভীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করার এই অবস্থাটি একটি কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে বিকাশ লাভ করতে থাকতে। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তার মানসিক দিকে পরিবর্তন ঘটানোর আদেশ দেয়ার পর পরই নামায নামক শারীরিক কর্ম সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছেন।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো চিন্তা নিছক চিন্তার পর্যায়েই থাকে ততক্ষণ তারমধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। এই চিন্তা যদি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সময়ের ব্যবধানে সেই চিন্তায় ভাটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং চিন্তায় পরিবর্তন আসারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু চিন্তা অনুসারে তৎক্ষণাত কর্ম বাস্তবায়ন করতে থাকে তখন মানুষের মধ্যে সেই চিন্তা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে, মনের জগতে সেই চিন্তা ক্রমশ শিকর গেড়ে বসে যেতে থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে যখন সেই চিন্তা অনুসারে বাস্তবে কর্ম সম্পাদন হতে থাকে, ততই তার শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে যে আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা করেছে, তা পরিবর্তিত হওয়া এবং তা ম্রিয়মান হয়ে পড়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে যেতে থাকে এবং চিন্তা অনুসারে যে কাজের সূচনা করেছে, সেই কাজ থেকে দূরে সড়ে আসা দূরূহ হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিজেকে আল্লাহ অভিমুখী করা এবং হৃদয়ে আল্লাহ ভীতিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রত্যেক দিন নিয়মিত যথাযথ পন্থায় পাঁচবার নামায আদায় করার চেয়ে অধিক কার্যকর পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। নামায কেনো এত কার্যকরী, কারণ রোজা-হজ্জ বা যাকাত নির্দিষ্ট একটি সময়ে সম্পাদান করতে হয়। রোজা বছরে একবার, হজ্জ জীবনে একবার ফরজ, যাকাতও বছরের একবার আদায় করতে হয়। কিন্তু নামায এমন একটি কাজ যা নিয়মিতভাবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কয়েক ঘন্টা পর পর একটি নির্দিষ্ট বাহ্যিক অবয়বে মানুষকে স্থায়ীভাবে আদায় করতে হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা মানুষের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা কোরআন দিয়েছে, সেই কোরআন ব্যতীত নামায হবে না।

অর্থাৎ নামাযে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। এই কোরআন ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেশ করেছেন, তা যেনো মানুষ ভুলে না যায় এ জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ নামাযে প্রত্যেক রাকাআতে প্রতিদিন পাঁচবার কোরআন তিলাওয়াত করতে হয়, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ নামাযে বারবার পড়তে হয়। ফলে মানুষের আল্লাহ তা'য়ালার একত্বের কথা, তাঁর রাসূলের কথা, তাঁর আদেশ-নিষেধের কথা বারবার মানুষের মনে জীবন্ত হতে থাকে।

এ ছাড়াও মানব জাতির ভেতর থেকে কারা তাদের মনিব আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করে ও কারা বিদ্রোহের নীতি পরিহার করে আপন মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে এবং কারা কাফির ও কারা মুমিন তা প্রকাশ পাওয়ার জন্যেও নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজের কাছে এ কথা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, কে তাদের শত্রু ও কে তাদের মিত্র এবং নামাযই এই পার্থক্যবোধ স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সত্যপন্থী মানুষকে সবসময় অন্যায় আর পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়– সংগ্রাম করার এই শক্তিও নামাযই সৃষ্টি করে দেয়।

যেসব অন্যায় ও পাপাচার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে আর এর গতি রোধ করার লক্ষ্যে সত্য দ্বীনের দাওয়াত যারা দিচ্ছে এবং তাদের সাথে বিরোধিতা করা হচ্ছে, এসব বিরোধিতার মূল উপ্‌ড়ে ফেলার প্রকৃত পথ হলো, সত্য দ্বীনের দাওয়াত দানকারীকে সর্বাধিক নেক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং তার নেক আমল দ্বারা অন্যায়কে পরাজিত করতে হবে। আর দাওয়াত দানকারীকে নেক বানানোর সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায। নামায আদায় করার কারণে তার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ নিত্য-নতুন ও জীবন্ত করতে থাকবে এবং এই শক্তির মাধ্যমে সে পাপাচারের সংঘবদ্ধ ঝটিকার শুধু মোকাবেলাই করতে পারবে তা নয়– বরং তা উৎখাত করে পৃথিবীতে কার্যত কল্যাণ ও মঙ্গলময় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর রাসূল যে নামায আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম যে নামায আদায় করেছেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ যে নামায আদায় করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে, সেই নামায যেমন নামাযী ব্যক্তিকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে অনুরূপভাবে সমাজ থেকে অসৎকর্ম উৎখাত করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায়। এ কারণেই আল্লাহ বিমুখ ও পাপাচারে নিমজ্জিত সমাজের

www.pathagar.com

লোকজন নামাযী ব্যক্তির প্রতি বিদ্রুপ বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কেননা নামায হলো দ্বীনদারীর সর্বাধিক স্পষ্ট নিদর্শন এবং পাপাচারে লিপ্ত দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকজন এই দ্বীনদারীকে মারাত্মক বিপজ্জনক এক রোগ বলে মনে করে। এ কারণে যে সমাজে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোত প্রবহমান, সেই সমাজের লোকেরা নামাযকে সর্বোত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হিসাবে গ্রহণ না করে নিছক 'পরহেযগারীর লক্ষণ' হিসাবে গণ্য করে। যদিও তারা পরহেযগারীর অর্থ বুঝে না। এই সমাজের কাউকে নামায আদায় করতে দেখলে তাকে 'মোল্লা' রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করা করে এবং তাকে নানা ধরনের বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করতে থাকে।

কারণ তারা জানে, এই লোকটি এখন আল্লাহ মুখী হয়েছে, সে নিজে যেমন ভালো থাকতে চেষ্টা করবে এবং সমাজকেও ভালো বানানোর চেষ্টা করবে। নামাযী লোকটি ধর্মহীনতা ও চরিত্রহীনতার ওপর সমালোচনার আঘাত হানবে। সঠিক পথ অবলম্বন ও চরিত্র গড়ার উপদেশ দিতে থাকবে এবং এই লোকটি সমাজের যাবতীয় দুষ্কৃতির দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে মানুষকে সচেতন করে দেবে। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষণ উৎখাত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করবে। আর এই লোকের অনুরূপ সমাজের সমস্ত লোক যদি নামাযের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পাপচারে লিপ্ত দুষ্কৃতকারী লোকদের অন্যায় পথে অর্থের পাহাড় গড়া, পরস্বার্থ হরণ করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ করা যাবে না– যে কাজের ওপরে তাদের ভোগ-বিলাসিতা নির্ভর করে। এ কারণেই দেশ ও সমাজদ্রোহী লোকেরা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসন দখল করে। তারপর সমাজে নগ্নতা আর বেহায়াপনার প্লাবন সৃষ্টি করে মানুষের মন-মানসিকতা আল্লাহ বিমুখ করে দেয়।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে ছেলেটি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতো, সেই ছেলেটি যখন কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে তারুণ্যের সোপানে পা স্পর্শ করলো, তখনই সমাজে প্রবাহিত নগ্নতার বাতাস তাকে স্পর্শ করলো। অর্থহীন সাহিত্য, নগ্ন পত্র-পত্রিকা, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা আর ছায়াছবি ছেলেটির কণ্ঠদেশ থেকে আল্লাহর গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করে দিলো। এই ছেলেকে আর মসজিদে পাওয়া যায় না। দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে যেসব দুর্বৃত্ত সমাজ পরিবেশকে নামায আদায়ের বিপরীত পথে তাড়িত করেছে, সেই সব দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا–

তারপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা নামায নষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করলো। তাই শীঘ্রই তারা পথভ্রষ্টতার পরিণামের মুখোমুখি হবে। (সূরা মারয়াম-৫৯)

দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে এসব দুর্বৃত্ত গোটা দেশ ও সমাজের পরিবেশ এমনভাবে বিষাক্ত করে তোলে যে, সেখানে নামায আদায় করার যাবতীয় পরিবেশ তারা

www.pathagar.com

ধ্বংস করে ছাড়ে। চিত্ত বিনোদনের নামে গান-বাজনা, নানা ধরনের খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি এমনভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেয় যে, এসব কিছুর সাথে যারা জড়িত হয় এবং যারা এসবের দর্শক-শ্রোতা, তারা এমনভাবে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেয় যে- নামায আদায় করার মতো অবসর তাদের হয় না।

নামায থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ সম্পর্কে বেপরোয়া ও গাফেল হয়ে যাওয়া আর এটাই হলো মুসলিম মিল্লাতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম সূচনা। কারণ নামায মহান আল্লাহর সাথে মুসলমানের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্কের বাঁধন অটুট রাখে। এই সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। সম্পর্কের এই বাঁধন ছিন্ন হবার সাথে সাথেই মানুষ মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এভাবে কার্যকর সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন হবার পরেই মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান নামায আদায় করে না, ফলে তাদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার যেমন কার্যকর কেনো সম্পর্ক নেই অনুরূপ মানসিক সম্পর্কও নেই। সুতরাং এই ধরনের মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী অপমানিত আর লাঞ্ছিত হলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, এই ধারণা করাও বড় ধরনের বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

নামায আদায়ের পূর্ব শর্ত

নামায আদায় তথা নামাযে দন্ডায়মান হবার পূর্ব শর্ত হলো, প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রথমে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। দৈহিকভাবে পবিত্র হতে হবে এবং পরিধেয় বস্ত্রও পবিত্র হতে হবে। যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সেই স্থানও পবিত্র হতে হবে। কেউ যদি জেনে বুঝে অপবিত্র দেহে, পোষাকে বা অপবিত্র স্থানে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায তো হবেই না, সেই সাথে ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

এবং নিজের পরিধেয় পোষাক পবিত্র রাখো। আর মলিনতা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে অবস্থান করো। (সূরা আল মুদ্দাস্সির-৪-৫)

বিজ্ঞ তাফসীরকারগণ কোরআনের এই আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতের মর্মও বড় ব্যাপক। ছোট একটি কথা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে একটা অর্থ হলো, পরিধেয় পোষাক পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। পোষাক মানুষের মনের ওপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক বাহিনীর বিশেষ পোষাক নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, পোষাক-পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। একটার সাথে আরেকটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

পবিত্র রুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সে পুঁতিগন্ধময় কোন খাদ্য তাঁর মুখ গহ্বর দিয়ে দেহে প্রবেশ করাবে। সুতরাং, কোন পবিত্র আত্মার পক্ষেও সম্ভব নয় সে কোন অপবিত্র দেহের ভেতরে বাস করবে। কোন পবিত্র দেহের পক্ষেও সম্ভব নয় সে নিজেকে অপবিত্র অপরিচ্ছন্ন পোষাকে আবৃত রাখবে। মহান আল্লাহ পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন। তিনি অপবিত্রতা প্রশ্রয় দেননা।

আরবী 'তাহ্হের বা তাহারাত' শব্দের অর্থ শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়। অন্তরের কলুষতা দূর করাকেও বোঝায়। পবিত্রতা বা তাহারাতকে কোরআন যে অর্থে উপস্থাপন করেছে, পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যে, সে ভাষার একটি শব্দ তাহারাতের সমার্থক হতে পারে বা পবিত্রতার ব্যাপক ধারণা পেশ করতে পারে। পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও পবিত্রতা এবং পাপের ভেতরে নিজেকে জড়িত করাকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কোন অন্যায় কাজ বা মিথ্যা কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থও হলো পবিত্রতা। মিথ্যা কথা বলা অপবিত্রতা।

এভাবে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা, মিথ্যা, চিন্তার জগতে অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকেই পবিত্রতা বলা হয়েছে। দেহ এবং দেহের পোষাক পবিত্র–এটা তো বাহ্যিক পবিত্রতা মাত্র। চিন্তার জগৎ হতে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা তথা মূর্খতাও এক ধরণের অপবিত্রতা। এ সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাহারাত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র এবং পবিত্রতা তিনি ভালোবাসেন– এ কথা পবিত্র কোরআনে তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। সূরা বাকারার ২২২ আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ–

যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

শুধুমাত্র নামায আদায় করার পূর্বেই নয়– প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শারীরিক ও পোষাকের দিক থেকে পবিত্র থাকতে হবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক। প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতা হলো সেইসব ভিত্তিসমূহের একটি, যেসব ভিত্তির ওপর আল্লাহর তা'য়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইসলাম একটি সুন্দর ও পরিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন জীবন বিধান। এর কাঠামোর বাইরের দিক যেমন সুন্দর ও পবিত্র, অনুরূপভাবে এর ভেতরের দিকও অতিব পবিত্র এবং সুন্দর। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্রতা অর্জনের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট অনুধাবন করা যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ–وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ–

www.pathagar.com

ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের নিকটে গমন করো না যতক্ষণ না তারা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে যাও, ঠিক সেইভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। (সূরা বাকারা-২২২)

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا-

আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে পবিত্র হয়ে নাও। (সূরা আল মায়িদা-৬)

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ-

সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা-২৫)

خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ-

চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গী। আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা তারা সৌভাগ্যমন্ডিত। (সূরা আলে ইমরাণ-১৫)

পবিত্রতা একদিকে যেমন ঈমানের অংশ, অপরদিকে তা মুসলিম হবারও অন্যতম শর্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলাম কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন, ইসলাম হলো– তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো আদেশদাতা নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত পরিশোধ করবে, হজ্জ আদায় করবে, উমরাহ্ করবে, অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসল করবে, অযু পূর্ণ করবে, রমযানের রোযা পালন করবে। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম জানতে চাইলেন, এগুলো আদায় করলে কি আমি মুসলিম হতে পারবো? আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আল্লাহর ফেরেশ্‌তা বললেন, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন। (বোখারী)

সুতরাং ইসলামে পবিত্রতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা, তা উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস থেকেই অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মানুষকে পবিত্রতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণাই দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত কোনো মতবাদ-মতাদর্শ বা ধর্মের নামে যেসব মত, পথ ও প্রথা পৃথিবীতে চলে আসছে, এসব আদর্শ বা ধর্মে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোনো গুরুত্ব নেই। বরং ধর্ম নামে পরিচিত কতক ধর্মে অপবিত্র বস্তু বা অপবিত্রতা ব্যতীত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই পালন করা নিষিদ্ধ। স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে তারা যে সাধনার পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, সেই সাধনা করতে হলে নানা ধরনের অপবিত্র বস্তু প্রয়োজন– এমনকি মদ ও নারীর ঋতুস্রাবের রক্তের মতো অপবিত্র বস্তুরও প্রয়োজন হয়।

সারা পৃথিবীর মানুষকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। দাঁত পরিষ্কার করতে হবে, গোসল করতে হবে, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর কুলুপ ও পানি ব্যবহার করতে হবে, দেহ থেকে বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে, চুল, দাড়ি-গোঁফ সুন্দর করে কেটে চিরুনী

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে হবে, দেহের অপ্রয়োজনীয় পশম পরিষ্কার করতে হবে, পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে হাত ধুতে হবে, বাসন-পত্র পরিষ্কার করতে হবে, দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। মুসলিম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মানব সম্প্রদায় এখন পর্যন্ত পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ ধারণা পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। এসব লোক যেসব দেশে বাস করে, সেসব দেশ ভ্রমণ করলে ও তাদের সাথে মেলামেশা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের কতটা দৈন্যতায় তারা জীবন-যাপন করে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এসব লোক মুখ না ধুয়েই চা পান করে থাকে। পশ্চিমা সভ্যতায় এর নাম দেয়া হয়েছে বেড-টি। পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য রয়েছে, এমন কোনো পাত্র উন্মুক্ত রাখতে নিষেধ করেছেন। পাত্র খোলা থাকলে এর মধ্যে নানা ধরনের পোকা-মাকড় বা অখাদ্য কিছু পড়তে পারে। তিনি বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন নিজের হাত পরিপূর্ণ পাত্রে না ডুবায়। যতক্ষণ না সে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবে তিনবার। (মুসলিম)

পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম এতটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, গোসল আর অযু করে পবিত্র হবার জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব দেখা দিলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে বলা হয়েছে। মাটি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিকে ইসলাম তায়াম্মুম নামে অভিহিত করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

অতপর যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো। (সূরা নিসা-৪৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا-وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضى اَوْ عَلى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার ওপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে। অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা পথে-প্রবাসে থাকো বা তোমাদের কোনো লোক মল-মূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ করো আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার ওপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ্ করে নাও। (সূরা মায়িদা-৬)

www.pathagar.com

পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করার গুরুত্ব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি পবিত্রতা গ্রহন করে এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে এরপর এভাবে পবিত্রতাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তার এই নামাযসমূহ প্রতি দুই ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন-

مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ-

যে ব্যক্তি অযু করে। পূর্ণ নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে অযুকে পূর্ণ করে। তার দেহ থেকে তার সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় তার নখের নিচে থেকে পর্যন্ত। (বোখারী-মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন- অযুর পরিপূর্ণতার কারণে কিয়ামতের দিন তোমরা হস্ত ও মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতার অধিকারী হবে। (বোখারী- মুসলিম)

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব কাজের কথা বলবো না, যেসব কাজ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন- সেসব কাজ হলো, কষ্ট এবং মন না চাইলেও অযু পূর্ণ করা। মসজিদে যেতে অধিক অধিক পা ফেলা এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হলে অন্য ওয়াক্ত নামায আদায় করার অপেক্ষায় থাকা। এটা হলো তোমাদের জন্য প্রকৃত রিবাত। (মুসলিম)

শেষের কথাটি তিনি দুই বার উচ্চারণ করেছেন। আরবী ভাষায় রিবাত বলা হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা দেয়ার লক্ষ্যে নির্মিত ছাউনীকে। অর্থাৎ এসব ছাউনী থেকে যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়, অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত উক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করলে একজন মুসলমান শয়তানের আক্রমণও প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম প্রত্যেক নারী-পুরুষের নিকটই পবিত্রতা দাবি করে এবং এ ব্যাপারে উভয়ের জন্য একই নির্দেশ দিয়েছে। অপবিত্রতার অবস্থা যদি এমন হয় যে, যা গোসল না করা পর্যন্ত দূর হবে না, তাহলে নারী-পুরুষ উভয়কেই ইসলাম গোসলের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে গোসল না করে অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় দূরে থাক- নামাযের ধারে কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

যে স্থানে নামায আদায় করা হবে, সেই স্থানও পবিত্র হতে হবে। জেনে বুঝে অপবিত্র স্থানে নামায আদায় করলে নামায যেমন হবে না, তেমনি ব্যক্তিকে গোনাহ্গার হতে হবে। ইসলাম এভাবে মানুষকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে আকৃষ্ট করেছে। পরিধেয় বস্ত্র তা কম মূল্যের

www.pathagar.com

বা পুরনো হোক না কেনো, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মসজিদে নববীতে বসে আছেন। একজন সাহাবী মলিন পোষাকে অবিন্যস্ত চুলে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তিনি সালাম জবাবের না দিয়ে বললেন, এই ব্যক্তির কি পোষাক পরিচ্ছন্ন করার মতো কিছু জুটে না? মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়াতে পারে না? আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে ঐ ব্যক্তি দ্রুত সেখান থেকে বাড়িতে গিয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে এবং মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে আঁচড়িয়ে নবীজীর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, দেখোতো– এখন তোমাকে কি সুন্দর লাগছে! আর একটু পূর্বে তোমাকে শয়তানের মতো দেখাচ্ছিলো।

অনেকে বাড়িতে একাকী যখন নামায আদায় করে, তখন এমন পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করে, যে পোষাক পরিধান করে সেই ব্যক্তি বাড়িতে আগত কোনো অতিথির সামনে উপস্থিত হন না। মানুষ সাধারণতঃ কোনো সম্মানিত-মর্যাদাবান ব্যক্তি বা উচ্চ পদস্থ কারো সাথে দেখা করতে যাবার সময় নিজেকে যথাসম্ভব উত্তম পোষাকে সজ্জিত করে, চুল-দাড়ি পরিপাটি করে তারপর অভিষ্ট ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু যে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে যখন দাঁড়ানো হয়, তখন নিজেকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করা এবং নিজেকে পরিপাটি করে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। এটা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীনতার শামিল।

এটা করা যাবে না, বরং নামায আদায় করতে হবে, উত্তম পোষাক পরিধান করে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন সর্বোত্তম পোষাকে উপস্থিত হবে।' সামর্থ থাকার পরও ময়লাযুক্ত পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা মহা অন্যায় এবং এ জন্য আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা কৃপণতা পছন্দ করেন না। এই কৃপণতা আল্লাহর ক্ষেত্রে হোক বা তাঁর বান্দার ক্ষেত্রেই হোক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ-وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

সেই সব লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন, তা গোপন রাখে। এ ধরনের অকৃতজ্ঞ-নি'মাত অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (সূরা নিসা-৩৭)

মহান আল্লাহর নি'মাত গোপন করে রাখার অর্থ হলো, এমনভাবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করা, দেখলে যেন মনে হয় যে, এই লোকটির প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোনো ধরনের অনুগ্রহ করেননি। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে নিজের সামর্থ

www.pathagar.com

থাকার পরও এমন নিম্নতম মানে জীবন-যাপন করে, দেখলে মনে হবে এই লোকটির চেয়ে হতদরিদ্র আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সে নিজের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে না, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে না, এমনকি মহান আল্লাহর রাস্তায় একটি কানাকড়িও ব্যয় করে না। তার পরনের পোষাক ও চাল-চলন দেখলে মনে হবে, সে দরিদ্রতার নিম্ন সীমায় অবস্থান করছে। মূলত এর চেয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা আর কিছুই হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে নি'মাত দেন, তখন তিনি তার ওপর সেই নি'মাতের বাহ্যিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে ভালোবাসেন।' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির দৈনন্দিন আহার, পোষাক ও দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দেয়া নি'মাতের প্রভাব দেখতে চান। সুতরাং অবহেলিত বা অন্যের সামনে যে পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হতে লজ্জানুভব হয়, এমন পোষাক পরিধান করে মহান আল্লাহর সম্মুখে তথা নামাযে দন্ডায়মান হওয়া যাবে না।

সুতরাং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো মহান আল্লাহর গোলামদের গুণ-বৈশিষ্ট্য। আর অপবিত্রতা হলো শয়তান ও তার অনুগামীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য। নামায আদায় করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা করা তথা মহান আল্লাহর দাসত্ব করা হবে- এই স্বীকৃতি প্রদান করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি তাঁর গোলামদেরকেও পবিত্র দেখতে চান। তাঁর সমীপে অপবিত্রতার স্থান নেই এবং অপবিত্র অবস্থায় তাঁকে সিজ্‌দা দেয়ারও অবকাশ নেই। সুতরাং নামায আদায়ের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন এবং এই পবিত্রতা শুধুমাত্র বাইরেরই নয়- ভেতরের দিক থেকেও মানুষকে পবিত্র হতে বলা হয়েছে। মানুষ কল্পনার জগতে যেন অপবিত্রতার কোনো স্থান না দেয়, এ জন্য পবিত্র কোরআনের মহান আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মনে যেসব কল্পনার উদ্রেক হয়, সে সম্পর্কেও অবগত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ-

আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাগাবুন-১৮)

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ-

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্‌ল-৭৪)

www.pathagar.com

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ-

বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? (সূরা আনকাবুত-১০)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ-وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

আর আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার কাছে তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। (সূরা কাফ্-১৬)

মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাই আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে। সূরা মুজাদালার ৭ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا-ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

তুমি কি অনুধাবন করো না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা জানেন, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যেখানে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না- যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে যিনি উপস্থিত থাকেন না, তারা এর চেয়েও কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেনো, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। তারা যা কিছু করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا-ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা

www.pathagar.com

কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আনআম-৫৯)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। (সূরা ইউনুস-৬১)

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ-وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জানো যা আমরা গোপন করি ও প্রকাশ করি। আকাশ ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

এসব কথা এজন্যই বলা হয়েছে, মানুষ যেন শুধুমাত্র দৈহিক তথা বাহ্যিক পবিত্রতাই অর্জন না করে, মনের পবিত্রতাও অর্জন করে। মনের জগতে কোনো ধরনের অপবিত্রতা তথা পাপ-পঙ্কিলতা যেন স্থান না দেয়। তবুও মানুষের মন- সামান্য অসতর্ক হলেই নানা ধরনের পাপ-কল্পনা তথা অপবিত্রতা এসে মনের জগতে ভীড় জমায়। মনের জগতের এই অপবিত্রতার বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয় এবং এ ব্যাপারে তিনি আখিরাতের ময়দানে বান্দার কাছে জানতে চাইবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ-فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ-

তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর না-ই করো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সেই সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

সুতরাং নামাযের প্রথম শিক্ষা হলো, দেহ-মন ও পোষাকের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র ও রুচিবান করে গড়ে তোলা। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি পবিত্র ও রুচিবান হয়, তাহলে সেই সব ব্যক্তি সমষ্টিগতভাবে যে সমাজ গড়বে, সেই সমাজও পবিত্র তথা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ অপরাধমুক্ত সমাজ গঠিত হবে। এভাবে অপরাধমুক্ত সমাজের সমন্বয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হবে, সেই রাষ্ট্রই কেবলমাত্র শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী ও নিরাপত্তাপূর্ণ রাষ্ট্র হতে পারে।

www.pathagar.com

নামাযের সূচনাতে কি ওয়াদা করা হচ্ছে?

নামাযের প্রথম শর্ত আদায় হবার পর নামায আদায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পাঠ করা হয়-

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন'য়াম-৭৯)

নামায আদায়ের সূচনাতেই সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করে তারপর নামাযের জন্য হাত বাঁধা হয়। যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈগণ কোরআনের এই আয়াত নামায আদায়ের পূর্বে নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করেছেন বলে জানা যায় না। কোরআনের যে আয়াত তিলাওয়াত করে নামাযের সূচনা করা হয়, এই আয়াতে বলা কথাগুলো মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীমের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই কথাগুলো পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহীমকে যে জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন, সেই জাতি ছিলো পথভ্রষ্ট। তারা মহান আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে আল্লাহর সৃষ্ট আগুন, পানি, মাটি, বৃক্ষ, পাথর, আকাশের চন্দ্র-সূর্য ও তারকামালার পূজা উপাসনা করতো। এসবকেই তারা অসীম শক্তিশালী কল্পনা করে নিজেদের আবেদন-নিবেদন পেশ করতো। আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত দেশের নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কল্পনা প্রসূত নীতি আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিতিমালা পরিচালিত হতো। এক কথায় জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন অনুসরণ করা হতো, তা ছিলো মানুষের বানানো। আর ধর্মীয় দিক থেকে অনুসরণ করা হতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি-পদ্ধতি।

১৯০৩ সনের পরে C. H. W. John কর্তৃক লিখিত The oldest code of Law নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম যে জাতির মধ্যে আগমন করেছিলেন, সেই জাতির মধ্যে শির্ক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূর্তি পূজা সমন্বিত আরাধনা -উপসানার সমষ্টিই শুধু ছিলো না, বরং তা ছিলো সেই জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতিক জীবনাদর্শের ভিত্তি। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এসবের মোকাবেলায় এক নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম তাওহীদের দিকে জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তিনি মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামী কবুল করার দাওয়াত পেশ করছিলেন।

মূর্তি, গাছ-পাথর, নদী-সাগর, চন্দ্র-সূর্য ও তারকামালাকে সর্বশক্তির কেন্দ্র কল্পনা করে যারা এসবের পূজা করতো, তাঁর দাওয়াতের আঘাত শুধুমাত্র তাদের ওপরই পড়ছিলো না, রাজবংশের একজন হওয়ার কারণে যারা নিজেদেরকে পূজ্য মনে করতো, সার্বভৌমত্বের

www.pathagar.com

অধিকারী মনে করতো, ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে সব ধরনের আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে মনে করতো, দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা তথা সারা দেশের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার ওপরও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এই দাওয়াত প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানছিলো।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার অর্থ ছিলো, সমাজের তৃণমূল থেকে দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে যারা শিরক ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো, তাদের গড়া সেই শিরকের প্রাসাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ও দেশকে নতুনভাবে সাজানো। শিরকে নিমজ্জিত এই জাতি ও তাদের শাসকদের সম্মুখে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন ঘোষণা দিলেন, 'আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' তখন সেই জাতি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলো, ইবরাহীম কি বলছে এবং তাঁর এই ঘোষণার অর্থ কি। এ জন্যই সেই জাতির ও জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের এলিট শ্রেণী ও জাতির শাসক শ্রেণী- সকলে একযোগে হযরত ইবরাহীমের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো।

একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার ও শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে মাত্র একটি কণ্ঠ ঘোষণা করলো, তোমরা যাদেরকে সর্বশক্তির অধিকারী কল্পনা করে পূজা ও আরাধনার আসনে বসিয়েছো, আমি তাদেরকে মিথ্যা মনে করি। তোমরা যাদেরকে নিজেদের মাবুদ মনে করো, আমি তাদেরকে মাবুদ মনে করি না- বরং তারা সবাই আমার মাবুদ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি। তোমরা যাদেরকে আইন-কানুন প্রণেতা বলে পূজা করো এবং তাদের প্রণীত আইন-বিধান অনুসরণ করো, আমি তাদেরকে মানি না এবং তাদের প্রণীত বিধানের আনুগত্যও করি না। বরং আমার বিশ্বাস হলো, আইন-কানুন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ তিনিই এই বিশাল আকাশমন্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জগৎ ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, এসব কিছুর তিনিই প্রতিপালক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সুতরাং সৃষ্টি যার, আইন চলবে তাঁর এবং তিনিই কেবলমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী।

প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দেশের মধ্য থেকে মাত্র একটি কণ্ঠ এই ঘোষণা উচ্চারণ করলো, একটি মাত্র কণ্ঠের উচ্চারণে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের গদি থর থর করে কেঁপে উঠলো। অবশেষে সে দেশের সরকার প্রধান জুতা পেটা খেয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের একক কণ্ঠে যে ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিলো, সেই একই ঘোষণা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় ভাষায় বর্তমানে প্রতিদিন শত-কোটি কণ্ঠে নামাযের সূচনাতে উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তির মসনদে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে না। অযুত কণ্ঠে সেই একই উচ্চারণ শুনেও দ্বীনের দুশমনরা সামান্যতম

www.pathagar.com

বিচলিত হচ্ছে না। এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন সেই ঘোষণার মধ্যে যে প্রাণশক্তি বিদ্যমান ছিলো, বর্তমানে সেই ঘোষণা ঠিকই রয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে নেই কোনো প্রাণশক্তি। ফলে অযূত কণ্ঠের ঘোষণা বাতিল শক্তির মসনদে আঘাত হানতে সমর্থ হচ্ছে না।

নামাযের সূচনাতে বলা হচ্ছে, 'আমার মুখমন্ডলকে আমি ফিরিয়ে সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' অর্থাৎ আমি পৃথিবীর কোনো নেতা-নেত্রীর, দার্শনিকের, বিজ্ঞানীর তথা চিন্তাবিদদের পেশকৃত আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, আদর্শ-পদ্ধতি বা মতবাদ-মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য করবো না, যেসব আইন-কানুন বা বিধান আমার কাছ থেকে আনুগত্য চায়, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র ঐ মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি নিজের আনুগত্যের মাথানত করে দিচ্ছি, যিনি ঐ বিশাল আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক। যারা আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে মানুষের বানানো বিধানের আনুগত্য করে, তারা মুশরিক এবং সেইসব মুশরিকদের সাথে নেই।

যারা নামায আদায় করেন, তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সূচনাতে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে ওয়াদা করছেন। কিন্তু এই ওয়াদা কতটুকু পালন করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে নামায আদায়কারীগণ কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সাক্ষী রেখে যে কথাগুলো একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেই কথাগুলো বাস্তব জীবনে কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে, এই হিসাব কি কখনো করা হচ্ছে?

নামাযের সূচনাতে বলা হলো, আমি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইবো না, কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হিসাবে মানবো না, আল্লাহর আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানবো না এবং যারা মানে, তারা মুশরিক– আর আমি সেই মুশরিকদের দলের একজন নই। কিন্তু নামায শেষ করেই নামাযের সূচনাতে বলা কথাগুলোর বিপরীত কাজে নিজেকে জড়িত করা হচ্ছে। এর থেকে সুস্পষ্ট ওয়াদা খেলাফকারী মুনাফেকী আর কি হতে পারে?

নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে এমন লোক অনেক রয়েছে, যারা ইসলামের বিপরীত নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত এবং ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। বিপদে পড়লে পীরের দরবারে বা মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়। তারা বিশ্বাস করে, পীর সাহেব অথবা মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর নামায আদায়কারী লোকগুলো মানুষের বানানো আইন-বিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য করছে এবং যারা সমাজ ও দেশে মানব রচিত আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা টিকিয়ে রাখার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

নামাযের সূচনাতে বলছে, আমি মুশরিকদের সাথে নেই। অথচ তারাই আপাদ-মস্তক শির্‌কের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করছে এবং শির্‌কভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সাহায্য সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং যারা নামায আদায় করছেন, তাদেরকে নামাযের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। নামাযে কি বলা হচ্ছে আর বাস্তব জীবনে কি করা হচ্ছে, এই হিসাব মিলিয়ে দেখতে হবে। নামাযে বলা কথার সাথে যদি বাস্তব জীবনের কোনো বৈপিরত্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তা দূর করে মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হতে হবে এবং গোলামী একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। নামাযে যা বলা হচ্ছে, তা বুঝে যদি বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা হয়, তখন সেই নামায আদায়কারী ব্যক্তির ঘোষণা বাতিল শক্তির মসনদে কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

নামাযে কি বলা হচ্ছে?

এরপর নামায শুরু করা হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ মহান তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কথাটি উচ্চারণ করে। আল্লাহু আকবার বা আল্লাহই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা- এই কথাটি মুসলমানদের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তার কানে শোনানো হয় আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবী থেকে একজন মুসলমান যখন বিদায় গ্রহণ করে অর্থাৎ যখন তার জানাযা আদায় করা হয়, তখনও বার বার উচ্চারণ করা হয় আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ মুসলিম জীবনের সূচনাও হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি শোনার মধ্য দিয়ে এবং পৃথিবীর জীবনের শেষও হয় আল্লাহু আকবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে সে মুখে বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করে।

নামায আদায়কালে নামায শুরুই করতে হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চারণ করে এবং প্রত্যেক দিন ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কালে প্রায় দুই শতেরও অধিকার বার এই শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। অর্থাৎ মুসলিম জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতে হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহু আকবার শব্দটি কেনো বার বার উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে? এই শব্দ দুটোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি? আল্লাহু আকবার- কথাটি শুধুমাত্র দুটো শব্দের সমষ্টি না অসংখ্য শব্দের সমষ্টি? এই শব্দ দুটো উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কি অগণিত বাক্যাবলীর সমষ্টি বা সারমর্ম উচ্চারণ করা হয়? অথবা সেই অসংখ্য বাক্য একজন মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা কখনো সম্ভব নয় বিধায় সমস্ত কথার সমষ্টি এই দুটো মাত্র শব্দের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করার মাধ্যম হিসেবে আল্লাহু আকবার শব্দ দুটো মানুষকে উচ্চারণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে?

যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সবটুকু প্রশংসা কখনো কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয় বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন, তুমি বলো 'আল হাম্‌দুলিল্লাহ্' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

www.pathagar.com

কোনো মানুষকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয় এবং সেই সাথে তাকে শতকোটি মুখ দেয়া হয়, শতকোটি মুখে সেই মানুষ যদি মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে তবুও আল্লাহ তা'য়ালার যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য, তার শতকোটি ভাগের এক ভাগও আদায় করা সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে মহান আল্লাহর প্রশংসার হক আদায় করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ও অসম্ভব।

কারণ মহান আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক আর মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। সীমিত ক্ষমতা দিয়ে ঐ মহান আল্লাহর প্রশংসার হক আদায় করা সম্ভব নয়। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই সৃষ্টির অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। এ জন্যই তিনি তাঁর বান্দাকে একান্ত অনুগ্রহ করে শিখিয়েছেন, বান্দা! তোমার পক্ষে আমার প্রশংসার হক আদায় করা কখনো সম্ভব হবে না। এ জন্য তুমি শুধুমাত্র এই কথাটি উচ্চারণ করো, আল হাম্‌দুলিল্লাহ্।

একই বিষয় নিহিত রয়েছে আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মধ্যে। উচ্চারণ করা হচ্ছে, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেনো আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ?

এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ লেখার চেষ্টা করে, তাহলে পৃথিবীর গোটা জীবনকালও যদি সেই ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তর লেখার কাজে ব্যয় করে, তবুও কি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের শতকোটি ভাগের একভাগও লিখে শেষ করতে সক্ষম হবে?

মানুষের ক্ষমতা সসীম এবং আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠত্বের হক আদায় করা কোনো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না– এ কথা মহান আল্লাহ অবগত আছেন। এ জন্যই তিনি বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, তোমরা মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও।

অসংখ্য অগণিত বাক্যাবলীর সারমর্ম ও সমষ্টি হলো আল্লাহু আকবার শব্দ দুটো। এই দুটো শব্দের মধ্য দিয়ে অগণিত বাক্য উচ্চারিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কে, তিনি কোন্ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁর ক্ষমতা কি ধরনের– অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এই আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মাধ্যমে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির রব, মালিক, ইলাহ্, তিনি আহ্‌কামুল হাকিমীন ও আরহামুর রাহিমীন, তিনিই যাবতীয় সম্মান মর্যাদার অধিকারী। যাবতীয় প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য এবং হাম্‌দ ও তাস্‌বীহ শুধুমাত্র তাঁরই জন্য হওয়া উচিত, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই তাস্‌বীহ্ করছে, তিনি উত্তম নামের অধিকারী, তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি তওবা কবুলকারী, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, তিনি যাবতীয় কিছু শ্রবণকারী, তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী, তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী, তিনিই আকার-আকৃতি রচনাকারী, তিনি প্রশস্ততা বিধানকারী, তিনি অপরিসীম বরকতশালী, তিনি উত্তম প্রতিফল দানকারী, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে পবিত্র, তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছু তাঁর সম্মুখে সিজ্‌দাবনত।

www.pathagar.com

তাঁর থেকে বড় ওয়াদা পূরণকারী আর কেউ নেই, তিনি অঙ্গীকারের বিপরীত কাজ করেন না, তিনিই সহায় ও আশ্রয়, তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী এবং সর্বোত্তম রক্ষক, তিনি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী, তাঁর থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই, আস্থা স্থাপনের জন্য তিনিই যথেষ্ট, তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি তাঁরই হাতে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই, কেউ তাঁর অংশীদার হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, তিনিই দাসত্ব-ইবাদাত লাভের অধিকারী, তিনিই বিশ্বলোকের সবকিছুর পথনির্দেশ দানকারী এবং সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর রহমত পরিব্যপ্ত, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য, তাঁর কাছেই প্রত্যেককে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশমান এবং তিনি প্রচ্ছন্ন, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনিই প্রাণ দানকারী, তিনিই নিষ্প্রাণকে জীবন দান করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী, তিনিই সব জিনিসের ভান্ডারের মালিক, তিনিই সব জিনিসের তকদীর নির্ধারণকারী, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তাঁরই আয়ত্বে, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

কোনো কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, তাঁর সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়, তিনি মুখাপেক্ষিহীন, মানুষ তাকে স্রষ্টা মানলে তবেই তিনি স্রষ্টা হবেন- এ প্রয়োজন তাঁর নেই, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোনো কিছু নেই, তাঁর সকল ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর একটি আদেশের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাঁর পরিকল্পনায় কোনো ব্যর্থতা নেই, তিনি যার সাথে রয়েছেন, কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই, বিজয় ও সফলতা তাঁর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেই থাকেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো নি'মাত লাভ করতে পারে না, তিনি মানুষের অবোধগম্য পন্থায় নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন, তিনি যাকে চান তাঁর যমীনের উত্তরাধিকারী বানান, তিনি যাকে চান নিজের রহমত দানে ধন্য করেন, আনন্দ-বেদনা তাঁরই করায়ত্ত্ব, যে বান্দাকে তিনি চান আপন অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন, যাকে চান উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তিনি যাকে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করতে চান, তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, কল্যাণ কোন্ জিনিসে আর কোন্ জিনিসে নয়। সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তাঁর ফয়সালা অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে ভুল ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই, তাঁর পক্ষে সকল মানুষকে সৃষ্টি এবং পুনরায় জীবিত করে উঠানো কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়।

এ ধরনের যাবতীয় অসংখ্য বাক্যাবলী আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কথা উচ্চারণকারীকে অনুধাবন করতে হবে, সে মুখে কোন্ কথা উচ্চারণ করছে। উচ্চারণকারী যদি জেনে বুঝে এই কথা উচ্চারণ করে, তাহলে তার ওপর উচ্চারিত কথার প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন দেশের কোনো নাগরিককে যদি প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে ধমকের সুরে বলে, 'তুমি যদি তোমার নীতি পরিবর্তন না করো, তাহলে তোমাকে সমুচিত

www.pathagar.com

শিক্ষা দেব।' প্রধানমন্ত্রীর বলা এই কথাটি উক্ত ব্যক্তির সমগ্র সত্তার ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চারণকারী ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে তা উচ্চারণ করে, তাহলে তার ওপর এই শব্দ এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, সেই ব্যক্তির জীবনধারা আমূল পরিবর্তন হতে বাধ্য।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক, এই অনুভূতি জাগ্রত রেখে উচ্চারণ করতে হবে- আল্লাহু আকবার। শুধু মুখেই উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকা যাবে না, তাঁর বিধানকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি তাঁর বিধানও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এর মোকাবেলায় অন্য কোনো বিধান অনুসরণের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর বিধানকেই সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চে স্থান দিতে হবে।

আল্লাহু আকবর- বলে নামাযে দাঁড়ানোর অর্থই হলো, আল্লাহ তা'য়ালা এবং মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত এই পৃথিবীতে যত মতবাদ-মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান যেখানে যা কিছু রয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ ও মা'বুদের দাবীদার যে যেখানে আছে, সবই আমার পায়ের নীচে। আল্লাহ তা'য়ালাই আমার একমাত্র মা'বুদ ও ইলাহ এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ-

গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি মহান, সর্বাবস্থায় তিনি সর্বোচ্চে অবস্থান করেন। (সূরা আর রা'দ-৯)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ-

আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আল হজ্জ-৬২)

বর্তমানে মুসলিম পরিচয় দানকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। আবার যারা নামায আদায় করেন, তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তিই জানেন না, নামাযে তারা কি বলছেন এবং জানার চেষ্টাও করেন না। নামাযের সূচনাতে বলা হচ্ছে আল্লাহু আকবার অর্থাৎ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বোচ্চে তথা তাঁর দেয়া জীবন বিধান, আইন কানুনই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান একেবারেই নগণ্য, তুচ্ছ বা অকল্যাণকর। কিন্তু নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মৌখিক ও বাস্তব কার্যাবলীর মাধ্যমে এ কথারই সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বা তাঁর বিধান শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চে নয়- বরং মানুষের বানানো আইন-কানুন বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চে।

www.pathagar.com

একশ্রেণীর নামাযী লোক, নামায আদায় করছেন– কিন্তু এমন মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন, যে মতবাদ-মতাদর্শ ইসলামকে বরদাস্ত করতে মোটেও রাজী নয়। অর্থাৎ এসব নামাযী লোক শুধুমাত্র মুখেই উচ্চারণ করছে আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তারা এ কথারই সাক্ষী দিচ্ছে যে, মসজিদ বা নামাযের স্থানেই আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার সমাজ, দেশ তথা রাজনীতি, অর্থনীতি তথা দেশের সামগ্রিক আইন-কানুন ও বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ নন– মানুষের বানানো বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর লোক– যারা নামাযের আদর্শ বাস্তবে অনুসরণ করছে না, তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ-الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ-

ধ্বংস সেই মুসল্লীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়, যারা প্রদর্শনীমূলক কাজ করে। (সূরা আল মাউন-৪-৫)

এই শ্রেণীর লোক ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত এবং ঈমানের দাবীর ব্যাপারে এরা মিথ্যাবাদী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ امَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (সূরা আল বাকারা-৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এমন দুটো বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে দুটো বিষয়ই অদৃশ্য। এই আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, এরা বলে– আমরা কোরআন ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। বরং বলা হয়েছে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি।

মুনাফিকরা সাধারণত প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের কথার ধরনও হয় কৌশলপূর্ণ। তারা যদি কোরআন ও রাসূলকে অস্বীকৃতি জানাতো, তাহলে তারা নিজেদেরকে মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত বলে দাবী করার কোনো সুযোগ পেত না। কারণ, কোরআন ও রাসূল ছিলেন দৃশ্যমান। এই দুটো জিনিসের প্রতি তাদের অন্তরে অবিশ্বাস থাকলেও মুখে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিলো যে, আমরা কোরআন ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। এ জন্য স্বয়ং রাসূল ও কোরআনের পক্ষে তাদের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ ছিলো না যে, তোমরা আমাদের প্রতি বিশ্বাসী নও। এজন্য তারা এমন দুটো বিষয়ের প্রতি নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, যে দুটো বিষয়ের একটিও দৃশ্যমান নয় এবং এ দুটোর একটিও এই পৃথিবীতে তাদেরকে প্রশ্ন করবে না। অর্থাৎ তারা দাবী করে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে তাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হয়ে এ কথা বলবেন না যে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা বিশ্বাসী নও। পরকালের বিষয়টিও অনুরূপ।

এ কারণেই তারা অদৃশ্য দুটো বিষয়ের প্রতি নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে, লোক দেখানো নামায আদায় করে, সেই সাথে বাস্তবে এমন কর্ম করে থাকে– যে কাজের মাধ্যমে

www.pathagar.com

তারা এ কথাই প্রমাণ করে, নামাযে তারা যা বলছে, সেই বলা কথার প্রতি তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা ঈমানদারদের সাথে ধোকাবাজী করে থাকে। নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে তারা মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্বের আসন দখল করে, ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিরোধী কাজ করে।

নামাযে সূরা ও অন্যান্য দোয়া-কালামে কি বলা হচ্ছে?

নামাযে দাঁড়ানো হলো মুখে আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ– এ কথা মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু নামাযে কিভাবে দন্ডায়মান হতে হবে, এ সময় দেহ ও মনের অবস্থা কেমন হবে? এই প্রশ্নের জবাবও সেই আল্লাহ তা'য়ালাই দিয়েছেন, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নামায বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ–

নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হিফাজত করো। বিশেষত এমন নামায যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়। আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত ভৃত্য দন্ডায়মান হয়ে থাকে। (সূরা আল বাকারা-২৩৮)

মুখে উচ্চারণ করা হলো, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ কথাটি যদি কেউ বুঝে উচ্চারণ করে, তাহলে নামাযে দন্ডায়মান হওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই তার বুকের ভেতর থরথর করে কাঁপতে থাকবে যে, সে কোন্ সত্ত্বার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। আর এই কম্পনই বাহ্যিকভাবে তার গোটা দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। প্রবল প্রতাবশালী শাসকের সম্মুখে সাধারণ প্রজা যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়াচড়া করে এবং কম্পিত কণ্ঠে কথা বলে, অনুরূপ হবে নামাযীর অবস্থা। যে আল্লাহর সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছে, সেই আল্লাহর অসীম রহমতেই সে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছে, সেই আল্লাহর রহমত তাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তিনিই তাকে প্রতিপালন করছেন। এসব বিষয় নামাযীর স্মরণে থাকলে, সেই নামাযীর নামাযে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজ্দা দেয়া ও বসার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাবে পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আর এই ধরনের নামাযই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন এবং কবুল করবেন।

তাকবীরে তাহ্রীমা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেলো। অর্থাৎ নামাযের বাইরে আল্লাহ তা'য়ালা যেসব কাজ তাঁর বান্দার জন্য হালাল করেছেন, সেই কাজগুলোই নামায আদায়রত অবস্থায় বান্দার জন্য হারাম করেছেন। সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করার সাথে সাথেই আবার নামাযের বাইরের হালাল কাজগুলো হালাল হয়ে যায়। এরপর নামাযীকে প্রথমেই ছানা পাঠ করতে হয়। ছানা অর্থ হলো, মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহ্রীমা বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি আল্লাহর রাসূলকে বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরআন হোক। আপনি তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝখানে

www.pathagar.com

নীরব থাকেন কেনো? তখন আপনি কি পাঠ করেন তা আমাকে বলুন। আল্লাহর রাসূল বললেন, আমি পাঠ করি–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ-اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ-

হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গোনাহ্সমূহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে শুভ্র বস্ত্র পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ্সমূহ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দিন। (আবু দাউদ)

হাদীসে এ ধরনের অনেক দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ক্বিরাআতের পূর্বে পাঠ করতেন। আবু দাউদ হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে অর্থাৎ ক্বিরাআতের পূর্বে বলতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ-

তুমি পবিত্র, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হে আল্লাহ! তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত, তুমি বরকত দানকারী এবং মহান, তোমার নাম ও মর্যাদা সর্বোচ্চে। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই।

এই দোয়ার বাক্যগুলো ছোট হওয়ার কারণে এই দোয়াটিই সাধারণত অধিকাংশ লোকজন পাঠ করে থাকে। এই দোয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে লক্ষ্য করে নামায আদায়কারী বলছে, তুমি পবিত্র এবং যে কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ থেকে তুমি মুক্ত। একমাত্র তুমিই প্রশংসা লাভের অধিকারী। শুধুমাত্র তুমিই পারো বরকত দিতে এবং তোমারই নামই সর্বোচ্চে। তুমি ব্যতীত ইবাদাত, বন্দেগী, আরাধনা-উপাসনা লাভের অধিকারী কেউ নয়। তুমি ব্যতীত আইন-কানুন ও বিধান দানকারী আর কেউ নেই।

নামাযে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো আল্লাহর সম্মুখে উচ্চারণ করা হলো, আর নামায শেষ করেই প্রশংসা করা হচ্ছে অন্যের। বরকতের জন্য ধর্ণা দেয়া হচ্ছে মৃত মানুষের কবরে বা পীরের দরবারে। আইন-কানুন মেনে নেয়া হচ্ছে পৃথিবীর দার্শনিক বা চিন্তাবিদদের। এরপর তা'উজ ও তাসমিয়া পাঠ করেই সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযই হয় না।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে নিজের জন্য যতটুকু সহজ ততটুকু আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে। নামাযে কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা ফরজ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ-وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ-

www.pathagar.com

কোরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করো। আর নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা মুয্যাম্মিল-২০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং কোরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ)

নামাযের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার পরেই কোরআন থেকে পাঠ করার পরই রুকু সিজ্দায় যেতে হবে। তবে ব্যতিক্রম হলো, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার ফরজ নামাযে। এসব নামাযের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহার পরে কোরআন থেকে পাঠ করতে হবে এবং শেষের দুই বা এক রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকু সিজ্দায় যেতে হবে। বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায আদায় করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিধার কারণে মানুষ সাধারণত কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট ছোট সূরাসমূহ নামাযে পাঠ করে।

এসব সূরায় কি বলা হয়েছে, তা নামায আদায়কারীকে কোরআনের তাফসীর থেকে জেনে নিতে হবে। যেসব সূরা নামাযে পাঠ করা হয়, তার অর্থ ও তাফসীর জানা থাকলে তা পাঠ করার সময় নিজের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং নামায সুন্দর হবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা সুন্দর নামাযই কবুল করবেন এবং বিনিময় দিবেন। সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করেই রুকু সিজ্দায় যথাযথভাবে যেতে হবে এবং রুকুর তাস্বীহ পাঠ করতে হবে–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলতেন–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ–

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত ও সপ্রশংসিত।

একথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণে সহীহভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে সমস্ত অন্তর দিয়ে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ কথাগুলো ন্যূনতম তিনবার উচ্চারণ করতে হবে। এরপর রুকু থেকে সোজা হওয়ার সময় বলতে হবে–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ–

আল্লাহ তা'য়ালা তার কথা শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

এরপর সোজা দাঁড়িয়ে বলতে হবে–

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ–

হে আমাদের রব্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই।

নামাযের জামাআত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করাচ্ছেন। তিনি যখন রুকু থেকে ওঠার সময় বললেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ–

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায়কারী একজন সাহাবী উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন–

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ-

হে আমাদের রব্! তোমার জন্যই প্রশংসা, সর্বাধিক পবিত্র ও মোবারক প্রশংসা।

নামায শেষ করে নবীজী পিছন ফিরে জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে এভাবে বললো? একজন সাহাবী জানালেন, তিনি এ কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তেত্রিশেরও অধিক ফেরেশ্তাকে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি, কে সর্বাগ্রে এই কথাগুলো লিখবে। (বোখারী, আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু সিজ্দায় এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে বিভিন্ন ধরনের দোয়া পড়তেন, যা নামায বিষয়ক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সিজ্দায় যেতে হবে। সিজ্দায় এমনভাবে যেতে হবে যে, নিজের সমগ্র সত্তাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতী পায়ের ওপরে সোপর্দ করতে হবে। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতি পদপ্রান্তে। মনের মধ্যে এ কথা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আমি আমার মাথা আমার মহান রব্-এর পায়ের ওপর রাখলাম। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, বান্দাহ্ যখন আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্দা দেয়, তখন আল্লাহ তা'য়ালা ও সেই বান্দার মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো এবং সিজ্দা করো আর তোমাদের রব্-এর দাসত্ব করো। (সূরা হজ্জ-৭৭)

সিজ্দার সময় বান্দা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌছে যায়। এরপর সিজ্দার তাসবীহ্ পাঠ করতে হয়–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى-

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ পবিত্র।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলতেন–

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَبِحَمْدِهِ-

সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আমার মহান রব্ মুক্ত ও সপ্রশংসিত।

নামাযে সিজ্দার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে যে, হে আল্লাহ! তোমার সম্মুখে মাথানত করে দিলাম, তুমি যে বিধান অবতীর্ণ করেছো, সেই বিধানের সম্মুখেও মাথানত করে ঘোষণা করছি, তুমি যেমন মহান, পূত-পবিত্র তেমনি তোমার বিধানও পূত-পবিত্র ও কল্যাণকর। একমাত্র তোমার বিধানের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই রয়েছে সর্বাঙ্গিন মঙ্গল।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং সিজ্‌দায় বিভিন্ন ধরনের দোয়া করেছেন। এসব দোয়া হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। সিজ্‌দায় গিয়ে যেসব দোয়া করা হয়, তা কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে। এক সিজ্‌দা দিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতে হবে, তাড়াহুড়া করে দ্বিতীয় সিজ্‌দা দেয়া যাবে না। এক সিজ্‌দা দিয়ে সোজা হয়ে বসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরনের দোয়া পাঠ করেছেন। এর মধ্যে একটি দোয়া হলো-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ-

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার রহম করো, আমাকে বলবান করো, আমার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে জীবিকা দান করো। (আবু দাউদ)

এভাবে দুই রাকাআত, তিন রাকাআত বা চার রাকাআত নামায আদায় করতে হবে, হাদীসে যেসব তাশাহুদ ও দরুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাঠ করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। ফজর থেকে শুরু করে ইশার নামায শেষে বিতরের নামায আদায় করতে হবে। যারা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন, তারা এই নামায শেষে বিতিরের নামায আদায় করবেন। বিতিরের নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করতে হয়। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে নামাযে কুনূত পড়ার জন্য শিখিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لاَيَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَيَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ-

হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছো, আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছো, আমাকেও ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি যা কিছু প্রদান করেছো, আমার জন্য তাতে বরকত দান করো। তোমার মন্দ ফয়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই প্রকৃত ফায়সালাকারী আর তোমার ওপর কোনো ফায়সালাকারী নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। যে তোমার শত্রু হয়েছে, তাকে সম্মান দান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমারে রব্, অসীম প্রাচূর্যশীল তুমি, অতিশয় মহান।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম উল্লেখিত দোয়া কুনূতটিই সর্বোত্তম বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে নিম্নের কুনুতটিও উত্তম বলেছেন-

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমারই প্রতি ঈমান পোষণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি এবং সর্বপ্রকার মহোত্তম গুণাবলী তোমারই প্রতি আরোপ করি। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করি, তোমার অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করি না। আমরা তোমার অবাধ্য লোকদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখিনা। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামায আদায় করি এবং তোমাকেই সিজ্‌দা করি। আমরা তোমারই পথে অগ্রসর হই, তোমারই পথে এগিয়ে চলি। তোমার রহমতের আমরা আকাঙ্খী, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি আর তোমার আযাব শুধুমাত্র কাফিরদের জন্যেই।

দোয়া কুনুতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে, একমাত্র তোমাকে ব্যতীত আর কারো ওপর আমরা ভরসা করি না, সর্বাবস্থায় আমরা তোমারই প্রতি ভরসা করি। আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করছি, কখনো আমরা অকৃতজ্ঞতার পথে অগ্রসর হই না। যারা তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ, তোমার বিধান মানে না, তোমার বিধানের সাথে বিরোধিতা করে, তোমার দেয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে অন্য কোনো বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, আমরা তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখি না।

এ ধরনের নানা কথা মহান আল্লাহর সম্মুখে বলা হয়। নামায শেষ করেই ঐ সবলোকদের সাথেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা হয়, তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়, তাদেরকেই সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়, যারা ইসলামের পরিবর্তে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে যারা নামাযে বলা কথাগুলোর সাথে নিজেরাই বাস্তব কর্মের মাধ্যমে স্ববিরোধিতা করে থাকে, তাদের নামায অবশ্যই মহান আল্লাহ কবুল করবেন না এবং এই নামায কোনোক্রমেই ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে বিরত রাখবে না। আখিরাতের ময়দানে এসব নামাযীর দিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দৃষ্টি দিবেন না এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদেরকে নিজের উম্মত হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন না।

আরবী ইবাদাত শব্দের ভুল অর্থ গ্রহণ করার কারণেই একশ্রেণীর নামাযীর বাস্তব জীবনধারায় বৈপরিত্য দেখা যায়। ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো-তারা মনে করেছে, নামায-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে

সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যারা পড়ে তারা নামাযের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামায আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ু লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামায-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামায-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না।

সৈনিক জীবনে যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামায-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার

সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামায-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহর গোলামী করার জন্য।

নামাযে কী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়?

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের ওপর। নেতৃত্ব দিতে হলে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হয়। নেতৃত্বের মৌলিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম না হলে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নামায মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা নেতৃত্ব দিবেন, তাদের প্রথম কাজ হলো, নিজেরা যাবতীয় সৎ গুণাবলীর অধিকারী হবেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের সর্বপ্রথম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করা। নামায মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভয় সৃষ্টি করে দেয়।

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, নামায আদায়ের পূর্ব শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। একজন মানুষ যখন নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বা নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, তখন কেউ তাকে এ প্রশ্ন করে না যে, আপনার শরীর ও পোষাক পবিত্র কিনা বা আপনি অযু করেছেন কিনা।

কারণ যিনি নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়েছেন, তিনি শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করেছেন, পবিত্র বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং অযু করেই মসজিদে প্রবেশ করেছেন। অপবিত্র শরীর ও বস্ত্রে বা অযু ব্যতীতই একজন মানুষ মসজিদে নামাযে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে না। তবুও কেনো সে পবিত্রতা অর্জন করলো? কারণ এ কথা তার মনে সক্রিয় রয়েছে যে, অপবিত্র অবস্থায় বা অযু ব্যতীত নামায আদায় করলে সে নামায আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবেন না এবং আদালতে আখিরাতে তাকে গ্রেফতার করা হবে। এই ভয় তার মধ্যে জাগ্রত ছিলো বলেই সে পবিত্রতা অর্জন করেছে। এভাবে নামায মানুষের মনে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

যারা একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করে, তারা যে কোনো অবস্থায়ই থাক না কেনো– জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা নামায ত্যাগ করেন না। তাদের জীবনে এমন অবস্থা হয় না যে, নির্জনে তারা একাকী রয়েছেন, এখন নামায আদায় না করলে কোনো মানুষ দেখবে না। কিন্তু

www.pathagar.com

এরপরও তারা একমাত্র মহান আল্লাহর ভয়ে নামায আদায় করে থাকেন। নামাযে দাঁড়িয়ে নীরবে কে কোন্ সূরা পাঠ করছে, নামায শেষে এ জন্য তাকে কারো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। কেউ ইচ্ছে করলে নামাযে সূরা বা অন্যান্য তসবীহ্ পাঠ না করে অন্য কিছুও পাঠ করতে পারে।

কিন্তু কেউ না শুনলেও মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুই শুনছেন, এই ভয় মনে জাগরুক থাকার কারণে নামাযে যেখানে যা পাঠ করতে হবে, মানুষ তাই পাঠ করে। এভাবে নামায মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি করে যে, নির্জনে একাকী অবস্থায় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যে কাজ করা হবে, তা মহান আল্লাহ দেখবেন এবং এই কাজের হিসাব আল্লাহর দরবারে তাকে দিতে হবে। এভাবেই নামায মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান মানুষে পরিণত করে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। একটি বিষয়ে এভাবে বার বার তাগিদ দেয়ার একমাত্র কারণই হলো, যার মনে মহান আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে, সে ব্যক্তির পক্ষে কোনোক্রমেই অসৎ কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করা সম্ভব নয়। তার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, দায়িত্বে অবহেলা করা বা দেশ ও জাতির ক্ষতি হয় এমন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর ভয় মুসলমানদের মধ্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে জাগরুক রাখার লক্ষ্যেই তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দেয়া হয়েছে। মুসলমান নামায আদায়ের মাধমে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে জীবন পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আল্লাহকে ভয় করার দুর্লভ গুণ মুসলমান যেন আয়ত্ব করতে পারে, এর জন্য যেমন নামায ফরজ করা হয়েছে, তেমনি পবিত্র কোরআনে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো যতটা ভয় তাঁকে করা উচিত। (সূরা ইমরান-১০২)

সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মুসলমান যেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্মরণে রাখে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে। পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাঁর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে, সেই আল্লাহ তা'য়ালাকে মুসলমান প্রত্যেক কাজে যেন স্মরণে রাখে, এই প্রশিক্ষণ নামাযের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। মুসলমানের চব্বিশ ঘন্টার জীবন নামায দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ নামায যেমন মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারে তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে নামাযের বাইরের জীবনও যেন তাঁকে স্মরণে রেখে তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত করা হয়. তার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে। প্রত্যেক দিন এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় দিনের যখন সূচনা হয় তখন থেকেই আর শেষ হয় দিনের শেষে রাতের প্রথম প্রহরে। অর্থাৎ ফজরের নামায দিয়ে শুরু এবং এশার নামাযে এই প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

www.pathagar.com

সারা দিনের মধ্যে আরো তিনবার অর্থাৎ যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাযে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফজরের নামাযে মুসলমানকে প্রথম প্রশিক্ষণ দেয়া হলো, তোমাকে এই পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছে। তুমি নিজেকে আল্লাহর বিধানের অধীনে পরিচালিত করবে এবং এই বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সংগ্রাম করবে। তুমি মুক্ত-স্বাধীন নও, তোমার সকল কাজের হিসাব ঐ আল্লাহর দরবারে দিতে হবে, যে আল্লাহকে তুমি দিনের সূচনায় সমস্ত কাজের পূর্বে প্রথমে সিজ্‌দা দিলে। পৃথিবীর অন্যান্য কাজ শুরু করার পূর্বে তুমি সর্বপ্রথমে তোমার যে রব্‌-কে সিজ্‌দা দিলে, সেই রব্‌-এর আদেশ অনুসারেই তুমি সারা দিন পৃথিবীর অন্যান্য কাজ-কর্ম করবে।

ফজরের নামাযের পরে একজন মুসলমান জাগতিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। এসব কাজের মধ্যে সে নিজেকে যেন বিলীন করে না দেয় এবং নিজেকে যেন স্বাধীন সত্তা বলে বিবেচনা না করে, এই কথাটি তাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই যোহরের নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্ম স্থগিত রেখে যোহরের সময় পুনরায় তাকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ ফজরের নামাযে তাকে যে চেতনার প্রশিক্ষণ দেয়া হলো, দুনিয়ার ঝামেলায় নিমজ্জিত হয়ে সেই চেতনা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। চেতনা অনেকাংশে ঝিমিয়ে পড়ে। এই চেতনাকে পুনরায় যোহরের সময় শাণিত করা হয়। ফজরের সময় যে প্রশিক্ষণ দিয়ে দুনিয়ার দুর্গম স্থানে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, যোহর, আসর ও মাগরিবের সময় সেই চেতনাকে শাণিত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সবশেষে সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ যখন সে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবে, তখনও তাকে সেই একই চেতনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়।

নামায এভাবেই মুসলমানের চব্বিশ ঘন্টার জীবনে মহান আল্লাহর স্মরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-

আমাকে স্মরণে রাখার জন্য নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা ত্ব-হা-১৪)

পৃথিবীর নেতৃত্বের দায়িত্ব যাদের প্রতি অর্পণ করা হলো, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নামায বাধ্যতামূলক করে দিয়ে তাঁকে প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা এ জন্যই করেছেন যে, তারা কোনো কাজই যেন নিজের মর্জ্জি মতো না করে। প্রত্যেক কাজেই যেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে গিয়ে অর্থাৎ নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সে যেন সীমালংঘন না করে, এ জন্যই নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণে রাখার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নামায সাংগঠনিক জীবনের বাস্তব প্রশিক্ষণ

নামায মুসলমানদের মধ্যে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কথা অনস্বীকার্য যে- ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী না হলে পৃথিবীতে কোনো জাতি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও উন্নতির শিখরে পৌছতে পারে না এবং নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারও করতে পারে না। ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে পৃথিবীর বহু শক্তিশালী জাতি পরাধীনতার অভিশাপে গোলামীর জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যে যখন ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিলো, তখন সারা দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন ছিলো তাদের পদতলে।

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতির অস্তিত্ব ছিলো না যে, তারা মুসলমানদের দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে বা তাদের প্রতি নির্দেশের স্বরে কথা বলে। কিন্তু সেই মুসলমানই বর্তমানে রয়েছে বরং অতীতের তুলনায় বর্তমানে তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। তবুও তারা গোলামী, লাঞ্ছনা আর অবমাননাকর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির কাছে কুকুরের মতো প্রাণীর যে মূল্য রয়েছে, মুসলমানদের সেই মূল্য নেই। পাশ্চাত্য দুনিয়া স্বদম্ভে ঘোষণা করছে, পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের জন্য যে মানবাধিকার প্রযোজ্য, তা মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব কতটা নির্মম পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ হলো বর্তমানের মুসলিম দুনিয়া। সারা দুনিয়া ব্যাপী তারা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদেরকে বন্য প্রাণীর মতো নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, একটির পর একটি মুসলিম দেশ অমুসলিম শক্তি দখল করে নিচ্ছে, মসজিদসমূহ অস্ত্রের আঘাতে ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হচ্ছে, পবিত্র কোরআন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, অসহায় মুসলিম নারী, শিশু, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধদের ধরে কারাবদ্ধ করে কারাগারে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমান নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সামান্য মৌখিক প্রতিবাদও করছে না।

এর একমাত্র কারণ হলো, তাদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই। ঐক্য ও সংহতি মুসলমানদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছে। নামাযের অন্যতম শিক্ষা হলো ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যারা নামায আদায় করেন, তারা নামায থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

মুসলিম উম্মাহ্ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিবে, এ জন্য নামাযের মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন, মুসলিম উম্মাহ্ নামায থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই নামাযই মুসলমানদেরকে একমুখি হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে যে অবস্থায় মুসলমান বাস করুক না কেনো, তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন নিজেদের চেহারা মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বাঘরের প্রতি স্থির করে নামায আদায় করে। মহাসাগরের মাঝখানে জলযানে অথবা

মহাশূন্যে যন্ত্রযানে কোনো মুসলমান একাকী অবস্থায় যখন অবস্থান করবে, তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে, তাকে অবশ্যই নিজের চেহারা বায়তুল্লাহর প্রতি স্থির করে নামায আদায় করতে হবে। মুসলমান যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ কোন্ দিকে তা নির্ণয়ে যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে বায়তুল্লাহর অবস্থান মন যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সেদিকেই চেহারা স্থির করে নামায আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-

মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তুমি যেখানেই থাকো না কেনো, এর দিকেই মুখ করে তুমি নামায আদায় করতে থাকবে। (সূরা বাকারা-১৪৪)

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন বায়তুল্লাহ শরীফ পুনঃনির্মাণ করলেন, তখন মক্কা নগরী সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বিশেষ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১২৫ আয়াতে বলেছেন-

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا-وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى-

আর এ কথাও স্মরণ করো, আমি এই কা'বাঘরকে মানুষের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, সেই স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।

মুসলমানদের নানা ধরনের পথ, মত ও নানা কেন্দ্রের অনুসারী হওয়ার সুযোগ নেই। মুসলমানদের একমাত্র কেন্দ্র হলো কা'বাঘর এবং এই ঘরকে কেন্দ্র করেই মুসলিম মিল্লাত নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। নামায যেমন একমাত্র কা'বাঘরের দিকে মুখ করে আদায় করতে হবে, তেমনি সারা দুনিয়ার মুসলমান নিজেদেরকে একদেহের ন্যায় মনে করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমনই দেখতে পাবে, যেমন একটি দেহ। যদি তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয় তো তার সাথে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। (বোখারী, মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমাজে একজন মুমিনের অবস্থান হচ্ছে গোটা দেহে মস্তকের সমতুল্য। মাথায় ব্যথা হলে যেমন গোটা দেহ কষ্টানুভব করে, তেমনি একজন মুমিনের কষ্টে সমস্ত মুমিনই কষ্টানুভব করতে থাকে।

সাম্য, মৈত্রী, একতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্যে ইমারতের মতো হওয়া উচিত এবং তাদের একে অপরের জন্যে এমনই দৃঢ়তা ও শক্তির উৎস হওয়া উচিত, যেমন ইমারতের একটি ইট অপর ইটের জন্যে হয়ে থাকে। এরপর তিনি হাতের আঙ্গুলিসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে স্থাপন করলেন। (বোখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মিল্লাতকে একটি ইমারতের অনুরূপ হতে বলেছেন। সারা পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি ইমারতে পরিণত করার লক্ষ্যে নামায তাদেরকে কা'বা কেন্দ্রিক করে দেয়। সমস্ত মুসলমান যেমন কা'বাঘরের দিকে নিজের চেহারা স্থির করে নামায আদায় করবে, তেমিন তারা যে কোনো সমস্যার মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হয়ে সমস্যার সমাধান করবে। যে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে তারা কা'বাঘরের দিকে নিজের চেহারা স্থির করছে, সেই আল্লাহর বিধান অনুসারেই তারা সামগ্রিকভাবে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে। প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে একটি এলাকার লোকজন যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করার জন্য মসজিদে আসে, তখন এলাকার অন্যান্য লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের সুযোগ হয়। এলাকার একজনকে মসজিদে অনুপস্থিত দেখলে তার অনুপস্থিতির কারণ জানার জন্য স্বাভাবিক উৎসুক্য অন্যের মনে সৃষ্টি হয়।

জামাআতে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ধনী-গরীব, সাদা-কালো বা শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য করার অবকাশ নেই। যিনি মসজিদে প্রথমে আসবেন, তিনিই সামনের কাতারে বসার সুযোগ পাবেন। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন লোকটির বাড়ির বাগানের মালী কম মূল্যের পোষাক পরিধান করে প্রথমে মসজিদে এসে সামনের কাতারে বসেছে। এরপর তার মনিব বহু মূল্যবান পোষাক পরিধান করে মসজিদে এসে তারই বেতনভুক্ত মালীকে একথা বলতে পারবে না যে, তুমি আমার বেতনভুক্ত চাকর, আমি তোমার মনিব। আমার সামনে বসার অধিকার তোমার নেই।

যে মনিবকে দেখলে তার চাকর তটস্থ হয়ে পড়ে, বার বার সালাম জানায়, মনিবের সামনে যেন কোনো ধরনের বেয়াদবি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকে, মনিবের দেহের সাথে যেন নিজের দেহের স্পর্শ না ঘটে এ জন্য শঙ্কিত থাকে। কোনো কারণে যদি মনিবের পায়ের সাথে নিজের পায়ের স্পর্শ তার অজান্তেই ঘটে যায়, তাহলে চাকরী যাবার ভয়ে চেহারা রক্তশূন্য হয়ে যায়। সেই চাকরই যখন মনিবের আগে মসজিদে এসে সামনের কাতারে বসে যায়, পরে মনিব এসে ঐ চাকরের পেছনে বসে। এরপর নামাযে সিজ্দা দেয়ার সময় চাকরের পা যদি মনিবের মাথায় লেগে যায়, মনিবের এ কথা বলার সাহস নেই যে, নামাযে সিজ্দা দেয়ার সময় তোমার পা আমার মাথায় লেগেছে। এ জন্য তোমাকে এই শাস্তি গ্রহণ করতে হবে এবং আজ থেকে তোমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো।

একমাত্র নামাযই মানুষের মধ্যে থেকে উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা যাবতীয় ভেদাভেদ মুছে দিয়ে সাম্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নামায মানুষে মানুষে কোনো ধরনের ভেদাভেদ রাখে না। ডক্টর আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন–

একহি স্যফ মে খাড়ে হো গ্যায়ে মাহ্মুদ ও আয়ায
না কোই বান্দা রাহা না কোই বান্দা নাওয়ায।

www.pathagar.com

সম্রাট মাহ্‌মুদ আর তাঁর ভৃত্য একই সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কে সম্রাট আর কে ভৃত্য কোনো ভেদাভেদ থাকেনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়েই এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, সারা দুনিয়া তাঁদের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিলো। নামায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে সাম্য আর ঐক্য সৃষ্টি করেছিলো, এই সাম্য আর ঐক্যের কারণেই ইসলামী আদর্শ সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে তওহীদের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলো।

পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Philip K. Hitty তাঁর History of the Arabs নামক গ্রন্থে নামায প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, As a disciplinary measure this congrational prayer must have had great value for the proud indivisualistic sons of the desert. It developed in them the sense of social equality and the consciousness of solidarity. It promoted that brotherhood of community of believers which the religion of Mohammad had theoretically Substituted for blood relationship. The prayer ground thus became the first drill ground of Islam.

অর্থাৎ শৃঙ্খলা অনুশীলনের একটি ব্যবস্থা হিসেবে মরুভূমির উদ্যত ও আত্মকেন্দ্রিক সন্তানদের ক্ষেত্রে জামাআতের নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নামায তাদের মধ্যে সামাজিক সাম্য এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার চেতনার সৃষ্টি করেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ তাত্ত্বিকভাবে রক্ত সম্পর্কের স্থলে অভিন্ন জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিস্থাপন করেছিলো এই নামায তাকে উৎসাহিত করেছে। নামাযের ময়দান এভাবে ইসলামের প্রথম কুচকাওয়াজের ময়দানে পরিণত হয়েছে।

J. H. Dennisson কর্তৃক রচিত Emotion as the Basis of Civilization নামক গ্রন্থটি বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং তার উপসর্গ বিশ্লেষণে সহায়ক একটি অমূল্য প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, Mohammad had created a religion which had none of the features of the ancient cults, no priesthood, and no ceremonial, which was based on no form, but upon a spiritual relationship to, an unseen God. It was not designed to give prestige to a special group but to creat a universal brotherhood composed of all men of every race who would accept this God and promise loyalty to his prophet.

The vast difficulty of creating any sense of unity of solidarity in such a group is apparent. All historians declare that the amazing success of Islam in dominating the world lay in the estounding coherence or sense of unity in the group. But they do not explain how this miracle was worked. There can be little doubt that one

www.pathagar.com

of the most effective means was prayer. The five daily prayers when all the faithful, wherever they were, alone in the grim solitude of the desert or in vast assemblies in crowded city knelt or prostated themvelves towards Mecca, uttering the same words of adoration for the one true God and of loyalty to His prophet, produce an overwhelming effect even upon the spectators, and the psychological effect of thus fusing the minds of the worshippers in a common adoration and expression of loyalty is certainly stupendous. Mohammad was the first one to see the tremendous power of public prayer as a unification culture and there can be little doubt that the power of Islam is due to a large measure to the obedience of the faithful to this inviolable rule of the five prayers.

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সাথে প্রাচীন ধর্ম পদ্ধতিসমূহের কোনোটিরই সাদৃশ্য ছিলো না। এতে কোনো পুরোহিততন্ত্র নেই, নেই কোনো আনুষ্ঠানিকতা। মূর্তিহীন নিরাকার অদৃশ্য এক স্রষ্টার সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হচ্ছে এই ধর্মের ভিত্তি। একটি বিশেষ শ্রেণীকে প্রতিপত্তি প্রদানের কোনো অভিসন্ধি এর নেই, বরং বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ যারা এই স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাদের সকলের জন্য সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির চেতনা সৃষ্টি করা কত কঠিন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সকল ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারে ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে ছিলো মুসলমানদের আশ্চর্যজনক সংঘবদ্ধতা বা দলীয় শৃঙ্খলা। কিন্তু তাদের কেউ এই মু'যিযা কিভাবে কাজ করেছে, তার ব্যাখ্যা দেননি। এ ব্যাপারে নূন্যতম সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই ঐক্য ও সংহতির পেছনে ফলপ্রসূ যেসব ব্যবস্থা কাজ করেছে তার মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম।

মরুভূমির ভয়ানক নিঃসঙ্গতার মধ্যে একা অথবা জনবহুল নগরীতে যেখানেই বিশ্বাসী মুসলমানরা অবস্থান করুক না কোনো, যখন তারা একত্রিত হয়ে মক্কার দিকে কেবলা করে জানু পেতে বসে অথবা ভক্তিভরে অবনমিত হয়ে রুকু সিজদায় গিয়ে এক স্রষ্টার আরাধনা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে লিপ্ত হয়, তখন এমনকি দর্শকবৃন্দও অভিভূত হয়ে পড়ে। নামাযী লোকদের বিগলিত মনের এই সম্মিলিত আরাধনা ও আনুগত্যের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিস্ময়কর।

ঐক্যের সংস্কৃতি হিসেবে জামাআতের নামায তথা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনার শক্তি কত বিশাল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যই হচ্ছে ইসলামের শক্তি অর্জনের জন্য বিরাট অংশ দায়ী।

www.pathagar.com

যে জাতির মধ্যে ঐক্য, স্বকীয়তা, কেন্দ্রমুখিতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই, সেই জাতির পক্ষে সারা পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় তাদের পক্ষে নেতৃত্বের আসন নিয়ন্ত্রণ করা। একমাত্র নামাযই মুসলমানদের মধ্যে এই একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদেরকে নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এ জন্যই জামাআতে নামায আদায় করার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা বাকারার ৪৩ আয়াতে বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

শুধুমাত্র নামায প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়নি, যেখানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে তথা জামাআতে নামায আদায় করে, সেখানে তাদের সাথে গিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জামাআতে নামায আদায় করার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করে বলেছেন–যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং এর অনুসরণের পথে অর্থাৎ জামাআতে উপস্থিত হবার ব্যাপারে কোনো ওযরই প্রতিবন্ধক হিসেবে না দাঁড়ায় তার ঘরে আদায় করা কোনো নামায কবুল হবে না। প্রকৃত ওযর কি– এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভয় অথবা রোগ। (আবু দাউদ)

যারা জামাআতে উপস্থিত হয় না, তাদের ব্যাপারে নবীজী ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন– আমার ইচ্ছা হয় এই নির্দেশ জারী করতে যে, এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামায আদায় শুরু করুক, আর আমি লাকড়ী বহনকারী একদল সাথীসহ ঐসব লোকদের ঘর-বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই যারা নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয় না। (বোখারী-মুসলিম)

প্রশ্ন ওঠে, যারা জামাআতে নামায আদায় করে না, তাদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কেন। এর কারণ হলো, পৃথিবীতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার সর্বোপরি তাদের টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে জামাআতী জিন্দেগী তথা সাংগঠনিক জীবনের ওপর। আর জামাআতে নামাযই মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে, সাংগঠনিক জীবনের প্রশিক্ষণ দেয়, নেতা নির্বাচন, নেতার আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

জামাআতে নামায মুসলমানদের প্রথমে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। সংগঠন ভুক্ত হয়ে তাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। সংগঠন থেকে কোনো মুসলমান বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না। কোনো মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে গোটা সংগঠন তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ একজন মুসলমান যে কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে সে নিজেকে কখনো অসহায় বোধ করবে না। কারণ সে জানে, তার বিপদে সে একা নয়– গোটা

www.pathagar.com

সংগঠন তার পাশে এসে দাঁড়াবে। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত কখনোই সম্ভব হয় না। মুসলমানদের প্রধান যে দায়িত্ব অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, এই দায়িত্ব পালন করা কোনো মুসলমানের পক্ষে একা সম্ভব নয়- সাংগঠনিক শক্তি অপরিহার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যই জামাআতে নামায মুসলমানদের সাংগঠনিক জীবন গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়।

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ لْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ الاَّ اَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ- (مسند احمد ، ترمذى)

হযরত হারেসুল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন- সে কাজগুলো হলো, জামাআতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামাআত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো- যতক্ষণ না সে পুনরায় জামাআতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (মুসনাদে আহ্‌মদ, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দল নেতার আনুগত্যকে অস্বীকার করে দল পরিত্যাগ করলো এবং সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

মানব সমষ্টির এমন একটি দলকে জামায়াত বলা হয়, যারা একটি বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষ কোন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়। দলবদ্ধতার জন্য চারটি জিনিস অপরিহার্য। যেমন- উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, নেতৃত্ব ও সংগঠন। এই চারটির যে কোন

www.pathagar.com

একটির অভাবে দল গঠন পূর্ণ হবে না। এ কারণেই হাট-বাজারের সংঘবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলভুক্ত বলা হয় না। কারণ উপরোক্ত শর্তগুলোর একটিও এর মধ্যে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ঈদগাহ ও জুমুয়ার মসজিদের দলবদ্ধ লোকদেরকে জামায়াত বা দলবদ্ধ বলা হয়। কারণ, উপরোক্ত শর্তসমূহের সবকটিই তার মধ্যে বিদ্যমান।

পৃথিবীর বড় বড় ইমারত বা রাজপথ নির্মিত হয়েছে ইট বা পাথর দিয়ে। এসব ইট বা পাথর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দাবী করা যায় না যে, এসব একটি ইমরাত বা মজবুত পথ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট-পাথরগুলো একটির সাথে আরেকটি সাজানো হলে তবেই তা ইমারত বা পথের আকৃতি ধারণ করবে। যেসব শলাকা একত্রিত করে আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ু প্রস্তুত করা হয়, সেসব শলাকা বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকলে তা আবর্জনা পরিষ্কার করার ক্ষমতা অর্জন না করে– বরং স্বয়ং শলাকাই আবর্জনায় পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সংগঠন বহির্ভূত মুসলমান নিজেই বাতিল শক্তির শিকারে পরিণত হতে বাধ্য। শয়তানের আক্রমণ তথা বাতিলের আবর্জনা মুক্ত থাকার জন্যই প্রত্যেক মুসলমানকে সাংগঠনিক জীবনের আওতায় আসতে হবে।

হাদীসে জামায়াত বা দলকে ইসলামী জামায়াত বা দল অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর ইসলামী জামায়াত বা দল বলা হয় এমন একটি দল বা জামায়াতকে যে দলটি আল্লাহ ও রাসূলের তথা কোরআন-হাসীদের প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোন একজন নেতার (ইমামের) নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব মুসলমানদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী দল। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর সংযোগহীন একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাতিলকে ধ্বংস করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের জামায়াত বা দলের উপর অর্পণ করেছেন– কোন একক ব্যাক্তির প্রতি নয়। কারণ এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এক ব্যক্তির চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। তা সে একক ব্যাক্তি যতবড় জ্ঞানী-গুণী বা ক্ষমতাশালী লোক হোক না কেন। নবী-রাসূলের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও একটি সংগঠিত জামায়াত বা দলের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এ জন্যই হাদীসে জামায়াত বা দলের সাথে একত্রিত থাকার জন্য অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুর্খতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

عَنْ مُعَاذْ ابْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ–قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ النَّاحِيَةَ
وَاِيَّاكُمْ والشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ–

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মেষ পালের মধ্য থেকে) বাঘ সেই মেষটিকে ধরে নিয়ে যায়,

www.pathagar.com

যে একাকী বিচরণ করে। অথবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা (দল ছেড়ে) দুর্গম গিরি পথে একা যাবে না। এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কিছু লোক পশু পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। চারণভূমি এবং পর্বতের পাদদেশে তারা তাদের পশুগুলোকে দলবদ্ধভাবে চরাতো। বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী কোন পশুকে ধরে নিয়ে যেতে না পারে, এ জন্য তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। ফলে রাখালদের অস্ত্রের ও পশুদলকে পাহারা দেয়ার শিকারী কুকুরের ভয়ে কোন বাঘই পশুদলকে আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু রাখালদের অগোচরে কোন পশু যদি ঘাস খেতে খেতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তখনই নিকটবর্তী পর্বতের গুহা বা জংগল থেকে বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবার সুযোগ পেত।

এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, দলছাড়া পশু যেমন বাঘের শিকার হয় তেমনি জামায়াত বা দল ছাড়া মুসলমানও শয়তানের শিকার হয়, তা সে যত বড় ঈমানদার মুসলমানই হোক না কেন। সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানদের যে দুর্দশা ও দুর্ভোগ তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য। মুসলিম দেশগুলোর অনৈক্যের কারণেই গুটি কয়েক ইয়াহূদীর হাতে প্রতি মুহূর্তে মুসলিম নারী, শিশু, যুবক-বৃদ্ধের রক্ত ঝরছে। ঈমানহারা মুসলিম মিল্লাতের কোনো সম্মান-মর্যাদা পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। অমুসলিমের মধ্যে কতিপয় রক্ত লোলুপ হায়েনা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে গোটা দুনিয়া ব্যাপী এক নির্মম তান্ডব শুরু করেছে। বর্তমানে যদিও মুসলিম সম্প্রদায় কোথাও দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে দলবদ্ধতা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে নয়; বরং ভাষা বর্ণ অথবা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে, যাকে আল্লাহর নবী স্পষ্ট ভাষায় জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّهَ لاَيَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّفِى النَّارِ. (ترمذى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াত বা দলের উপরই আল্লাহ তা'য়ালার রহমত। সুতরাং যে জামায়াত বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

এই হাদীসে আল্লাহর হাবীব সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উম্মতেরা কখনও কোন ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। আর এরই কারণে ইজমায়ে উম্মতের (সংঘবদ্ধ সিদ্ধান্তকে) শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ. (ابوداؤد)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত বা দল ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রশি থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিলো। (আবু দাউদ)

ব্যক্তিগত জীবনে একটি লোক যতই আল্লাহভীরু হোক না কেন, যদি সে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত মুসলমানদের কোন জামায়াত বা দলে নিজেকে শামিল না করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে শামিল হলো না। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যে জামায়াত বা দল গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিলো আল জামায়াত।

অর্থাৎ মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত বা দল। তখন প্রত্যেকটি লোকের উপর উক্ত জামায়াত বা দলে যোগ দেয়া ফরয ছিলো এবং উক্ত দলের বাইরে থাকা ছিল কুফরী। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের বিদায়ের পর তাঁর উম্মতের মধ্যে একাধিক লোকের নেতৃত্বে একাধিক জামায়াত বা দল হতে পারে। তবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে এক ও অভিন্ন এবং সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা একাধিক দলও পরস্পর পরস্পরের সাহযোগিতা করবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর মুসলমানদের বিশেষ কোন একটি জামায়াত বা দল নিজেদের জামায়াত বা দলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য একমাত্র জামায়াত বা দল বলে দাবী করতে পারে না, যার বাইরে থাকা কুফরী। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলমানদের কোন একটি দলে অংশগ্রহণ না করে নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন সদস্য মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

নেতা নির্বাচনে নামাযের ভূমিকা

অগণিত মানুষ যদি একত্রে জামাআত বদ্ধ হয়ে নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে সেই জামাআতের ইমাম বা নেতা হতে হবে একজন। একের অধিক ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে নামায আদায় করা যাবে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তার নামায হবে না। এক কোটি মানুষ যদি কোথাও নামায আদায়ের উদ্যোগ নেয়, তাহলে সেই এক কোটি মানুষই একজন মাত্র নেতার আনুগত্য করবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, নামায হলো মুসলমানদের জীবনের যাবতীয় কাজের মডেল। এই মডেল সামনে রেখে মুসলমানরা অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবে। জামাআতে নামাযে যাকে ইমাম বা নেতা বানানো হবে, সেই ব্যক্তি নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী কিনা তা যাচাই-বাছাই করে তারপর তাকে ইমাম বা নেতা বানানো হয়।

সাধারণত একটি এলাকা বা মহল্লার মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করার জন্য একজনকে ইমাম নির্বাচন করা হয়। এমন একজন ব্যক্তিকে ইমাম বা নেতা হিসাবে বরণ করা হয়, যিনি এলাকার সকলের তুলনায় কোরআন-হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। কোরআন-হাদীস অনুসারে জীবন-যাপন করেন, অর্থাৎ সৎ যোগ্য, আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করেন এমন একজন লোককেই ইমাম বা নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এলাকার সবথেকে বড় চোর, সন্ত্রাসী, চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ বা কুখ্যাতির অধিকারী কোনো লোককে ইমাম বা নেতা হিসেবে বরণ করা হয় না। এমন লোককেও ইমাম বানানো হয় না, যার স্ত্রী-মেয়ে পর্দায় থাকে না বা ছেলে নামায আদায় করে না। জামাআতে নামায এভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যে, নিজ এলাকা, সমাজ বা দেশ– যেখানেই হোক না কেনো, গন্ডী যত ক্ষুদ্রই হোক– সেই গন্ডীতে যাকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হবে, তাকে ঐসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, যে গুণ-বৈশিষ্ট্য মসজিদের ইমাম বা নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছিলো।

কোনো স্থানে কিছু লোক জমায়েত হয়েছে এ অবস্থায় নামাযের সময় হলো। ফরজ নামায জামাআতে আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেবে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কোন্ ব্যক্তিকে ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করে তাঁর পেছনে নামায আদায় করা হবে। ইসলামের বিধান হলো, ইমাম বা নেতৃত্বের পদের জন্য কেউ প্রার্থী হতে পারবে না, কিন্তু যিনি ইমাম হবেন তাকে উপস্থিত ব্যক্তিদের আস্থাভাজন হতে হবে। উপস্থিত লোকজন তাকেই ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করবে, যে ব্যক্তি উপস্থিত লোকদের কাছে সৎ-চরিত্রবান ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এভাবে প্রতিদিন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে অসংখ্যবার ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করে জামাআতে নামায আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে না। ইমাম বা নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেউ কারো পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে না, এখানে কোনো লোভ-লালসা বা প্রলোভনের স্থান নেই, কেউ কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে না, কেনো বিরোধী দল বা

www.pathagar.com

মতেরও সৃষ্টি হচ্ছে না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করে তার কমান্ডে অগণিত মানুষ জামাআতে নামায আদায় করছে। সাংগঠনিক জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নামাযের নেতা নির্বাচনের শিক্ষা যদি বাস্তবে অনুসরণ করা হতো, তাহলে বর্তমানে নেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা দল-উপদল, হানাহানি, মারামারি ও হত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হতো না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, যারা নামায আদায় করছেন, তাদের অধিকাংশই নামাযের এই শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন না।

নামায যে পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন শিক্ষা দেয়, এই পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিপর্যয় বা বিশৃংখলার সৃষ্টি না হওয়ার কারণ তিনটি। প্রথম কারণই হলো নির্বাচনের উদ্দেশ্য। যারা ইমাম বা নেতা নির্বাচন করছেন এবং যিনি ইমাম বা নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাদের উভয়ের এ কথা স্পষ্ট জানা রয়েছে যে, এতে কারো কেনো স্বার্থ যেমন উদ্ধার হবে না, তেমনি কারো স্বার্থ ক্ষুণ্নও হবে না। বরং উভয়ে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবেন মাত্র। ইমাম বা নেতা যেমন নিজের স্বার্থে তার অনুসারীদেরকে ব্যবহার করতে পারবেন না, তেমনি মুক্তাদী বা অনুসারী দলও ইমাম বা নেতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, জামাআতে নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতা নির্বাচনকালে কেউ প্রার্থী হতে পারে না বা ইসলাম এই সুযোগ কাউকে দেয়নি। দল বা সংগঠনে নেতা নির্বাচনকালে কেউ প্রার্থী হবে, কেউ নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, কাউকে নেতা নির্বাচিত করার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে-এসব বিষয় ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি কারো যদি ইশারা-ইঙ্গিতেও নেতা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে সেই পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

নেতা নির্বাচন সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আমার লেখা 'আমি কেন জামাআতে ইসলামী করি' নামক গ্রন্থে। ইসলাম নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থী প্রথার বিলোপ সাধন করেছে। ইসলামী দল বা সংগঠনে কেউ প্রার্থী হতে পারবে না। যেখানে প্রার্থী প্রথা রয়েছে, সেখানেই একের পক্ষে অন্যের প্রচারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কান কথা, লোভ-লালসা, দল-উপদল, মারামারি, হত্যা তথা যাবতীয় অপকর্মের অস্তিত্ব রয়েছে। জামাআতে নামায নেতা নির্বাচনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, সেখানে সর্বস্তরে শান্তি বজায় থাকে এবং একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিই নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায় নির্বাচন পদ্ধতিও দুর্নীতি মুক্ত থাকে।

জামাআতে নামাযে নেতা নির্বাচনে মুক্তাদী বা অনুসারী দল তথা সর্বস্তরের ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত ইমাম বা নেতার কাছে যেমন যে কোনো ব্যক্তি অবাধে যাতায়াত করতে পারেন, তেমনি যে কোনো ব্যক্তির কাছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করলে তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। এ কারণেই আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখতে পাই, তাঁরা নেতৃত্বের পদে আসীন হবার পরে তাঁদের কর্মনীতি, দৈনন্দিন জীবনধারা তথা যাবতীয় কাজের জন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি

www.pathagar.com

করেছেন। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায এভাবেই মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণমুক্ত, ভীতিহীন, শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেই সাহাবায়ে কেরাম বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন।

আজও সে নামায রয়েছে, কিন্তু নবীজী যেভাবে নামায আদায়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, সেই নামায খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই আদায় করে থাকে। যে উদ্দেশ্যে নামায ফরজ করা হয়েছে, সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্মরণে রেখে অতি নগণ্য সংখ্যক মুসলমান নামায আদায় করছে। জামাআতে নামায ঠিকই প্রতিদিন আদায় হচ্ছে, কিন্তু এর যে শিক্ষা তা কোথাও বাস্তবায়ন হতে দেখা যাচ্ছে না।

যে নামায থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমানরা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, সেই নামায কি মুসলমানরা আদায় করছে? বরং বিষয়টি হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। বিশ্ব শাসন করবে মুসলিম জনগোষ্ঠী, এখন লজ্জাজনকভাবে তারাই এমন জাতিসমূহের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যারা পৃথিবীতে যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী। মুসলমানরা অসৎ কাজের প্রতি বাধার সৃষ্টি করবে, কিন্তু তারাই অমুসলিম জাতিসমূহ কর্তৃক প্রবর্তিত অন্যায়-অসৎ নীতি-পদ্ধতি প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছে।

জামাআতে নামাযের ইমাম বা নেতা নিজের মর্জ্জি অনুযায়ী নামায আদায় করাতে পারেন না। আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে বলেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই ইমাম বা নেতাকে নামায আদায় করাতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে নামায হবে না। ইমাম বা নেতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতির ব্যতিক্রম করছেন কিনা, তা জানার জন্য অনুসারী বা মুক্তাদীদেরকে কোরআন হাদীসের ততটুকু জ্ঞানার্জন করতে হবে, যতটুকু জ্ঞান থাকলে ইমাম বা নেতা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন কিনা তা জানা যাবে।

ইমাম বা নেতা যদি ভুল করেন, তাহলে অনুসারী বা মুক্তাদী নেতার ভুল কীভাবে সংশোধন করবেন? ইমাম বা নেতার ভুল সংশোধন করার পদ্ধতিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে করে জামাআতে নামায মানুষকে কোরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

নেতা যদি বার বার ভুল করতে থাকেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন-হাদীসের প্রদর্শিত পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহলে সেই ইমাম বা নেতার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে নতুন ইমাম বা নেতা নির্বাচিত করতে হবে। নেতার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও যেন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নামাযে ইমাম যদি কোনো ভুল করেন, তাহলে অনুসারী বা মুক্তাদী উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার

www.pathagar.com

বলবেন। কোরআনের আয়াত পাঠ করার সময় যদি কোনো শব্দ বা আয়াত বাদ দিয়ে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে থাকেন, তাহলে মুক্তাদী বা অনুসারীদের মধ্যে কারো জানা থাকলে তা পাঠ করে তিনি ইমাম বা নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ইমাম বা নেতার ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জামাআতে নামায নেতা নির্বাচন, নেতার আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ দেয়। ইমাম রুকু সিজ্‌দায় গিয়েছেন, মুক্তাদী দাঁড়িয়ে আছে বা ইমাম দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, মুক্তাদী রুকু সিজ্‌দায় গিয়েছেন, কোথাও কখনো এমন দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে না। কোনো মুক্তাদী যদি এমন করে তাহলে তার নামাযই হবে না। অর্থাৎ ইমাম বা নেতা যখন যে কমান্ড করছেন, মুক্তাদী বা অনুসারী তৎক্ষণাত তা প্রশ্নাতীতভাবে নীরবে পালন করছে। মুসলমানদের সাংগঠনিক জীবনে ঠিক এভাবেই নেতার আনুগত্য করতে হবে, যেভাবে জামাআতে নামাযে ইমামের আনুগত্য করা হয়। তবে নেতার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্তই করা যাবে, যতক্ষণ নেতা কোরআন-হাদীস ভিত্তিক নির্দেশ প্রদান করবে।

নামায সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নামায যেমন মুসলমানদের প্রতি বাধ্যতামূলক করেছেন তথা ফরজ করেছেন, তেমিন সঠিক সময়ে নামায আদায় করাও ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

বস্তুত নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবির্ততা সহকারে ঈমানদার লোকদের ওপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে। (সূরা আন নিসা-১০৩)

সময় মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মানুষের জীবনকাল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, খুবই অল্প সময় মানুষকে দান করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের গড় আয়ু হলো ৬০ বছর। পূর্ববর্তী নবী-রাসূল যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যেমন অধিক হায়াত পেয়েছেন, তেমনি তাঁদের উম্মতগণও অধিক হায়াত পেয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত স্বল্প হায়াতের অধিকারী বিধায় তাদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা মহান আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন যে, এরা অল্প কাজের অধিক বিনিময় পাবে। যেমন মুমিন বান্দা সুবহানাল্লাহ, আল হাম্‌দু লিল্লাহ উচ্চারণ করলে তার আমলনামায় অসংখ্য সওয়াব লিপিবদ্ধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার রমজান মাসের প্রত্যেক কাজের সর্বাধিক বিনিময় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কদরের রাতের সম্মান-মর্যাদা অগণিত রাতেরও অধিক বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ জন্য সময়ের ব্যাপারে ইসলাম মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সতর্ক করেছে এবং সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার জন্য নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ কাল বা সময়

www.pathagar.com

অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে জীবনের শেষ প্রান্তে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ধারিত এই সময়ের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি-ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সোনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না।

মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। অর্থের অপব্যবহার করলে তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন ঊষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়।

বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ–আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে

www.pathagar.com

পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এরই নাম সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না।

পৃথিবীতে বর্তমান বলে কিছুই নেই–এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।' মানুষ তার জীবনকাল সম্পর্কে দীর্ঘ আশা পোষণ করে অথচ ক্ষণ পরে কী ঘটবে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়–৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লিখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনো কাজেই লাগবে না।

মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কৃষ্ণকালো বিবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না। এই ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই যথাযথ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়েছেন। ফজরের নামায কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সূর্য উদিত হওয়ার পরে আদায়

www.pathagar.com

করে, তাহলে তার নামায হবে না। যোহর বা আসরের নামায যদি কেউ সন্ধ্যার পরে আদায় করে তাহলে তার নামায হবে না। নামায যিনি ফরজ করেছেন, তিনিই নামায আদায়ের সময়ও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ-اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا-

নামায প্রতিষ্ঠিত করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কোরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো। কারণ ফজরের কোরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

উল্লেখিত আয়াতে যে 'দুলূক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী কালের মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এর অর্থ করেছেন, দুপুরে সূর্যের পশ্চিম দিকে হেলে পড়া। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'গাসাকিল লাইলি' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন রাতের সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়া। এর অর্থ হলো ইশার নামাযের প্রথম ওয়াক্ত। আবার কেউ অর্থ করেছেন, মধ্যরাত বা গভীর রাত। এর অর্থ হলো ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত। উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত 'ফজর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, প্রভাতের প্রকাশ পাওয়া, প্রভাতের উদয় হওয়া, নিশি ভোর হওয়া বা রাতের অবসান হওয়া। অর্থাৎ রাতের অবসানের সেই প্রথম সময়টি, যখন পূর্ব গগনে পূর্বাশার ইশারা দেখা দেয় বা প্রভাতের সাদা-শুভ্রতা অন্ধকার রাতের বক্ষ ভেদ করে উঁকি দিতে থাকে।

'দুলূক' শব্দের অর্থ কেউ করেছেন সূর্যের পতন হওয়ার ক্ষেত্রে। প্রকৃত অর্থে সূযের পতনও চার বার হয়ে থাকে। প্রথমবার সূর্য যখন দিনের অর্ধেক অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে। দ্বিতীয়বার সূর্য যখন অপরাহ্নের দিকে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য ও উত্তাপ হারিয়ে এক বিশেষ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তৃতীয়বার সূর্য যখন পশ্চিম গগনে অস্তমিত হয়ে যায়। চতুর্থবার পশ্চিম দিগন্তের দিকচক্রবালে দৃশ্যমান রক্তিম আভা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই চারটি সময়কে কেন্দ্র করেই ধারাবাহিকভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করার বিষয় উল্লেখ করে ফজরের নামায আদায়ের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে, ফজরের সময়ে কোরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়। এ কথার অর্থ হলো, মহান আল্লাহর অগণিত ফেরেশ্‌তা এ সময়ের সাক্ষী হয়। হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা প্রত্যেক নামায ও সৎকাজের সাক্ষী হন, তবুও বিশেষভাবে ফজরের নামাযে কোরআন পাঠের ব্যাপারে তাঁদের সাক্ষী হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে এর গুরুত্ব ও গভীর তাৎপর্যের দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঠিক এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দীর্ঘ আয়াত ও সূরা পড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ফজরের নামাযে পবিত্র কোরআনের যে কোনো দীর্ঘ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করতেন। আবু দাউদও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে, সফরকালে তিনি ফজরের নামাযে প্রথম রাকাআতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস অথবা প্রথম রাকাআতে সূরা নাস ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফালাক তিলাওয়াত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এই নীতিই অবলম্বন করতেন।

মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ করা হয়েছিলো, তার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে যে, দিনের সূচনার নামায আদায় করতে হবে সূর্য উদয়ের পূর্বে। আর পরবর্তী চার ওয়াক্ত নামায সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের প্রথম প্রহরে আদায় করতে হবে। কোন্ সময়ে কোন্ পদ্ধতিতে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিব্‌রাঈল আমাকে দুই বার আল্লাহর ঘরের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করান। প্রথম দিন যোহরের নামায ঠিক এমন এক সময়ে আদায় করান, যখন সূর্য সবেমাত্র ঢলে পড়েছিলো এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার তুলনায় অধিক দীর্ঘ হয়নি। এরপর আসরের নামায এমন এক সময়ে আদায় করান, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ ছিলো। মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করান, যখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করে। এরপরে ইশার নামায আদায় করান পশ্চিম আকাশের লালিমা শেষ হয়ে যাবার পরে। আর ফজরের নামায আদায় করান যে সময়ে রোযাদারের প্রতি শেষ রাতে আহার করা হারাম হয়ে যাওয়ার সময়ে।

দ্বিতীয় দিন জিব্‌রাঈল আমাকে যোহরের নামায এমন সময় আদায় করান যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের সমান ছিলো। আসরের নামায আদায় করান এমন সময় যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিলো। মাগরিবের নামায আদায় করান এমন সময় যখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করে। ইশার নামায আদায় করান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ফজরের নামায আদায় করান আলো চারদিকে স্পষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরে। এরপর জিব্‌রাঈল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ! এটা হচ্ছে নবীদের নামায আদায়ের সময় এবং এই দুটো সময়ের মধ্যেই হচ্ছে নামাযের সঠিক সময়।

হযরহ জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রথম দিন যে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায আদায় করান এবং দ্বিতীয় দিন যে সময়ে নামায আদায় করান, এই সময়ের মধ্যে নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহর ফেরেশ্‌তা প্রথম দিন নামাযের প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করান এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করান। তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন– নামাযের প্রথম সময়ে নামায আদায় করা হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ। আর শেষ সময়ে নামায আদায় করা হলো, ক্ষমা লাভের সুযোগ।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেনোদিন কেনো ওয়াক্তের নামায দুইবার শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি। অর্থাৎ বিশেষ কেনো কারণ ব্যতীত আল্লাহর নবীর অভ্যাস ছিলো

www.pathagar.com

প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা। আল্লাহর নবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো, শ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি? জবাবে তিনি বলেছেন, প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা প্রতিদিন আসর ও ফজরের নামাযের সময় পালা বদল করে থাকেন। যদিও মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন, তবুও তিনি ফেরেশ্‌তাদের কাছে জানতে চান, তুমি যখন আমার বান্দার কাছে গিয়েছিলে তখন তাকে কি অবস্থায় পেয়েছিলে এবং যখন তাকে ছেড়ে এসেছো, তখন কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? আসর ও ফজর নামাযের সময় মহান আল্লাহর যেসব বান্দা নামাযরত অবস্থায় থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়, হে আল্লাহ! আমরা তোমার বান্দাকে নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই ছেড়ে এসেছি।

ফেরেশ্‌তাদের মুখে এ কথা শুনে আল্লাহ তা'য়ালা খুশী হন। সুতরাং নামায আদায় করতে হবে যথাযথ সময়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ-

নামায আদায় করো দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর। (সূরা হূদ-১১৪)

এই আয়াতে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে। সূরা ত্বাহা-এর ১৩০ আয়াতে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى-

আর নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের সময় পুনরায় পবিত্রতা বর্ণনা করো আর দিনের প্রান্তসমূহে।

নিম্নের আয়াতেও ফজর, যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায আদায়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ-وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো যখন সন্ধ্যা হয় এবং যখন প্রভাত হয়। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো দিনের শেষ অংশে এবং যখন তোমাদের দুপুর হয়। (সূরা রূম-১৭-১৮)

www.pathagar.com

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেসব প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সূর্য পূজারীদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই এমনকি বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগেও এক শ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ সূর্যকে মহাশক্তির উৎস মনে করে তার পূজা করে থাকে এবং তারা পূজা করে সূর্য উদয়, সূর্য মধ্য গগনে ও সূর্য অস্তের সময়। এ জন্য এই তিনটি সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম নামায আদায়ের সময় নির্ধারণ করে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও সময়ের মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সময় মানুষের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই সময়কে যারা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, তাদের পক্ষেই পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। নামায যেমন আদায় করা ফরজ, অনুরূপ ফরজ যথাসময়ে নামায আদায় করা। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সময় সচেতন ও সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নামাযের গুরুত্ব

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার অর্থই হলো, সমাজ, দেশ তথা পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহীতার যে প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এই পথ মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ নয়– এই পথ কন্টকাকীর্ণ। এই কাজ যেমন মর্যাদপূর্ণ তেমনি বিপদসঙ্কুল খেদমতের কাজ। এই পথে অগ্রসর হবার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিবিধ প্রকার বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ হবে, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ধৈর্য, দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, সঙ্কল্প, উচ্চাকাঙ্খা ও অবিচল ভূমিকার মাধ্যমে এসব কঠিন বিপদের মোকাবেলা করে আল্লাহর পথে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে হবে আর তখনই তাদের ওপরে মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজ করার জন্য যে শক্তি-সামর্থ প্রয়োজন, তা দুটো জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। প্রথম হলো 'সবর' বা ধৈর্য ও যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে বিকশিত করা। (সবরের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা আসরের তাফসীর দেখুন।)

দ্বিতীয় হলো নামায। নামাযের মাধ্যমে নিজেদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলা। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ–

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পথে মানুষকে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। আর এসব বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় মনকে সুদৃঢ় রাখার একমাত্র মাধ্যম হলো নামায। এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের লোকজন দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে এমন এমন ভিত্তিহীন কথা বলবে, যা শুনলে মন-মানসিকতা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। এই অবস্থা যেনো কোনো মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে নবীকে লক্ষ্য করে মুমিনদেরকে বলেছেন-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর দাসত্ব করে যেতে থাকো। (সূরা হিজর-৯৭-৯৯)

এই নামাযই যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে। নামায যাবতীয় যন্ত্রণার উপশম, মানুষের ভেতরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। আল্লাহর সৈনিকের সাহস ও হিম্মত বৃদ্ধি করে এবং ঐ যোগ্যতা ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন। একদিকে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাকে গালিগালাজ করছে, তার বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ ছড়াচ্ছে, তার পথে প্রতিরোধের দেয়াল তুলে দিচ্ছে, অন্য দিকে সে এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সম্মুখের দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে- এই যোগ্যতা নামাযই সৃষ্টি করে দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের ওপরে পাহাড়-পর্বত সমান বিপদ-মুসিবত এসেছে, এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নামাযের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। কারণ এই নামাযই যাবতীয় বিপদ-মুসিবতকে অগ্রাহ্য করার মতো মনোবল সৃষ্টি করে দেয়।

অভাব যখন ঘিরে ধরেছে, দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে, এক বস্ত্রে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে, চোখের সামনে দেখা গিয়েছে ইসলাম বিরোধী শক্তির শান-শওকত আর জাঁকজমক পূর্ণ অবস্থা, সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করেছে, এই অবস্থাতেই একমাত্র নামাজই মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى-

নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও নিয়মিত পালন করতে থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না, রিযিক তো আমিই তোমাকে দিচ্ছি এবং শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই। (সূরা ত্বা-হা-১৩২)

এই আয়াতে পারিবারিক একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্ম নিয়োগ করেছো তারা ঐ লোকগুলোর তুলনায় অস্বচ্ছল- যারা আমার বিধানের বিরোধিতা করছে এবং পৃথিবীতে পাপের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাদের অন্যায় ভোগ-বিলাসিতা দেখে তোমাদের সন্তান-সন্তুতি নিজেদের অভাব-অনটন ও দুরাবস্থার কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে- এ জন্য তাদেরকে নামায আদায়ের আদেশ দাও। তাহলে নামাযই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবে এবং তাদের মূল্যবোধ পরিবর্তিত করে দেবে। তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন হয়ে যাবে। তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রিযিকের ওপর সবর করবে এবং তাতেই পরিতুষ্ট হবে।

ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ অর্জিত হয় সেই কল্যাণকে তারা এমন ভোগের ওপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেবে, যা অন্যায় ও অসৎ এবং পার্থিব লোভ-লালসার পথে অর্জিত হয়েছে। আর আমার কোনো লাভের জন্যও নামায আদায় করতে বলছি না, বরং এতে তোমাদের নিজেদেরই লাভ নিহিত রয়েছে। সেই লাভ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে আর একমাত্র তাকওয়াই হলো পৃথিবী ও আখিরাতে, উভয় স্থানে স্থায়ী এবং কল্যাণের প্রতীক ও মাধ্যম।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে নিয়মিত জামাআতে নামায আদায় করতে দেখবে, তখন তাকে মুসলমান বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (তিরমিযী)

আমরা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করেছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি নামায আদায় করে না- এ কথা কল্পনা করার কোনো অবকাশই ছিলো না। এমনকি জামাআতে নামায আদায় না করলে তাকে মুসলিম সমাজের একজন বলে তাকে কেউ স্বীকৃতিই দিতো না।

মুনাফিক যারা ছিলো, তারাও মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করতে বাধ্য হতো। নামায ছেড়ে দেয়ার কোনো অবকাশ সে সমাজে ছিলো না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ নামায তো আদায় করেই না- বরং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে বিরোধিতার ক্ষেত্রে কুফুরী শক্তির তুলনায় অধিক যোগ্যতার সাথে বিরোধিতা করে, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, তারপরও নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি। এই শ্রেণীর লোকদের পরিচয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন-

www.pathagar.com

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ-لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ-

এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে, না পূর্ণভাবে এদিকে না পূর্ণভাবে ওদিকে। (সূরা নিসা-১৪৩)

নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে এমন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতবাদ-মতাদর্শ অনুসরণ করে এবং তা সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করে, যে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতবাদ-মতাদর্শ ইসলামী জীবন বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐসব আদর্শ সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের শেষ চিহ্নটুকু বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এসব কুফুরী মতবাদ-মতাদর্শ অনুসরণ করে ও সমাজ-দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে। আর তাদের দাবির অনুকূলে সাড়া দিয়ে একশ্রেণীর আলেম নামধারী লোকজন ফতোয়াও দিয়ে থাকে।

তাদের বিয়ে, মৃত্যুর পরে জানাযা, কুলখানি ও চল্লিশায় নিজেরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন সমাজের সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ কথাই প্রমাণ করে যে, লোকটি মুসলমান ছিলো। অথচ রাসূলের যুগে মুসলিম হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে হলে তাকে অবশ্যই মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাযের জামাআতে উপস্থিত হতে হতো এবং ইসলাম ও কুফরের সংঘাতের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ইসলামের পক্ষে তৎপরতা প্রদর্শন করতে হতো।

পৃথিবীর প্রতিটি মানবীয় দল বা সংগঠনের যেমন তার কোনো সদস্য বা কর্মীকে দল কর্তৃক আহূত বৈঠকসমূহে কোনো কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত হতে দেখলে নিঃসন্দেহে এটাই ধরে নেয়া হয় যে, দলের অথবা দলের কর্মতৎপরতার প্রতি তার আগ্রহ-উৎসাহ বর্তমান নেই এবং দল কর্তৃক আহূত ক্রমাগত কয়েকটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় থেকে অনুপস্থিত থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্পষ্ট ধারণা করা হতো যে, ইসলামের প্রতি লোকটির মনে কোনোই আগ্রহ-উৎসাহ আর অবশিষ্ট নেই।

আর যদি কেউ পর পর কয়েকদিন নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকতো তাহলে এ কথা অকাট্যরূপে প্রমাণ হয়ে যেতো যে, ঐ লোকটি আর মুসলিম মিল্লাতে নেই- সে মুসলমান নয়। এ কারণেই সে যুগের পরিচিত ও বিখ্যাত এবং কট্টর মুনাফিকদেরকেও যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য মসজিদে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হতে হতো।

কারণ, জামাআতে নামায আদায় ব্যতীত তারা মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্গত থাকতে পারতো না এবং মুসলিম সমাজ সংগঠনের একজন হিসাবে গণ্য করা হবে না- এ কথা তাদের চেতনায় শাণিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে জামাআতে নামায আদায় করা অথবা বাড়িতে একাকী নামায আদায় করা কোনোটিই নয়- নামায আদায় না করলেও মুসলমান থাকা যাবে। এই চিন্তা ও

www.pathagar.com

বিশ্বাস মানুষের ভেতরে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। কারণ নামায আদায় করে না এবং সার্বিক আচার-আচরণ দিয়ে এ কথা প্রমাণও করে যে, সে ইসলামী জীবন বিধান পছন্দ করে না। এসব কিছু করেও উক্ত ব্যক্তি যখন দেখছে, তার যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখনই একশ্রেণীর আলেম তার প্রয়োজনে উৎসাহভরে সাড়া দিচ্ছে– সুতরাং সে নামায আদায় না করে এবং ইসলামী জীবন বিধানের বিপরীত আদর্শ অনুসরণ করেও মুসলমানই আছে। সে যে মুসলমান তার প্রমাণ তো এটাই যে, কোরআন-সুন্নাহ্য় অভিজ্ঞ আলেমগণ তার ডাকে সাড়া দেয়, তাকে সহযোগিতা করে।

এভাবে করে পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন একশ্রেণীর মুসলমানদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নামায আদায় না করে ও ইসলামী জীবন বিধানের সাথে বিরোধিতা করেও মুসলমান থাকা যায়, অনুরূপভাবে তাদের অনুকূলে একশ্রেণীর আলেম নামধারী লোকদের আচরণও পাশ্চাত্যের সৃষ্টি করা ভ্রান্ত ধারণাকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করেছে যে, নামায আদায় না করেও মুসলমান থাকা যায়।

কারণ ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শে বিশ্বাস নামধারী মুসলিম লোকগুলো যখন দেখছে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা গালি দিচ্ছে, ইসলামকে বিদ্রূপ করে কবিতা-সাহিত্য রচনা করছে, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করছে, রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের বিপরীত মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাণপাত করছে, সুযোগ পেলেই হক্কানী আলেম-ওলামাদের ধরে দলে দলে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করছে, তাদের ওপরে নির্যাতন করছে, মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করছে, মাদ্রাসা বন্ধ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে, মুসলিম নারীদেরকে পর্দাহীন হতে বাধ্য করছে।

এত কিছুর পরও ঐ লোক যখন তাদের প্রয়োজনে আলেমদেরকে ডাকছে, তখন একশ্রেণীর আলেম তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে, দলে দলে দাড়ি-টুপিওয়ালাদেরকে তাদের মিছিল-মিটিংয়ে উপস্থিত করাচ্ছে, এসবই তো তাদের মুসলমান থাকার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ। তারা যদি মুসলমান না হতো, তাহলে তাদের ধারে কাছে কেনো আলেম ঘেষতো না, কেনো টুপিওয়ালাকে তাদের মিছিল-মিটিংয়ে দেখা যেতো না। কেনো পীর সাহেবও তাদের তৎপরতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো না।

অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিজেকে কেনো ব্যক্তি ইসলামের কেনো একটি ক্ষুদ্র বিধানের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার পরও নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবি করবে– এ কথা সে সমাজে কল্পনাও করা যেতো না। সে যুগে একজন মুসলমানের সাথে একজন ইয়াহুদীর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ দেখা দিলো। বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি সার্বিক অবস্থা জেনে ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিলেন।

আল্লাহর রাসূলের দেয়া রায়ে মুসলিম ব্যক্তিটি সন্তুষ্ট হতে না পেরে সে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দ্বারস্থ হয়ে জানালো, 'আমি একজন মুসলমান, নামায আদায় করি, জিহাদেও যোগ দেই, রায়টা তো আমার পক্ষে আসা উচিত ছিলো। অথচ নবী করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুতরাং আপনি বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করে দিন।' এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রোষকষায়িত লোচনে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তের সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে, তাদের বিচার হলো এই।' কথা শেষ করেই তিনি তরবারীর আঘাতে লোকটিকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন- এ কথা শোনার পরে চারদিকে একটি গুন উঠেছিলো। আল্লাহর রাসূলও বিব্রতবোধ করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ওমরের কাজের পক্ষে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো। বলা হলো, 'আপনার প্রভুর শপথ! আপনার সিদ্ধান্তের সাথে যারা দ্বিমত পোষণ করে তারা মুমিন নয়।'

সুতরাং হযরত ওমর যে কাজ করেছেন, সঠিক কাজ করেছেন। অথচ বর্তমানে কাফিরদের পক্ষ থেকে নয়- নামধারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বদম্ভে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'কোরআন সুন্নাহর আইন-কানুন দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হবে না।' এ কথা যিনি বলছেন, তিনিও অবলীলাক্রমে নিজেকে মুসলমান হিসাবেই মুসলিম সমাজের একজন ভাবছেন। একশ্রেণীর আলেম নামের লোকজন তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৯৬ সনের পরে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হলো। সে সময় আমিও জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ছিলাম। সংসদে আমি মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিল উত্থাপন করেছিলাম। মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করা যায় কিনা, তা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি দেশের বিভিন্ন বিভাগের কাছে মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলো। তারা নানা ধরনের অজুহাত দেখিয়ে মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিপক্ষে মতামত পেশ করলো।

যেদিন কমিটির মিটিং হলো, সেই কমিটিতে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিচালক-যার নামের পূর্বে 'মাওলানা' উপাধি ছিলো- তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আমি ধারণা করেছিলাম, সবাই যখন এই মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিরুদ্ধে কথা বলছে, মাওলানা সাহেব অন্তত এই বিলের পক্ষে কথা বলবেন। কিন্তু আমি অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, উক্ত মাওলানা সাহেব আল্লাহর গোলামী করেন না- গোলামী করেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের। তিনি মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন, শুধু তাই নয়- বাংলাদেশের সংবিধানে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার কথা বলা হয়েছে' উক্ত মাওলানা সাহেব সংবিধানে উল্লেখিত এই কথাটি বাদ দেয়ার পক্ষেও জোরালো কণ্ঠে বক্তব্য রাখলেন।

আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেও এসব লোকজন নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করে এবং তাদের দাবির অনুকূলে বর্তমান মুসলিম সমাজের একশ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে সাড়াও পায়। অথচ সে যুগে আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে কোনো শব্দ উচ্চারণ করার দূরে থাক- মুনাফিকরা মসজিদে এসে জামাআতে নামায আদায় করতে বাধ্য হতো। ঈমানদারদের নামাযে উপস্থিত হওয়া আর মুনাফিকদের নামাযে আসার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য

www.pathagar.com

পরিলক্ষিত হতো। ঈমানদাররা বিশেষ আনন্দ-উল্লাসের সাথে মসজিদে উপস্থিত হতো বা সময়ের পূর্বেই মসজিদে আসতো। নামায আদায় শেষ করেও তারা মসজিদে অবস্থান করতো। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এ কথা প্রমাণ হতো যে, তাঁরা নামাযের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহশীল।

কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা ছিলো ঈমানদারদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আযান শোনা মাত্র তাদের শরীরে যেনো এলার্জি সৃষ্টি হতো। তাদের চেহারা ও আচরণে এক মহাবিরক্তি যেনো ঝরে পড়তো। একান্ত অনিচ্ছাভরে তারা মসজিদে উপস্থিত হতো, পা দুটো যেনো মসজিদের দিকে আসতে চায় না, এমন উৎসাহহীন ভঙ্গিতে হেঁটে আসতো। নামাযের জামাআত শেষ হবার সাথে সাথে তারা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ লোকের মতো ছিট্‌কে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতো। এভাবে মুনাফিকদের প্রত্যেকটি আচার-আচরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হতো যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম– নামাযের ব্যাপারে তারা মোটেও আগ্রহী নয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর গোলামী করতে ইচ্ছুক নয়। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا–

এরা যখন নামাযের জন্য চলতে শুরু করে তখন শুধু লোক দেখানোর জন্য চোখ-মুখ কাচুমাচু করে চলতে থাকে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা-১৪২)

সে যুগের মুনাফিকদের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে অঙ্কন করেছেন–

وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ–

তারা নামাযের জন্য আসে বটে, কিন্তু আসে একান্ত অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর আল্লাহর পথে তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে বটে; কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে। (সূরা তওবা-৫৪)

পক্ষান্তরে বর্তমান কালের মুসলিম নামধারী বেনামাযীদের লোকদের আচরণ সে যুগের মুনাফিকদের তুলনায় অধিক বিস্ময়কর। সে যুগে আযান শোনার সাথে সাথে মুনাফিকদের গোটা অবয়বে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতো এবং তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মসজিদে উপস্থিত হতো। বর্তমান কালের একশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে আযান শোনার পরে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তারা বিরক্তিও প্রকাশ করে না অথবা নামাযেও উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাদের কোনো চেতনাই নেই।

একটি পশু অথবা কাফির ব্যক্তি আযান শোনার পরে পূর্বে যে কাজ করছিলো তাই যেমন করতে থাকে, এ যুগের ঐ লোকগুলোও তাই করতে থাকে– যারা নামায আদায় না করেও নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে। কাফির ব্যক্তির কানে আযান প্রবেশ করার পরে তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না এটাই স্বাভাবিক। সে যে কাজে ব্যস্ত ছিলো সেই

www.pathagar.com

কাজেই মগ্ন থাকবে। একটি পশু যা করছিলো, আযান শোনার পরেও তাই করতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেকে যে ব্যক্তি মুসলমান বলে দাবি করে, আযান শোনার পরে তার মধ্যে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির সাথে কাফির আর পশুর কি পার্থক্য রইলো?

নামাযই হলো মুসলমানদের প্রাণশক্তি, মুসলমানদের সকল কাজে এই নামাযই তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে অন্য কারো নয়– একমাত্র মহান আল্লাহর গোলাম এবং সেই আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রত্যেকটি গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করছেন, সে যার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি নামায আদায়ের মাধ্যমেই এ কথার প্রমাণ পেশ করে যে, সে নিজে যেমন আল্লাহ তা'য়ালার গোলামী করতে আগ্রহী অনুরূপভাবে অন্য সকলেও যেনো শয়তানের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে আল্লাহর গোলামী করার মাধ্যমে মুক্তি ও কল্যাণের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়, এ কারণেই সে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করছে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হবে নামাযের। বান্দাহ্ যদি সন্তোষজনকভাবে নামাযের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে অন্যান্য আমলেও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর সে যদি নামাযের হিসাব সন্তোষজনকভাবে দিতে না পারে তাহলে তার অন্যান্য আমলও খারাপ হবে। (তাবরাণী)

ইমাম তিরমিযী কিতাবুল ঈমানে সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন– হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হলো নামায।

যদি এই হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌছে যাবে। আর যদি এই হিসাবটিতে গলদ দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরজগুলোর মধ্যে কিছুটা কম দেখা যায় তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখো আমার বান্দার কিছু নফলও আছে নাকি। তার সাহায্যে তার ফরজগুলোর কমতি পূরণ করে নাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই করা হবে। (তিরমিযী)

নামায আদায় না করার অর্থই হলো, সেই ব্যক্তি তার আপন মনিব আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করছে। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করার অর্থই হলো স্পষ্ট শিরক করা এবং শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শিরককে ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আখিরাতের ময়দানে যার আমলনামায় সামান্যতম শিরক দেখা যাবে, তার আমলনামা ঘৃণাভরে ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

এ জন্যই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষের এবং শির্‌ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা। (বোখারী-মুসলিম)

হাদীসে নামায ত্যাগ করাকে কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম নামায ব্যতীত তাঁদের আমলের মধ্যে থেকে অন্য কিছু ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। আখিরাতের ময়দানে জাহান্নামীদেরকে যখন প্রশ্ন করা হবে-

فِىْ جَنّٰتٍ-يَّتَسَاءَلُوْنَ-عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ-مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ-قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ-

কোন্ জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গিয়েছে? তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। (সূরা মুদাস্‌সির-৪২-৪৩)

উল্লেখিত আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হলো, যেসব লোক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর নাজিল করা কিতাবের যাবতীয় বিধান মেনে নিয়েছে, তাদের প্রধান কর্তব্যই হলো নামায আদায় করা। এ জন্যই জাহান্নামীরা বলবে যে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। অর্থাৎ আল্লাহর গোলামী করবো, এ কথার স্বীকৃতিই হলো নামায আদায় করা। সুতরাং আমরা নামায আদায় করিনি তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনায় ইচ্ছুক ছিলাম না।

এখানে এ কথা স্পষ্ট মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈমান গ্রহণ না করে কোনো ব্যক্তিই যথারীতি নামায আদায় করতে পারে না। নামায আদায় করার জন্য প্রথম ও পূর্ব শর্ত হলো ঈমান। এ কারণে নামায আদায়কারীদের মধ্যে শামিল হওয়ার অনিবার্য পরিণতি ঈমানদারদের দলে শামিল হওয়া তথা এক সমাজ-সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকা, সমাজ ও দেশের বুকে নামাযের শিক্ষা তথা আল্লাহর বিধান ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের গুণাবলী ও নামায

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম মিল্লাতের প্রতি নামায আদায় ফরজ করেছেন এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তারা যেন পৃথিবীর মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে হলে ক্ষমতা ও শক্তি অবশ্যই প্রয়োজন। শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র দুর্বল কোনো ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের আদেশ অবশ্যই পালন করবে না। দুর্বল যখন শক্তিমান-ক্ষমতাধরের সামনে কোনো কথা বলে, তখন তা কাকুতি-মিনতি বা অনুরোধের পর্যায়ে পড়ে। আর পৃথিবীতে অনুরোধ, উপদেশ বা কাকুতি-মিনতি করে অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা যায়নি।

সারা পৃথিবীর প্রায় ছয়শত কোটি মানুষ ইরাক আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ক্ষমতাশালী আমেরিকার প্রতি অনুরোধ জানালো, প্রতিবাদ করলো কিন্তু আমেরিকাকে বিরত করা গেল না। যিনি আদেশ করবেন, আদেশ না মানলে আদেশদাতার যদি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে আদেশ কখনো পালিত হবে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা নামায আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে সেই শক্তি অর্জন করার ব্যবস্থা করেছেন, যে শক্তি অর্জন করলে তাদের দেয়া আদেশ পালিত হবে। মুসলমানদেরকে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভব, এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা-সহকারে আগমন করেছিলেন এবং যা গ্রহণ করে তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই জীবন ব্যবস্থার প্রতি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানাবে। 'ঈমান এনেছি, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করছি, তসবীহ্ পাঠ করছি, কোরআন তিলাওয়াত করছি তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছি' এইটুকুর মধ্যেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

যে মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করা হচ্ছে, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহর দেয়া যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তা নিজেরা যেমন অনুসরণ করবে এবং গোটা মানবমন্ডলীকে সেই মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। যে সত্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা হয়েছে সেই সত্যের সাক্ষী হিসাবে গোটা পৃথিবীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ মহাসত্যের সাক্ষী হিসাবে সারা পৃথিবীর মানবমন্ডলীর সামনে নিজেকে পেশ করতে হবে এবং এটাই হলো মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

www.pathagar.com

এই দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্বাচিত করেছেন। মুসলিম মিল্লাতের প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে 'মধ্যমপন্থী দল' হিসাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا–

আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী দল বানিয়েছি যেন তোমরা পৃথিবীর লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। (সূরা বাকারা-১৪৩)

বিশ্ব-ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাবের কারণই হলো এটা যে, তারা পৃথিবীর মানুষকে মহাসত্যের দিকে দিকে আহ্বান জানাবে। এই আয়াতে 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো, 'মধ্যপন্থী উম্মত'। কোরআনে ব্যবহৃত 'উম্মতে ওয়াসাত' শব্দটির অর্থ এতটাই ব্যাপক অর্থবোধক যে, পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, যে ভাষার মাধ্যমে এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য এবং ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই উম্মতে ওয়াসাতা শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীর শুরু থেকে তাঁদের অনুরূপ সর্বোন্নত গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো মানব গোষ্ঠী ইতোপূর্বে তৈরী হয়েছিল, না কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তৈরী হবে। অর্থাৎ এমন একটি মানব গোষ্ঠী, যারা সর্বোন্নত যাবতীয় গুণ বিভূষিত। সুবিচার, সততা, ন্যায়-নীতি এবং যাবতীয় বিষয়ে যারা মধ্যমপন্থা অনুসরণে অভ্যস্থ। তাঁরাই ছিলেন গোটা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক, উন্নতি-অগ্রগতির পরিচালক ও অগ্রনায়ক, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, মানবাধিকার, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির পথনির্দেশনা দানকারী। অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার যাদের জীবন-অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিলো।

অন্যায় বা জুলুমমূলক সম্পর্ক তাদের কারো সাথে ছিল না বরং সেস্থান দল করেছিল ন্যায় ও ইনসাফ। গোটা জগতের সামনে যারা ছিল সর্বব্যাপক ও সার্বিক দিক দিয়ে কল্যাণ, শুভ ও সুন্দরের প্রতীক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য বা দ্বীনে হক অবতীর্ণ করেছেন, সেই মহাসত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরা এবং সেভাবেই তাঁরা সত্যের সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের ভেতরে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবমন্ডলীকেই 'উম্মতে ওয়াসাতা' হিসাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছিলো এ কারণে যে, তাঁরা যথাযথভাবে বুঝে নামায আদায় করতেন।

মুসলিম মিল্লাত মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে তথা যাবতীয় অন্যায়-অসৎ কাজের মূলোৎপাটন করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালোকাজে রত করানো যায়নি। অথবা ভালো কাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো মাওলানা বা পীর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে পীর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই ঈমানদার আমলে সালেহ্‌কারী লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন।

পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না

www.pathagar.com

পারলে এই দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া-নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎপরতা চালাতে হবে। মহাসত্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে বের করে নেয়া হয়েছে-অর্থাৎ এই কাজের জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সূরা ইমরাণের ১১০ আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

পৃথিবীতে সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে চলো। (সূরা ইমরান)

যাকাত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ

আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে মুহ্সিনীনদের দ্বিতীয় যে গুণা-বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তা হলো তারা যাকাত আদায় করে। যদিও নামাযের পরপরই রোজার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু কোরআনুল কারীমে নামাযের পরে রোজার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি-উল্লেখ করা হয়েছে যাকাতের কথা। এ থেকে অনুভব করা যায় যে, যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নামায এবং যাকাত হলো ইসলামের প্রধান দুটো স্তম্ভ। এই স্তম্ভ যদি কোনো কারণে দুর্বল হয়ে যায় তাহলে গোটা ইমারত বিধ্বস্ত হয়ে পড়া সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় মাত্র।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফত আমলে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারী লোকদেরকে কাফির মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ সেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী ছিলো এবং নামাযও আদায় করতো। এ জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ্ করা বৈধ কিনা এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতে যারা যাকাত দিতো, তারা যদি আজ উট বাঁধার একটি রশিও যাকাত হিসাবে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো।' পরিশেষে সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন যে, যারা যাকাত দেবে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য।

এই ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে যাকাত শব্দটি সর্বজন-পরিচিত শব্দ হিসাবে ৩০ টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ টি আয়াতে নামাযের সাথেই একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা মুমিনীনে মুমিনীনদের গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে দ্বিতীয় আয়াতে নামাযের কথা বলা হয়েছে এবং

www.pathagar.com

চতুর্থ আয়াতে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কোরআনের ৮২ টি আয়াতে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকগণ মনে করেন যে, এটা সঠিক নয়। যে ৩০ টি আয়াতে যাকাতের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ৮ টি আয়াত হলো মক্কী সূরার আর অবশিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী সূরায় রয়েছে।

আরবী অভিধান লিসানুল আরব গ্রন্থে যাকাত শব্দের অর্থ করা হয়েছে, পবিত্রতা, ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা, প্রবৃদ্ধি, বরকত, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা ইত্যাদি। বিষয়টি এভাবে স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, কৃষিতে ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ যে জিনিস বৃদ্ধি লাভ করে তাই যাকাত। আর কৃষিতে তখনই ফসল বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, যখন সে ফসল আবর্জনামুক্ত হয়ে থাকে। আবর্জনাকে যদি অপবিত্রতার অর্থে ধরা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, কৃষিতে ফসল তখনই বৃদ্ধি পেয়েছে যখন তা আবর্জনামুক্ত হয়েছে তথা অপবিত্রতামুক্ত হয়েছে। এ কারণে যাকাত শব্দটিতে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে।

কোরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি মুসলিম সমাজে পরিচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগ থেকেই। কারণ যাকাত শব্দটির সাথে আরবের লোকজন বহু পূর্বথেকেই পরিচিত ছিলো এ কারণে যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মতের ওপরই যাকাত আদায় করা ফরজ ছিলো। ইসলামী শরীয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বেও এই শব্দটি সর্বজন পরিচিত ছিলো ও জাহিলিয়াতের যুগের কাব্য-সাহিত্যে তা ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনেক সময় দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাকাত শব্দটি এসেছে 'যাকা' শব্দ থেকে এবং এর অর্থ হলো, যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করে ও পরিমাণে বেশী হয়। কেউ যাকাত দিয়েছে, এ কথার অর্থ হলো– সে সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। কোনো ব্যক্তির গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি 'যাকা' বা যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাহলে বুঝতে হবে, লোকটির মধ্যে শুভ দিক মাত্রা অতিক্রম করেছে বা তার মধ্যে কল্যাণের আধিক্য রয়েছে অর্থাৎ লোকটি চরম মাত্রার কল্যাণসম্পন্ন ব্যক্তি।

ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় ধন-সম্পদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরজকৃত অংশ বুঝানোর জন্য। যেমন পাবার যোগ্য-অধিকারী ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ দেয়াকেও যাকাত বলা হয়। ধন-সম্পদ থেকে এই নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে যাকাত এ জন্য বলা হয় যে, যে ধন-সম্পদ থেকে তা বের করা হলো, এ কারণে সে ধন-সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষেই তার মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করে, বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্ত থাকে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেছেন, 'যাকাত-সাদকা দানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করে।' ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা শুধুমাত্র ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয় না, যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা পর্যন্ত তা সংক্রমিত হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

www.pathagar.com

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ-

(হে নবী) তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ করো, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিচ্ছন্ন (প্রবৃদ্ধিমান) করবে। (সূরা তাওবা-১০৩)

গবেষকগণ উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, যাকাত দরিদ্রকেও প্রবৃদ্ধি দান করে। দরিদ্রের জন্য বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি ব্যক্ত করে। সেই সাথে ধনশালী ব্যক্তির মন-মানসিকতায় ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি সাধন করে।

আরবী ভাষায় যাকাত শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থ হলো, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, বিকাশ সাধন বা প্রবৃদ্ধি লাভ করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুর বিকাশ সাধনে বা উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস বাধার সৃষ্টি করে বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূরিভূত করা এবং সেই জিনিসের মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা।

এই দুটো অর্থের সমন্বয়ে যাকাত শব্দের পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয়। তারপর যাকাত শব্দটি যখন ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হয় তখন এরও দুটো অর্থ প্রকাশ করা হয়। প্রথম অর্থ হলো, এমন ধন-সম্পদ– যে ধন-সম্পদ পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, পবিত্র বা পরিশুদ্ধ করার মূল কর্মটি। সূরা মুমিনীনে মুমিনদের ৯ টি গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ-

যারা যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে। (সূরা মুমিনীন-৪)

উল্লেখিত আয়াতে যদি বলা হতো, 'ইউতুনায্ যাকাতা' তাহলে এর অর্থ দাঁড়াতো– 'তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদের একটি অংশ দেয়।' এভাবে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ দেবার মধ্যেই যাকাত দেয়ার বিষয়টি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে 'লিয্যাকাতি ফায়িলুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এর অর্থ হলো, তারা পরিশুদ্ধ করার কর্ম করে এবং এই অবস্থায় বিষয়টি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না– বরং আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি, চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধি, কর্মের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি ও মন, মানসিকতার পরিশুদ্ধি ইত্যাদি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত 'লিয্যাকাতি ফায়িলুন' শব্দের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, 'লিয্যাকাতি ফায়িলুন' শব্দের আরো অর্থ হলো, তা শুধুমাত্র নিজের জীবনের পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং নিজের চারদিকের পরিচিত সকলের জীবনের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

অর্থাৎ যারা যাকাত দেয় তারা হলো সেইসব লোক– যারা নিজেরাই শুধু পবিত্রতা অর্জন করে না বরং তারা যে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করে, সে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচ্ছন্ন করার কাজও করে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা হলো পবিত্রতামূলক কাজে আত্মনিয়োগকৃত লোকজন। এরা নিজেরাও পবিত্রতা অর্জন করে এবং অপরকেও পবিত্র করার লক্ষ্যে কাজ করে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে যেমন মৌল মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে এবং পরিপার্শ্বিক পরিবেশকেও তাদের কাঙ্খিত ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর দান। আল্লাহ তা'য়ালা যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন, আবার কাউকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করেও তাঁর সেই বান্দাকে তিনি পরীক্ষা করেন। যাকে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ একান্ত অনুগ্রহ করে দান করেছেন, সে যদি সেই অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে বিশেষ একটি অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, তার পক্ষে এই পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করা যেমন সম্ভব নয়– অনুরূপভাবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যে আর্থিক ত্যাগ ও কোরবানী দেয়া প্রয়োজন, সে প্রয়োজনও তার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়।

এই কারণেই যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া অতিরিক্ত ধন-সম্পদ তাঁর অভাবী বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়, সেই ব্যক্তির যাবতীয় ধন-সম্পদ যেমন আবর্জনাযুক্ত ফসলের ন্যায় তথা অপবিত্র, অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির মন-মানসিকতাও অকৃতজ্ঞতা ও অপবিত্রতা থেকে কোনোক্রমেই মুক্ত নয়।

যাকাত কি ও কেন

যাকাতের তাৎপর্য শুধু এটুকুই নয় যে, তা সমাজের গরীব অনাথদের খাওয়া-পরার একটি ব্যবস্থা মাত্র, বরং তা নামাযের পরেই দ্বিতীয় গুরত্বপূর্ণ ইবাদত ও ইসলামের একটি অতি প্রয়োজনীয় স্তম্ভ, যা ছাড়া মানুষের দ্বীনদারী ও ঈমানের চিন্তাই করা যায় না।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষ যখন খুশি হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তখন মানুষের অন্তরে এক আত্মতৃপ্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। বস্তুপ্রীতি ও পার্থিব মোহ থেকে অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। আত্মার পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে তাতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যাকাত দেয়ার মাধ্যমে দাতার অন্তরে যে আল্লাহর প্রতি প্রেম বর্তমান আছে তা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি তা বান্দার মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক মহান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা।

এসব তত্ত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোরআনে যাকাত বুঝানোর জন্য 'সাদকা' ও 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ' বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাদকা' 'সিদক' শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ খালেছ ও সত্য। অর্থাৎ সাদকা এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সাদকার মধ্যে খুলুছিয়াত ও সত্য প্রিয়তা বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য যে, সাদকা মানুষের মধ্যে সত্যপ্রীতি ও খুলুছিয়াতের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে।

www.pathagar.com

'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা। এ ভাষা যাকাতের আসল তাৎপর্য পরিষ্কার করে দেয়। কোরআন যেহেতু মূল তাৎপর্যের দিকেই লক্ষ্য আরোপ করে থাকে যাকাত সম্পর্কে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ একই অর্থ জ্ঞাপনার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করে তা যেমন যাকাত, তেমনি সাদকা এবং ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ ও মূল দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ফিকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে যাকাত ও সাদকা শব্দে পার্থক্য বিদ্যমান। ফিকাহ্-এর পরিভাষায় যাকাত বলে ঐ সাদকাকে, যা ব্যয় করা ফরজ। ধনী মুসলমানদের যে পরিমাণ ব্যয় না করলে তার ঈমান ও দ্বীনদারী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না তা যাকাত। এ যাকাত ছাড়া মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা কিছু ব্যয় করে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয় ও কাম্য এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন এবং দ্বীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অপরিহার্য করণীয়, কিন্তু ফরজ নয়-তাকে সাদকা বলে।

কোরআন ও হাদীসে এ সাদকা দানের জন্য মুসলমানদের বিশেষভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বান্দা ক্ষমা লাভ করে পরিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। পবিত্র কোরআনে প্রায় স্থানেই নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ করে দ্বীনের মধ্যে যাকাতের গুরুত্ব পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং বান্দার ঈমানের পরেই ঐ নামায ও যাকাতের দাবী পেশ করে এ দুটো স্তম্ভই যেন পূর্ণ দ্বীন এ তত্ত্ব বুঝানোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সকল বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগের সম্পর্ক আল্লাহর হকের সাথে এবং অপর ভাগের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহর দাসত্ব করতে থাকা ও বান্দার হকসমূহ যথাযথ আদায় করেই মানুষকে পূর্ণ ঈমানদার হতে হয়। এ উভয় দিক যথাযথ ঠিক রাখার জন্য এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন কল্পে বান্দার প্রতি নামায ও যাকাত ফরজ করা হয়েছে। যারা যাকাত দেয় না কোরআন তাদেরকে মূল জ্ঞানে বঞ্চিত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছে।

যাকাত না দেয়াকে কুফরী ও শিরকী চরিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যাকাত বিমুখ লোকদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যাকাত যথাযথভাবে আদায় করাকে ঈমানের লক্ষণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ ধরনের ঈমানদার লোকদের জন্য ইহকালে শান্তি-স্বস্তি ও পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার ও পরকালে অতুলনীয় প্রতিদান, রহমত বরকত ও নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাতপ্রাপ্তির সুখবর শুনিয়েছে।

কোরআন থেকে হিদায়াতপ্রাপ্তি ও সঠিক পথনির্দেশনা লাভের শর্ত যাকাত প্রদানের ওপর নির্ভরশীল। সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ-فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

(এই কিতাব) পরহেযগার লোকদের জন্য পথপ্রদর্শনকারী, যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা আল বাকারা-২-৩)

যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে এরচেয়ে আর বড় কথা কি হতে পারে যে, পবিত্র কোরআন থেকে সঠিক পথনির্দেশনা লাভের অন্যতম শর্ত হলো যাকাত প্রদান করা। এ যাকাত প্রদান গুণটি অর্জন করা ব্যতীত কারো হিদায়াত লাভ হতে পারে না। সংকীর্ণমনা, কৃপণ, অর্থলিপ্সু ও সম্পদের গোলাম, যে নিজের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছুই ত্যাগ করতে রাজী নয় সে হিদায়াত লাভের যোগ্য নয়। বরং যে উদারমনা, দাতা অপরের হক প্রদানে মুক্তহস্ত এবং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ খুশী মনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয় করতে সক্ষম সে-ই হিদায়াত লাভে ধন্য হবার যোগ্য।

পৃথিবীতে মুসলিম জাতির উত্থান ও তাদেরকে 'মুসলিম' উপাধিতে ভূষিত করণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা নবীর অবর্তমানে মহাসত্যের সাক্ষ্য দানের ফরজ দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তারাও নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা অন্যদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেবে। এ গুরুদায়িত্বটি যথার্থভাবে পালন করার জন্যে তাদের জীবনে তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ অপরিহার্য আর তা হচ্ছে, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত ব্যবস্থা বহাল রাখা এবং আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা।

যাকাতের প্রাণশক্তি হচ্ছে মানুষ আল্লাহর সত্তাকে নিজের ভালোবাসার কেন্দ্রে পরিণত করে নেবে। তাঁর মোকাবেলায় সবকিছুর ভালোবাসা মন থেকে মুছে দেবে। আল্লাহর বান্দাদের হকসমূহ যথার্থ অর্থে সংরক্ষণ করবে এবং তাদের ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্যাগের প্রবণতা বজায় রাখবে। এ গুণাবলী আয়ত্ব করা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, যাকাত মানুষের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টির ব্যাপারে যোগ্যতা সৃষ্টি করে থাকে, তাকে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। সূরা হজ্জ-এর ৭৮ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ-

www.pathagar.com

আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, আর এই (কোরআনেও) তোমাদের এই নাম। যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ-الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَشِعُوْنَ-وَالَّذِيْنَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ-وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَعِلُوْنَ-

নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা অর্থহীন কাজ হতে দূরে থাকে। যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়। (সূরা আল মু'মিনুন-১-৪)

যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হওয়া মানে সে পবিত্রতা অর্জনের সব আমলের সার্বিক অনুসরণ করে। সে নিজের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর হক আদায় করে সম্পদকে পবিত্র করে নেয়। সাথে সাথে নিজের অন্তরকেও ধন-লিপ্সা এবং অন্যান্য কু-প্রবণতা হতে পবিত্র করে নেয়। এভাবে আত্মশুদ্ধির প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তার মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে তার সকল কার্যপ্রণালী ও জিন্দেগীই নিষ্কলুষ হয়ে যায়। যা তার পার্থিব সফলতার যেমন নিশ্চয়তা ঘোষনা করে তেমনি আল্লাহ তাঁর জান্নাতের জন্য তাকে কবুল করে নিয়েছেন তা ব্যক্ত করে।

যাকাত একটি ক্ষতিবিহীন ব্যবসা এবং এ ব্যবসায় লাভ কি পরিমাণ, তা এই পৃথিবীর জীবনে নির্ণয় করা কঠিন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ-لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ-

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরাপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী। (সূরা আল ফাতির-২৯-৩০)

দুনিয়ার সীমাবদ্ধ জীবনকাল ও তার সাজ-সরঞ্জামই মানুষের পূঁজি। কোরআন একে জান ও মাল অর্থে ব্যবহার করেছে। কাফির ব্যক্তি তার ঐ জান-মালের পুঁজি দুনিয়ার বৈষয়িক উন্নতির কাজে নিয়োজিত করে। পক্ষান্তরে ঈমানদার ব্যক্তি ঐ পুঁজিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী পুরস্কারপ্রাপ্তির কাজে নিয়োগ করেন। কোরআন এই ব্যবহার পদ্ধতিকে ব্যবসাকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করে বলে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী নে'মাতরাজিকেই

www.pathagar.com

সবকিছু মনে করে নিজের জান-মালের পুঁজি এর পেছনে ব্যয় করে সে এক বড় ধরনের লোকসানের ব্যবসা করে। সে তার মহামূল্যবান পুঁজিকে এমন নগণ্য, ধ্বংসশীল ও সীমাবদ্ধ উপকার লাভের পেছনে নিয়োগ করে যা চরম ভিত্তিহীন। যা মাত্র একবারই পাওয়া যায় এবং হারানোর পরে পুনর্বার আর পাওয়া যায় না।

কারণ এর সুযোগ কেবল একবারই আসে। অপরদিকে যে লোক তার এই মহামূল্যবান পুঁজিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ ও শান্তি লাভের কাজে নিয়োগ করেন, তিনি মূলতঃ এমন এক লাভজনক ব্যবসা করেন যা কখনো ধ্বংস হবে না, আর তা সবরকমের লোকসানের সংশয়-সন্দেহ হতে মুক্ত ও পবিত্র। নামায ও যাকাত ঐ জান-মালের ব্যাপক কোরবানীর প্রতিনিধিত্বশীল দুটি ইবাদাত অনুষ্ঠান। এ দুটো যথাযথভাবে পালন করা– একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জান-মালের পুঁজি লাভজনক ব্যবসায় নিয়োগ করে রেখেছেন।

মূলতঃ এ এমন ব্যবসা যার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যিনি মূল্য প্রদানে এমন উদার হস্ত যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। সূরা তাওবায় এ কথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। চিন্তা করে দেখার বিষয় যে, সীমাবদ্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত জান-মালের বিনিময়ে চিরস্থায়ী অসীম নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাতপ্রাপ্তি কত বড় লাভজনক সার্থক ব্যবসা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ-وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ-

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা-২৬১)

এ আয়াতে যাকাতের অগণিত প্রতিদানের বিষয়টি ঈমান উদ্রেককারী এক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা একটি মাত্র দানা যমীনে বপন করার পর তা থেকে কোটি কোটি দানা পেয়ে থাকি। ফলে আমাদের ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। চিন্তার বিষয়, যে আল্লাহ আমাদের একটি মাত্র দানাকে এ দুনিয়ায়ই কোটি কোটি দানায় বৃদ্ধি করে আমাদের ভাণ্ডার বার বার পরিপূর্ণ করে দেন, আখিরাতে পাবার আশায় তাঁর উদ্দেশ্য কেউ কিছু ব্যয় করলে তা তিনি অবশ্যই এর অগণিত প্রতিদানে দাতাকে ধন্য করবেন। আমরা যে পরিমাণ একাগ্রতা-নিষ্ঠতা ও গভীর আশা নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য তাঁরই পথে ব্যয় করবো, মহান আল্লাহ তার ভিত্তিতেই আমাদের আমলকে বাড়িয়ে এমন বড় ধরনের প্রতিফল দানে আমাদেরকে ধন্য করবেন, এই পার্থিব জগতে অবস্থান করে সেই প্রতিফল সম্পর্কে আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

www.pathagar.com

প্রকতপক্ষে যাকাত দেয়ার প্রকৃত পুরস্কার আমরা আখিরাতের অসীম জীবনেই লাভ করতে পারবো এবং আখিরাতে বিনিময় দেয়া হবে বলে, এই পার্থিব জীবনেও এর বরকত থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত হতে হবে না।

যাকাত-সাদকায় মানুষ নিজের পরিশ্রমলব্ধ ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। আর সুদ মানুষকে শোষণ করে সম্পদ পূঞ্জিভূত করে। দৃশ্যত সুদে সম্পদ বৃদ্ধি পায় আর দান-সাদকায় কমে যায় মনে হয়। কিন্তু কোরআন এর রহস্য উদঘাটন করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদে মূলত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে হ্রাস পায় এবং সাদকা বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যাকাত-সাদকা মানবতার ক্ষেত্রে রহমত বিশেষ, আর সুদ এক জঘন্যতম অভিশাপ। সুদ মানুষকে পাষাণ হৃদয়, স্বার্থপর, কৃপণ ও সঙ্কীর্ণমনা বানায়। সুদ মানুষের মধ্যে সব ধরনের অনাকাংখিত স্বভাব বিকাশের বাহক। বিপরীত পক্ষে যাকাত-সাদকা মানুষকে মহৎ, উদারমনা, দরদী ও সহানুভূতিশীল করে তোলে। তার মধ্যে প্রশংসনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। সূরা বাকারার ২৭৬ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ–

আল্লাহ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খায়রাতকে বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারা)

যে সমাজের লোকদের মধ্যে অনাকাংখিত স্বভাব-চরিত্রের বিকাশ ঘটে, ধন-সম্পদ কতিপয় স্বার্থপর, পাষাণাত্মা, অর্থ লিপ্সু ও কৃপণ লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়। সে সমাজ কখনো শান্তি ও উন্নতির দিকে এগুতে পারে না। অপরদিকে যে সমাজে ধন-সম্পদের উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা বর্তমান, যেখানে সম্পদ থেকে সমাজের সকলেই উপকৃত হবার সুযোগ পায়, যেখানে সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সকলের সমান, ফলে সকলে মিলে সেখানে গোটা সমাজের উন্নতিকল্পে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিতে নিজের মন-মগজ, যোগ্যতা প্রতিভা ও শ্রম কাজে লাগাতে পারে, সে সমাজ মানুষের কাঙ্খিত সুখ-স্বাচ্ছন্দে সমৃদ্ধ হয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়, সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় এটা কল্পনাও করা যায়।

কেননা, সম্পদের আমদানী রফতানীর গণ্ডী যত ব্যাপক ও প্রসারিত হয়, সম্পদ থেকে উপকৃত হবার ও একে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যত বেশি লোকেরা শ্রমশক্তি নিয়োগ করে ততই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا–فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ–وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ–

লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে-এ জন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাত দানকারীই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (সূরা আর রুম-৩৯)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যদি কোনো মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও সাদকা করে, আল্লাহ একে বৃদ্ধি করে পাহাড় সমান করে দেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ-وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (সূরা আল বাকারা-২৭৭)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ-

হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকা নিয়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করুন এবং (পূণ্যর পথে) তাদেরকে অগ্রসর করুন। (সূরা আত তাওবা-১০৩)

যাকাত দানের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাকাত ফরজ করেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের আত্মার সংশোধন করা। কৃপণতা, লোভ-লালসা এবং দুনিয়া পূজার মত সকল খারাপ প্রবণতা থেকে আত্মাকে পবিত্র করে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা, যাতে তার আত্মিক উন্নতির পথ সহজতর হয়। যাকাতের এই মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى-وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى-

আর যে পরম মুত্তাকী নাফসের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে (জাহান্নামের আগুন) থেকে দূরে রাখা হবে। (সূরা আল লাইল)

যাকাতের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের আত্মার সংশোধন সংস্কার সাধন। যাকাত ব্যবস্থা মূলতঃ মানুষের আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের এক মোক্ষম হাতিয়ার। সমস্ত অপকর্মের উৎসমূল হচ্ছে, মানুষের দুনিয়া পূজা প্রবণতা। আর এই দুনিয়ার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করার সবচেয়ে মারাত্মক লোভনীয় ও শক্তিশালী বস্তু হচ্ছে ঐ ধন-দৌলত। এ জন্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য এই ধন-দৌলতকে ফেতনা বলে ঘোষণা করেছেন।

যাকাত ব্যবস্থা সম্পদ পূজার সবরকমের নিকৃষ্ট প্রবণতা হতে আত্মাকে পবিত্র করে সেখানে আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং হক ও পূণ্যের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। যাকাত কেবল দুনিয়া পূজার মোহ মুক্তিই সাধন করে না, সাথে সাথে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করার আগ্রহ-উদ্যম মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করে থাকে। কেননা,

www.pathagar.com

যাকাতদাতার কামনাই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, যার জন্য সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী অপরিহার্য, যাতে সে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়। অপরদিকে যাকাত আদায় না করলে সূরা তাওবার ৩৪-৩৫ আয়াতে কঠোর শাস্তির সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ-هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না। একদিন অবশ্যই এমন হবে যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে এর দ্বারাই সে লোকদের কপাল ও পার্শ্বদেশে এবং পিঠে চিহ্ন দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এই হচ্ছে সে সম্পদ যা তোমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চিত করছিলে। নাও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভয়াবহ আযাবের চিত্র এভাবে অংকিত করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য মজুদ থাকবে এবং তা হতে আল্লাহর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের সীল প্রস্তুত করা হবে এবং সীলগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ঐ ব্যক্তির কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। আখিরাতের ময়দানে এভাবে বার বার করা হবে।

বোখারী হাদীসে অন্য এক বর্ণনায় আরো ভয়ংকর এক আযাবের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর সে এর যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ এক বিষধর সর্পে পরিণত হবে। যার মস্তকে দুটি কালো তিলক থাকবে। তা ঐ ব্যক্তির গলদেশ বেষ্টন করে গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে যে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন ভাণ্ডার।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল ইমরানের ১৮০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন-

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ-بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ-سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তারপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হবে। (সূরা ইমরান)

www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার যে, পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত পথে যাকাত আদায় করলেই কেবল আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য, পুণ্য ও পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহর পথে খরচ করার সময় বান্দার নিজের এ বিষয় অবশ্যই আত্মসমালোচনা করে দেখা দরকার যে এর মাধ্যমে তার মূল লক্ষ্য আত্মশুদ্ধির বিকাশ সার্থকভাবে হচ্ছে কি না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا تُنْفِقُوْنَ الاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ–

তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। (সূরা আল বাকারা-২৭২)

যাকাত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়া হচ্ছে এ বিষয়টির ওপর দাতার গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য যেন এর পেছনে ক্রিয়াশীল না হয়। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশী করার তীব্র বাসনা নিয়ে নিজের পছন্দনীয় সম্পদ খুশী মনে কোরবানী করেন তার এ নেক আমলের উদাহরণ পবিত্র কোরআনে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوٰلَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ–فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ–وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এব নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টি হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (সূরা বাকারা-২৬৫)

আয়াতে টিলার ওপরে বাগান হওয়ার দ্বারা এমন যমীন বুঝানো হয়েছে, যাতে ফসল উৎপন্নের প্রয়োজনীয় উর্বরা শক্তি যথাযথ বর্তমান রয়েছে। দান-সাদকার ব্যাপারে তেমনি মনরূপ যমীনে ইখলাসরূপ উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকা দরকার। প্রবল বৃষ্টিপাতের দ্বারা ঐ ইখলাসের একনিষ্ঠতা ও উৎকর্ষতা বুঝানো হয়েছে। আর সামান্য বৃষ্টিপাতের দ্বারা এর হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উর্বর যমীনের বাগ-বাগিচায় যেমন বৃষ্টিপাত কম বেশি যাই হোক ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে, তেমনি মনরূপ যমীনে পূণ্যরূপ ফসলের অবস্থা। পূণ্য কাজে মনে ইখলাস বর্তমান থাকলে কমবেশি সাওয়াব সব সময় হতেই থাকবে। আল্লাহ এর মান অনুযায়ী বিনিময় দাতাকে যথারীতি দিতে থাকবেন। এ জন্য যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে আত্মগর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হলো–

www.pathagar.com

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ-وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ-

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খায়রাত করো তবে তা কতইনা উত্তম, আর যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। (সূরা আল বাকারা-২৭১)

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى-كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

হে ঈমানদারগণ। তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত সে ব্যক্তির মত বরবাদ করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। (সূরা আল বাকারা-২৬৪)

মানুষের নেক কাজের গর্ব ও প্রদর্শনী এমন এক নিকৃষ্টতম স্বভাব যা তার অতি উন্নতমানের নেক আমলগুলো নষ্ট করে দেয়। অন্য কথায় কোনো নেক আমল গর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা ও প্রচারমুক্ত না হলে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হলে, আল্লাহর নিকটে তা নেককাজরূপে বিবেচিত হয় না। আল্লাহর দরবারে ঐ আমলের কোনো কানাকড়িও মূল্য নেই, যা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করা হয়। বিবেকের বিচারেও তা যুক্তিযুক্ত যে, আমল যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হয় তখন এর প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে মানুষের নিয়তের ইখলাস ও পরিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে– কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন যে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন, তাদের মধ্যে একশ্রেণী হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ দান-সাদকা করেছেন যে, তাদের ডান হাতের কৃত দান-সাদকা বাম হাত পর্যন্ত জানতে পারেনি। (বোখারী)

এখানে মনে রাখা দরকার যে, ফরজ যাকাত প্রকাশ্যে প্রদান করা উত্তম; যাতে সমাজে আল্লাহর ফরজ আমলের চর্চা হয় এবং অপরাপর যাকাত দাতারা অনুপ্রাণিত হন। পক্ষান্তরে নফল সাদকা-খায়রাত গোপনে প্রদান করা উত্তম যা দাতার আত্মশুদ্ধির পক্ষে বেশি সহায়ক হয়।

তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাদের একজনকে প্রশ্ন করবেন, 'হে বান্দা, দুনিয়ায় আমি তোমাকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছিলাম। বলো, তুমি সে ধন-সম্পদ কি কাজে ব্যবহার করেছো? জবাবে ঐ বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আমিতো সে ধন-সম্পদ দিন-রাত তোমার পথে অবাধে ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। ফেরেশতাগণও আল্লাহর স্বপক্ষে

www.pathagar.com

ঘোষণা করবেন যে, তুমি মিথ্যা বলছো। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, অন্য মানুষ তোমাকে দাতা বলবে এই উদ্দেশ্যে তুমি ব্যয় করেছো। ফলে দুনিয়ায় লোকজন তোমাকে দাতা বলেছে। এখন আমার কাছে এর কোন প্রতিদান নেই। এরপর ঐ ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করে জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে।

অপর এক হাদীসে আরো কঠিন পরিণতির কথা এভাবে বলা হয়েছে যে, লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান-সাদকা করা শিরকী কাজ, যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। প্রদর্শনীমূলক যাকাত দেয়া ও দান-সাদকা করার পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

فَمَثَلُه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَه وَابِلٌ فَتَرَكَه صَلْدًا-لاَيَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِّمَّا كَسَبُوْا-وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ-

(যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যয় করে) সে ব্যক্তির দান-সদকার উদাহরণ একটি মসৃণ পাথরের ন্যায়, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। এরপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তারপর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। অনুরূপ অহংকারী সাদকাকারী সাদকা করে যা কিছু সাওয়াব অর্জন করে তা তার কোনোই উপকারে আসে না। আল্লাহ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরা আল বাকারা-২৬৪)

আয়াতে 'কঠিন পাথর' দ্বারা অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির দয়া-মায়া ও ইখলাছবিহীন অন্তর বুঝানো হয়েছে। আর 'বৃষ্টির' দ্বারা দান-সাদকা এবং মাটির 'সামান্য আবরণ' দ্বারা এর বাহ্যিক অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা শুধু উপরিভাগে দৃশ্যমান। নিঃসন্দেহে বৃষ্টির কাজ যমীনকে ফসলে তরতাজা করে তোলা। কিন্তু যে যমীনের নিচে কঠিন পাথর থাকে তার উর্বরা শক্তি থাকে না।

তেমনি অহংকারী দাতা নিজের নরম হৃদয়-মন অহংকারের দ্বারা পাথরের মতো শক্ত করে দেয়, যাতে না থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য আর না থাকে অনাথ গরীবের প্রতি দয়া-মায়া, সহানুভূতির কোনো প্রেরণা। ঐ পাথুরে যমীনের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলে যেমন কোনো লাভ হয় না অনুরূপ অহংকারীর দান সাদকাও কোনো উপকারে আসে না। প্রথম বৃষ্টি হতেই যেমন পাথরে হালকা আবরণ পরিষ্কার হয়ে যায়। অহংকারীর দান-সাদকাও সাওয়াব শূন্য হয়ে যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও এ সাদকাকে নেক কাজ বলে মনে হয়। তা পাথরের ওপরের হালকা মাটির আবরণের ন্যায়, যা প্রথম বৃষ্টিতেই পরিষ্কার হয়ে ভেতরের কঠিন পাথর বেরিয়ে আসে।

যাকাত-সাদকা স্বার্থক যাকাত-সাদকার মর্যাদায় উন্নীত হতে দাতার ধন-সম্পদ অবশ্যই হালাল হতে হবে। অবৈধ সম্পদ দিয়ে যাকাত আদায় করলে দাতার যাকাত আদায় হয় না আর না তা দাতার অবশিষ্ট অবৈধ সম্পদ পবিত্র হয়। সূরা বাকারার ২৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ-

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর পথে তোমরা তোমাদের হালাল সম্পদ ব্যয় করো। (সূরা বাকারা)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ তা'য়ালা যেমন পাক-পবিত্র, তেমনি তিনি বান্দার পাক-পবিত্র সম্পদই গ্রহণ করে থাকেন। (মুসলিম)

যাকাত বা দান-সাদকার ক্ষেত্রে নিম্নমানের কোনো বস্তু দেয়া যাবে না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা দান করা হবে, তা হতে হবে অবশ্যই উৎকৃষ্ট বস্তু। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ করো না। (সূরা আল বাকারা-২৬৭)

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

কোরআন যাকাতের আসল প্রাণশক্তি ও এর মৌলিক লক্ষ্য এবং গুরুত্বসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথে তা বিলি-বন্টন করার খাতসমূহেরও বিস্তারিত তালিকা পেশ করেছে। সে সব খাতসমূহেই এর বন্টন হওয়া অপরিহার্য। বর্ণিত সেসব খাত ব্যতীত যদি কেউ নিজের খেয়াল-খুশি মতো যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে যাকাত আদায় হবে না। যথাযথ খাতে যাকাত প্রদান করতে হবে। যাকাত বন্টনের খাত হলো আটটি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ-وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, সাদ্‌কা-যাকাত শুধুমাত্র দরিদ্র, মিসকীন, যে (যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন) কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের হৃদয়-মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, যারা বন্দী, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে এবং নিঃস্ব পথিকের জন্যে। এ আল্লাহর নিকট থেকে ফরজ হিসেবে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা আত তাওবা-৬০)

১। **ফকীর ঃ** শরীয়াতের পরিভাষায় এমন অনাথ-অসহায় ব্যক্তিকে ফকীর বলে, যার মালিকানায় যেমন কোনোই ধন-সম্পদ নেই তেমনি নেই আয়-রোজগার করার কোনো উপায় অবলম্বন। এতিম, বিধবা, পঙ্গু ও জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এ খাতের আওতাভুক্ত। এক কথায় যাদের পার্থিব জীবন ধারণ অপরের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তারাই 'ফকীর' খাতের অন্তর্ভুক্ত।

২। **মিসকীন ঃ** মিসকীন বলতে সমাজের ঐ সব গরীব-অভাবী লোকদেরকে বুঝায়, যারা প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে চরম দুরাবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করতে অক্ষম হয়। না রোজগারের কোনো উপায় অবলম্বন যোগাড় করতে সমর্থ

www.pathagar.com

হয়, আর না পারে নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে কারো কাছে খোলাখুলি সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে। এ কারণে সাহায্যদাতারাও তাদের দুরাবস্থার ব্যাপারে অনুমান করতে অক্ষম হয়ে সাহায্য দিতেও এগিয়ে আসেন না। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গরীব ব্যক্তিরাই অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহায্যের উপযোগী মিসকীন।

৩। **যাকাত সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ ঃ** এ খাত যাকাতের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ যাকাত সংস্থা যাদেরকে ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা, এর রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও বিলি বন্টনের ব্যবস্থাদি আন্‌জাম দেয়ার জন্য কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত করে, তারা ফকীর মিসকীন না হলেও তাদের বেতন ভাতা যাকাতের সম্পদ থেকেই দেয়া যাবে।

৪। **মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে ঃ** এ খাতের আওতায় ঐসব ইসলাম বিরোধী লোকজন শামিল যাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে মুসলিম মিল্লাতের পক্ষে মন জয় করার প্রয়োজন হয়। এর উদ্দেশ্য, ইসলাম বিরোধী জোটে ভাঙন সৃষ্টি করা, ইসলামের ক্ষতিসাধনের অপতৎপরতা হতে বিরত রাখা, বিরোধিদের তীব্রতা হ্রাস করা বা ইসলামী আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করা এবং নবদীক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকার মানসিকতা প্রস্তুত করা প্রভৃতি।

৫। **বন্দী মুক্তি বা দাসমুক্ত ঃ** বর্তমান পৃথিবীতে দাস প্রথা নেই, এ কারণে যাকাতের অর্থ-সম্পদ ঐসব লোকদের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে, যারা জরিমানা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না বা জরিমানা দিতে না পারার কারণে কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে।

৬। **ঋণী ব্যক্তিকে ঃ** এ খাতের আওতায় ঐ সব লোক শামিল যারা ঋণভারে জর্জরিত। তারা উপার্জনকারী হোক বা না হোক, সম্পূর্ণ অসহায় হোক অথবা এমন কিছু পুঁজির মালিক হোক যার মাধ্যমে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় না। যাকাতের সম্পদ এ শ্রেণীর লোকদেরও তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য দেয়া যাবে।

৭। **আল্লাহর পথে ঃ** আল্লাহর পথ অর্থ জিহাদের পথ, যা ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। এক কথায় আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করে আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ও এই লক্ষ্যে যাবতীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত মুজাহিদের সবরকমের প্রয়োজনও যাকাতের সম্পদের মাধ্যমে করা যাবে।

৮। **মুসাফিরের সহায়তায় ঃ** বিদেশে সফরকারীগণ সফর অবস্থায় আর্থিক প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে, স্বদেশ এবং নিজ বাড়ীতে তারা ধনবান হলেও যাকাতের টাকা তাদের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করা যাবে।

যাকাত বিলি-বন্টনের বর্ণিত খাতগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত খাত। সুতরাং ফরজ যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে দাতার এতে কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার বা একে উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে কোনো খাত সৃষ্টি করার আদৌ কোনো অধিকার নেই। তবে নফল দান-সাদকা করার ক্ষেত্রে দাতার পক্ষে অধিক সাওয়াব ও কল্যাণ লাভের আশায় প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো হালাল খাতে ব্যয় করতে পারে।

www.pathagar.com

যাকাত নতুন কোনো বিধান নয়

প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রতিই যাকাত দেয়া ফরজ ছিলো। তবে কি পরিমাণ সম্পদ অতিরিক্ত থাকলে তার কতটুকু অংশ যাকাত দিতে হতো, তার সঠিক তথ্য জানার কোনো মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। পক্ষান্তরে কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন, তাঁদের অনুসারীদেরকে যাকাত আদায়ের কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যতো নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তাঁদের সকলের আদর্শ ছিলো ইসলাম। প্রত্যেক নবীর উম্মতই ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিলো। পরবর্তীতে মানুষ নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে এবং নিজেদের চিন্তাধারা প্রসূত মতবাদ-মতাদর্শ তৈরী করে তা অনুসরণ করতে থাকে। এভাবে করেই মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মর্জি মতো ধর্মমত বানিয়ে নিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ-وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ-وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ-

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (উত্তর কালে এই অবস্থা বর্তমান থাকেনি বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।) তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বাঁকা পথের অনুসারীদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী ছিলেন এবং তাদের প্রতি সত্যগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন, যেনো সত্য সম্পর্কে মানুষদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত সমাধান করতে পারে। (এবং এসব মতপার্থক্য এ কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়নি।) মতপার্থক্য তারাই সৃষ্টি করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরেও শুধু এ কারণে সত্য ত্যাগ করে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছিল যে, তারা একে অপরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ় সংকল্প ছিল। (সূরা বাকারা-২১৩)

বস্তুবাদ আর নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী লোকজন নিজেদের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে 'পৃথিবীতে ধর্মের সূচনা' সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করে তখন তারা বলে থাকে যে, 'মানুষের যেমন সূচনা হয়েছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে অনুরূপভাবে মানুষ অংশীদারিত্বের তথা শিরকের ঘোর তমসাবৃত এক অন্ধকারের মধ্যেই ধর্মীয় জীবনযাত্রার সূচনা করেছিলো।

www.pathagar.com

তারপর ক্রমবিকাশের সার্বজনীন নিয়মানুসারে অংশীদারিত্বের তমসা ক্রমশ বিদূরিত হয়ে আলোর স্ফূরণ ঘটলো। এভাবেই মানুষ শেষ পর্যন্ত স্রষ্টা সম্পর্কে একত্ববাদের পর্যায়ে উপনীত হলো।'

পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানব জাতি ও তার সার্বজনীন আদর্শ সম্পর্কে তথাকথিত গবেষকদের মনগড়া এই ধ্যান-ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে। পবিত্র কোরআন মানব জাতির সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরে ঘোষণা করেছে, মানুষের সূচনা যেমন কোনো অন্ধকার পঙ্কিলতার মধ্যে হয়নি অনুরূপভাবে তার জীবনও শির্কের অন্ধকারের মধ্যে বিকশিত হয়নি। বরং তাওহীদের প্রবল আলোকিত প্রভার মধ্যেই মানুষের জীবন পরিচালনার সূচনা হয়েছিলো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে সূচনা লগ্ন থেকেই মহাবিশ্বের প্রকৃত তত্ত্ব ও জীবন-যাপনের সত্য-সঠিক এক আলোক উজ্জ্বল পথপ্রদর্শন করেছিলেন এবং এক অভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণের পন্থাও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানব মন্ডলী ইসলামের অভ্রান্ত আদর্শের অনুসারী ছিলো এবং অখন্ড জাতি হিসাবেই পৃথিবীর ভূখন্ডে জীবন-যাপন করতো। এভাবে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হবার পরে মানুষ নিজস্ব চিন্তাধারা প্রয়োগ করে নতুন মত ও পথের আবিষ্কার করে তা অনুসরণ করতে থাকে।

মানুষ এসব ভ্রান্ত পথ এ জন্য অবলম্বন করেনি যে, তাদেরকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত করানো হয়নি। অবশ্যই তাদেরকে প্রকৃত সত্য অবগত করা হয়েছিলো। বরং তারা প্রকৃত সত্য অবগত হবার পরও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং তারা দলাদলি সৃষ্টি করে বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই মানব সভ্যতায় এক বিশৃংখল অবস্থার উদ্ভব হয়। এই মতভেদের কারণেই মানুষ প্রকৃত সত্য থেকে ছিটকে পড়ে, ক্রমশঃ সত্য তিরোহিত হয়ে যায়। মানুষ ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত পৃথিবীতে পথ চলতে থাকে।

সত্য তিরোহিত হয়ে যাবার কারণে মানুষের ভেতরে চরম হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, মানুষ আত্মস্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা সত্য অস্বীকারকারী হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের প্রকৃত অধিকারের তুলনায় আরো অনেক বেশী স্বেচ্ছাচারমূলক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার আকাঙ্খা করতে থাকে। ফলে একে অপরের ওপর জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে থাকে। বিশৃংখলতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ তাদের ভেতরে নবী বা রাসূল প্রেরণ করেন।

তাঁরা মানুষকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথ পরিহার করে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানান, মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন, যারা সত্য গ্রহণ না করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেন। নবীদেরকে এ জন্য প্রেরণ করা হয়নি যে, তাঁরা পৃথিবীতে আগমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম অনুসারে একটি ধর্মমত রচনা করে তার প্রতি

www.pathagar.com

মানুষকে আহ্বান জানাবেন এবং অনুসারীদেরকে নিয়ে একটি নতুন জাতি গঠন করবেন। বরং তাঁদেরকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁরা গোটা দুনিয়ার সামনে সত্যকে পুনরায় নতুন করে উদ্ভাসিত করবেন এবং সত্যের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

সুতরাং সৃষ্টির শুরু থেকেই সমস্ত মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং তারা একই আদর্শের অনুসারী ছিলো। মানুষ যখন প্রকৃত সত্যকে ভুলে বিপর্যয়ের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে নবী প্রেরণ করে তাদেরকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী একই আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সকল নবীর অনুসারীগণই মুসলমান ছিলেন। নবীগণ তাদেরকে নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কোনো নবীর সময়ই নামায ও যাকাত থেকে কোনো মুসলমানকে মুক্ত রাখা হয়নি। সকল যুগে সকল মুসলমানদের ওপরেই নামায ও যাকাত বাধ্যতামূলক ছিলো। সূরা আম্বিয়ায় মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশের অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ–

আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ নির্দেশনা দিতো এবং আমি তাদেরকে অহীর মাধ্যমে সৎকাজের, নামায প্রতিষ্ঠা করার ও যাকাত দেবার নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা আমারই দাসত্ব করতো। (সূরা আম্বিয়া-৭৩)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরে যে সকল নবী আগমন করেছিলেন, তাঁদের প্রতি নামায আদায় ও যাকাত দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যেমন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا–

আর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো, সে ছিলো ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং রাসূল-নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায আদায় ও যাকাত দানের আদেশ দিতো এবং নিজের রব-এর কাছে ছিলো একজন পছন্দনীয় ব্যক্তি। (সূরা মারইয়াম-৫৪-৫৫)

কোনো একজন নবীর উম্মতও যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলো না। সুতরাং প্রত্যেক নবীর উম্মতকেই যাকাত আদায় করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারীগণ তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বেচ্ছাচারমূলক কর্মকান্ডে জড়িত

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিলো। তিনি ফিরে এসে অপরাধীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের অনুসারীদের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেছিলেন–

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هذه الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ –

অতএব আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে কল্যাণ লিখে দিন আর পরকালেও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। (সূরা আ'রাফ-১৫৬)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন এভাবে কাতর কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে কল্যাণের আবেদন পেশ করলেন, তখন তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হলো–

قَالَ عَذَابِىْ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِايتِنَا يُؤْمِنُوْنَ–

শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দেই, কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দেবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। (আ'রাফ-১৫৬)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারী লোকজন তথা বনী ইসরাঈলীরা ছিলো অত্যন্ত কৃপণ স্বভাবের। তারা ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতো না এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ দান করার বিষয়টি ছিলো তাদের কাছে আযাবের মতো।

এই জাতির মঙ্গলের জন্য হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালেন, তখন তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হলো, তারা যদি আমার বিধানের সাথে বিদ্রোহী আচরণ না করে এবং যাকাত দান করে তাহলে তারা অবশ্যই আমার রহমতের অধিকারী হবে। আর যদি তারা আমার বিধানের সাথে নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে আমার আযাব পরিবেষ্টন করবে।

হযরত মূসা আলাইসিস্ সালাম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে যেসব নবী বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো, আল্লাহ তা'য়ালা সেসব নবীদের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা যাকাত দান করবে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّهَ–وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبى وَالْيَتمى وَالْمَسكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكوةَ–

www.pathagar.com

স্মরণ করো, বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে আমি ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। (সূরা বাকারা-৮৩)

কিন্তু এসব লোকজনের অধিকাংশই আল্লাহর বিধান একের পর এক অমান্য করতে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় এদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে জানিয়ে দিলেন–

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ-

তোমরা নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আমার নবীদেরকে মেনে চলো, তাদের সাহায্য ও শক্তি বৃদ্ধি করো ও আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি তোমাদের সাথী হবো এবং তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষত্রুটি দূর করে দেবো। (সূরা মায়িদা-১২)

বর্তমান যুগে যারা নিজেদেরকে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারী হিসাবে দাবী করে থাকে, তাদের প্রতিও যাকাত দান করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামই ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো নবী নেই। হযরত ঈসার জন্ম ও তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত সবটাই ছিলো এক অলৌকিক ব্যাপার। শিশু অবস্থায় যখন তাঁর পবিত্র মাতাকে নানা ধরনের অপবাদে অভিযুক্ত করা হচ্ছিলো, তখন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসার মুখে জবান দিয়েছিলেন। সদ্যজাত শিশু হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন–

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ-اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ-وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا-

আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেনো আর যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। (সূরা মার্‌য়াম-৩০-৩১)

কোরআন অবতীর্ণ করার পূর্বে হিদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিলো, সেসব কিতাবের অনুসারীদেরকে কোরআনে 'আহ্‌লি কিতাব' হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

www.pathagar.com

আর তাদেরকে শুধু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, তাঁরই জন্যে আনুগত্যকে খালেস করে একমুখী হবে। আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। আর মূলত এটাই অতীব সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন। (সূরা বাইয়েনা-৫)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম যে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে– তা কোনো নতুন বিষয় নয়। বরং ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মতকেই যাকাত দান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যেমন দারিদ্রতা দূর করার ব্যবস্থা করেছেন, অপরদিকে বান্দাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী করেছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা এটাই দেখতে চেয়েছেন যে, আমার কোন্ বান্দাহ্ আমার জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত আর কোন্ বান্দাহ্ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। কোন্ বান্দাহ্ মুমিনদের দলে শামিল হওয়ার উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়– যাকাত দান করা বা না করার মধ্য দিয়ে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তির মন-মানসিকতা কৃপণতা নামক এক ঘৃণ্য ব্যধিতে আক্রান্ত, আল্লাহর দেয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আল্লাহরই আদেশে দান করতে মোটেও প্রস্তুত নয়, সেই ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের কোনো কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। বান্দার কাছ থেকে এই পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীর উম্মতকে যাকাত দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন যেমনভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

যাকাত ঈমানের মানদণ্ড

ইসলাম শুধুমাত্র মুখে মুখে ঈমানের দাবিকে স্বীকৃতি দেয়নি। 'ঈমান এনেছি' এ কথা মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথেই কাউকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর একনিষ্ঠ গোলাম বলে গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার বলে দাবি করবে, তাকে অবশ্যই তার দাবির অনুকূলে পরীক্ষা দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ-وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ-

লোকেরা কি মনে করেছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ্ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২-৩)

আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে নানাভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। বিপদ-মুসিবত, ক্ষয়-ক্ষতি, রোগ-শোক, দুঃখ-ব্যধি-জ্বরা ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। স্বর্ণকে খাঁটি সোনায় পরিণত হতে হলে যেমন এসিড়ে জ্বলতে হয়, অনুরূপভাবে একজন ঈমানদারকে আল্লাহ তা'য়ালার অকৃত্রিম গোলামে পরিণত হতে হলেও বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। যাকাতও পরীক্ষার একটি মাধ্যম। কারণ মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদকে সর্বাধিক প্রিয় মনে করে থাকে

এবং এই ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণও বিপন্ন করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ–

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারো না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পথে সেসব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে, যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত রয়েছেন। (সূরা ইমরাণ-৯২)

আল্লাহ তা'য়ালা সঙ্কীর্ণমনা লোকদেরকে পছন্দ করেন না। তিনি বান্দাকে পরীক্ষার জন্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করে থাকেন। যে বান্দাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করা হলো, সেই বান্দাহ্ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করে, যাকাত না দেয় তাহলে তো এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেই ব্যক্তির ঈমানের দাবি মিথ্যা। তার হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং আল্লাহর জন্য সে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করতে মোটেও প্রস্তুত নয়। মুখে ঈমানের দাবি করলেও আল্লাহর কোরআন এ ধরনের লোকদেরকে ঈমানদার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ–

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোক– যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়। (সূরা মায়িদা-৫৫)

যেসব মানুষ বৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, নিঃসন্দেহে তারা সীমাহীন পরিশ্রমের বিনিময়েই তা করে থাকে। পরিশ্রমলব্ধ– কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ থেকে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দান করতে হলে অবশ্যই বিশাল মন-মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। মনে সঙ্কীর্ণতা লালন করে কারো পক্ষে কিছু দান করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মন থেকে সঙ্কীর্ণতা দূর করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

অতএব আল্লাহকে ভয় করে চলো, আর শোনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করো, এটা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে ব্যক্তি নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো, শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আত-তাগাবুন-১৬)

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধিদের অবর্ণনীয় নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে মুসলমানরা নিজেদের যাবতীয় জাগতিক সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো, তখন মদীনার মুসলমানরা তথা আনসাররা ঐসব নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার নজীর পৃথিবীর কোনো জাতির ইতিহাসেই নেই।

মদীনায় আগত নির্যাতিত মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় মদীনার মুসলমানরা স্বেচ্ছায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেছিলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নানা ধরনের ফল-মূল ও খেজুরের বাগান রয়েছে। আপনি এসব কিছু মদীনায় আগত মুসলিম ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিন।

মদীনার মুসলমানরা ছিলো কৃষিজীবী আর মক্কার মুসলমানরা ছিলো ব্যবসায়ী। মক্কার মুসলমানরা কৃষিকাজ জানতেন্না। এ জন্য মদীনার মুসলমানদের এই প্রস্তাব শুনে আল্লাহর রাসূল জবাবে বলেছিলেন, এরা বাগান ও কৃষি কাজ জানে না। এসব লোক যে জায়গা থেকে এসেছে, সেখানে বাগান ও কৃষি কাজ নেই। বরং বিষয়টি কি এমন হতে পারে না যে, তোমরাই তোমাদের বাগানে ও ক্ষেতে কাজ করবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মদীনায় আগত মুসলমানদেরকে তোমরা দিবে?

আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখে এই কথা শুনে মদীনার মুসলমানরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (বোখারী)

মদীনায় আগত নির্যাতিত মুসলমানরা মদীনার মুসলমানদের এই বদান্যতা দেখে অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন, এই ধরনের ত্যাগ ও নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করার মতো মন মানসিকতাসম্পন্ন লোক আমরা কখনো দেখিনি। এরা নিজেদের জমিতে নিজেরাই শ্রম দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে তার অংশ আমাদেরকে দিবে! আমরা মনে করি এরাই সমস্ত সওয়াবের অংশীদার হয়ে যাবে।

এদের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং এদের জন্য কল্যাণের দোয়া করতে থাকবে, ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহ্মাদ)

হৃদয় কতটা প্রশস্ত হলে এই ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা যায় তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। মদীনার মুসলমানদের হৃদয়ের বিশালতা ও সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষার বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাশরের ৯ আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ الاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ

يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ

www.pathagar.com

بِهِمْ خَصَاصَةٌ-وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

(সেই ধন-সম্পদ সেই লোকদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিলো। তারা ভালোবাসে সেই লোকদেরকে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তাদেরকে যা-ই দেয়া হয় তার কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত তারা নিজেদের হৃদয়ে অনুভব করে না এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়- নিজেরা যতোই অভাবগ্রস্ত হোক না কেনো। বস্তুত যেসব লোককে তাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা (বা লোভ জনিত কার্পণ্য) থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা হাশর)

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, লোভী ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই কৃপণ স্বভাবের হয়ে থাকে এবং তার যা রয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো চায়। এ কারণেই তার পক্ষে ধন-সম্পদ থেকে যাকাত দেয়া বা মহান আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করা কখনো সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি আরো চায়- তার পক্ষে নিজের সম্পদ ত্যাগ করা কিভাবে সম্ভব? লোভ আর কার্পণ্যতা যার মধ্যে রয়েছে, উপার্জনের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বৈধ-অবৈধের সীমারেখা মানবে না। ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য সে বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবাই লোভপূর্ণ কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকো। কারণ লোভপূর্ণ কার্পণ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এরই প্ররোচনায় তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুসমূহ হালাল করে নিয়েছে। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ঈমান ও লোভপূর্ণ কার্পণ্য কারো হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। (নাসায়ী-বায়হাকী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- দুইটি স্বভাব বা চরিত্র কোনো মুসলমানের হৃদয়ে থাকতে পারে না। একটি হলো চরিত্রহীনতা ও অন্যটি কার্পণ্য। (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

লোভী ও কৃপণ স্বভাবের লোকদের পক্ষে যাকাত আদায় বা দান-সাদকা করা সম্ভব নয়। আর এই দুটো স্বভাব যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের পক্ষে ঈমানের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হওয়াও সম্ভব নয়। ঈমানের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে হলে, আখিরাতের জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে, অবশ্যই লোভ ও কার্পণ্যতা পরিত্যাগ করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ-কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় ও দান-সাদকা করতে হবে।

আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে হৃদয়টা আকাশের মতোই প্রশস্ত করতে হবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধন-সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোই দান করতে হবে। ঈমানদার তো সেই ব্যক্তি, যার আত্মা বিশাল এবং নিজের সীমাহীন অভাব ও অপরিহার্য প্রয়োজন থাকার পরও

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে থাকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেছেন-

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ-

সেই পথে তীব্র গতিতে অগ্রসর হও, যা তোমাদের রব-এর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা আর্থিক দুর্গতি ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা আলে ইমরাণ-১৩৩-১৩৪)

সুতরাং লোভ ও কৃপণতা পরিহার করে শুধু যাকাত আদায়ই নয়- গোপনে ও প্রকাশ্যে মহান আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদকা করতে হবে। পরিশ্রমলব্ধ ও কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করা এক তীক্ত ও কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই উত্তীর্ণ হতে পারে, যে ব্যক্তির সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা।

যাকাত আদায় বা দান-সাদকা করাকে নিজের ওপরে বোঝা মনে না করে সন্তুষ্ট চিত্তে তা করতে হবে। যাকাত দিয়ে বা কাউকে দান-সাদকা দিয়ে এ কথা মনে করা যাবে না যে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করলাম। দান করে সেই দানের তুলনা দিয়ে কথা বলে দান গ্রহণকারীর মনে কষ্ট দিয়ে অথবা প্রশংসা পাবার আশায়, দানবীর হিসেবে নিজেকে প্রচার করার লক্ষ্যে কেউ যাকাত আদায় বা দান-সাদকা করে তাহলে তার কাছ থেকে মহান আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। এই ধরনের লোক ঈমানের দাবীতে উত্তীর্ণ নয় বরং তারা স্পষ্ট মুনাফিক।

www.pathagar.com

তৃতীয় গুণ– আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আলোচ্য সূরা লুকমানের দ্বিতীয় আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াতে বলা হলো, এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, এই কিতাব পথপ্রদর্শন করবে সৎকর্মশীলদের। সৎকর্মশীল হলো তারাই যারা নামায আদায় করে, যাকাত দান করে এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে। কেনো পরকালের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে, পরকালের প্রয়োজনীয়তা কেনো, পরকালের প্রতি বিশ্বাসের উপকারিতা কি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষের চরিত্রে কোন্ ধরনের গুণ বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমরা তাফসীরে সাঈদী–সূরা ফাতিহার তাফসীরে 'যিনি বিচার দিবসের মালিক' শিরোণাম থেকে 'বিচার দিবসে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না' শিরোণাম পর্যন্ত আলোচনা করেছি।

তাফসীরে সাঈদী– সূরা আসরের তাফসীরে 'আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেয়া ঈমানের দাবী' শিরোণামেও আলোচনা করেছি। এ ছাড়া তাফসীরে সাঈদী– আমপারার বিভিন্ন সূরার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আলোচ্য সূরার তাফসীর অধ্যয়ন কালে তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা ফাতিহার তাফসীর ও সূরা আসরের তাফসীর অধ্যয়ন করলে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সহজ হবে। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াতে মুহসিনীনদের তিনটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা করে পঞ্চম আয়াতে এর সমাপ্তি টানা হয়েছে এভাবে যে, 'এরাই তাদের রব-এর পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই হবে সফলকাম।'

আলোচ্য সূরার পঞ্চম আয়াতে ব্যবহৃত রব শব্দের বিস্তারিত তাফসীর, সঠিক পথ বলতে কোন্ পথকে বুঝানো হয়েছে, তা আমরা আলোচনা করেছি তাফসীরে সাঈদী–সূরা ফাতিহার তাফসীরে। আর এই আয়াতে সফলতা বা সাফল্য লাভ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাফসীরে সাঈদী সূরা আসরের তাফসীরে।

এই সফলতা ব্যর্থতার ধ্বংস গহ্বর

আলোচ্য সূরার ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর মানুষদের মধ্যে এমন নিকৃষ্ট মানুষও রয়েছে, যারা অর্থহীন মনোমুগ্ধকর কাহিনী কিনে আনে অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর পথের আহ্বানকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনামূলক শাস্তির ব্যবস্থা।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, আলোচ্য সূরার পূর্বের পাঁচটি আয়াতে বলা কথাগুলোর সাথে ষষ্ঠ আয়াতে বলা কথাগুলোর সম্পর্ক কি এবং পূর্বে একটি বিষয়ে আলোচনা করার পরপরই ষষ্ঠ আয়াতে আরেকটি ভিন্ন বিষয়ের কেনো সূত্রপাত করা হলো?

এর জবাব হলো, আবহমান কাল থেকেই মানুষ প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা নির্ধারণে ঐকমত্য পোষণ করতে পারেনি। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান বিবর্জিত ও পরকালে অবিশ্বাসী মানুষগুলো এই পার্থিব জগতে কোনো বিষয়ে সফলতা অর্জন করাকেই প্রকৃত সফলতা বলে

www.pathagar.com

গণ্য করেছে। পৃথিবীতে যেসব মানুষ নানা ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে সম্মান-মর্যাদা, যশ, প্রশংসা, খ্যাতি-সুনাম, অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা-প্রভাব ইত্যাদির অধিকারী হয়েছে, এটাকেই তারা প্রকৃত সফলতা হিসেবে বিবেচনা করেছে।

এভাবে গীতিকার, গায়ক, বাদক, খেলোয়াড়, চিত্র শিল্পী, নৃত্য শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব মানুষ সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করে অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছে, তারা যেমন নিজেদের সম্পর্কে ধারণা করেছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বন করেছিলো বিধায় সফলতা অর্জন করেছে, অনুরূপভাবে একশ্রেণীর লোকজনও তাদের সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করেছে যে, এসব লোকগুলো যে পথ অবলম্বন করে বর্তমানে সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভূত অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়েছে, এই পথই নির্ভুল পথ এবং এই নির্ভুল পথ অবলম্বন করার কারণেই এসব লোক পৃথিবীতে কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী হিসেবে সফলতা অর্জন করেছে।

ঠিক এ কারণেই সাধারণ লোকজন পৃথিবীতে সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনধারা, তাদের পছন্দ-অপছন্দ এবং রুচি সম্পর্কে জানার আগ্রহ ব্যক্ত করে। তাদের জীবনধারা অনুকরণ-অনুসরণও করে। শুধু তাই নয়– সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী এসব মানুষ কখন কোন্ বিষয়ে কি মন্তব্য করলো এবং বিভিন্ন কল-কারখানায় উৎপাদিত কোন্ পণ্য-দ্রব্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তা জানার চেষ্টা করে। উৎপাদিত যে পণ্য সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে, সেই পণ্য ক্রয় করার জন্য তাদের সফলতা সম্পর্কে সুধারণা পোষণকারী লোকগুলো উদ্বুদ্ধ হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর কোরআন এই ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করে মানুষকে জানিয়েছে, পরকালীন জগতে সফলতা অর্জন করাই হলো প্রকৃত সফলতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব যে কথাগুলো তোমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, এই কথাগুলোই একমাত্র নির্ভুল, তথ্য নির্ভর, সঠিক এবং সততার যে কোনো মানদন্ডে উত্তীর্ণ। তোমরা যেসব মানুষের কথা সত্য-সঠিক, নির্ভুল বলে বিশ্বাস করছো, তারা যে পথ অবলম্বন করে সফলতা অর্জন করেছে বলে তোমরা ধারণা করছো, তাদের বলা কথা জ্ঞানগর্ভ নয়, তাদের অবলম্বিত পথ ধ্বংসের পথ এবং এই পথই তাদেরকে অবিলম্বে ব্যর্থতার ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।

সফলতা অর্জন করবে কেবলমাত্র তারাই যারা এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবের কথাগুলো মেনে নিয়ে অনুসরণ করেছে তথা নামায আদায় করেছে, যাকাত দিয়েছে এবং পরকালভিত্তিক জীবনযাপন করেছে। এ জন্যই আলোচ্য সূরার ষষ্ঠ আয়াতে একশ্রেণীর লোকদের অবলম্বিত পথকে ব্যর্থতার ও লাঞ্ছনামূলক শাস্তির পথ হিসেবে বর্ণনা করার পূর্বেই প্রথম আয়াত থেকে চতুর্থ আয়াতে প্রকৃত সফলতার পথ কোনটি তা স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সফলতার পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে তারপর ব্যর্থতার পথ কোন্টি, তা নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'আর মানুষদের মধ্যে এমন নিকৃষ্ট মানুষও রয়েছে যে, অর্থহীন মনোমুগ্ধকর কাহিনী কিনে আনে অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর পথের আহ্বানকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে

www.pathagar.com

লাঞ্ছনামূলক শাস্তির ব্যবস্থা।' অর্থাৎ সফলতার সঠিক পথ মনে করে যেসব কল্প-কাহিনী রচনা করে বা কিনে এনে মানুষকে শোনায় অথবা মনোমুগ্ধকর- মনমাতানো দৃশ্য প্রদর্শন করে মানুষকে প্রকৃত সফলতার পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা করে, তাদের প্রদর্শিত পথ সফলতার পথ নয়। এদেরকে প্রকৃত সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানালে এরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এবং বিষয়টিকে গুরুত্বহীন বলে প্রমাণ করার লক্ষ্যে তারা হাসি-ঠাট্টা করে। প্রকৃত সফলতার পথকে লোকজনের কাছে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত করার অপচেষ্টা করে। আর এই শ্রেণীর লোকদের জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনামূলক শাস্তি।

মনোমুগ্ধকর ব্যর্থ কাহিনী

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ 'লাহ্ওয়াল হাদীস' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে লাহ্ওয়াল হাদীস বলতে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের মন-মানসিকতা উদাসীন করে দেয়, মানুষকে উদাসী করে তোলে এবং সে এমনই এক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকে যে, যেখানে বাস্তবতা ও কল্যাণের কোনো ছোঁয়া থাকে না। সময়ের অপচয় ব্যতীত যেখানে আর কিছুই হয় না এবং কোনো সুফলও আশা করা যায় না। এর থেকে এমন কিছুই অর্জন করা যায় না, যার মাধ্যমে মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে।

লাহ্ওয়াল হাদীস বলতে এমন সব কথা, কল্প-কাহিনী, রূপকথা, নাটক-উপন্যাস, গান-বাজনা ও অর্থহীন তৎপরতাকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের মনোযোগকে বাস্তবতা ও কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষকে এমনভাবে আত্ম-সমাহিত করে দেয় যে, সে বাস্তবতা থেকে চরমভাবে অমনোযোগী হয়ে ওঠে।

এই আয়াত মক্কায় এমন এক পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন ইসলাম বিরোধী লোকগুলো সাধারণ মানুষকে কোরআন শোনা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। আল্লাহর কোরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তখন যারা এর বিরোধিতা করেছে, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল–এই কিতাবকে তারা না পারছিল আল্লাহর বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, না পারছিল এটাকে মানুষের রচনা করা কিতাব হিসেবে প্রমাণ করতে। এই কিতাবকে যদি তারা আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং সেই সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর এই বিষয়টি তাদের কাছে ছিলো একেবারেই অসহনীয়। অপরদিকে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে তারা যে অপপ্রচার চালাচ্ছিলো, সে অপপ্রচারের ফল হচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ–যাদের অন্তরে ছিল সত্যানুসন্ধিৎসা, তারা ক্রমেই আল্লাহর কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছিলো। প্রত্যেক যুগে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই চিরসত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অস্ত্র যতই শানিত করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ ততই এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

সে যুগে যারা কোরআন বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তারা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের যে বাণী প্রচার করছেন, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এ কারণে তারা সাধারণ মানুষকে এই কোরআন শোনা থেকে বিরত থাকতে বলতো। মক্কার ইসলাম বিরোধিদের ইসলাম নির্মূলের অগণিত পরিকল্পনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো সমাবেশে মানুষকে কোরআনের কথা শোনাবেন, তখনই সেখানে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে কোরআন শোনানোর পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। নানাভাবে কোরআনের মাহফিলে বাধা সৃষ্টি করা, যেন মানুষের ওপরে এই কোরআন প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না পায়।

ইসলাম বিরোধী শক্তি এই অস্ত্র শুধু সে যুগেই প্রয়োগ করেনি, বর্তমানেও তারা তাদের সেই পুরনো অস্ত্র প্রয়োগ করে কোরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। সে যুগে ইসলাম বিরোধিরা মানুষকে কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে যে কথা বলতো তা মহান আল্লাহ সূরা হামীম সিজ্‌দার ২৬ আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

এসব কাফিররা বলে, এ কোরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। (হা-মীম সিজদা-২৬)

কোরআন কী অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী কিতাব, এই কিতাবের দাওয়াত যিনি দিচ্ছেন তিনি কেমন অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর এই ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর হচ্ছে, তা ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো, এ ধরনের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জবান থেকে এমন চিত্তাকর্ষক-হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে এই দৃষ্টান্তহীন কালাম যার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোরআনের আন্দোলনের প্রতি দুর্বল হবেই হবে। অতএব যে প্রকারেই হোক, কোরআনের মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না।

কিন্তু কোরআনের প্রভাব থেকে মানুষকে দূরে রাখার যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন মক্কার নযর ইবনে হারিস ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়ে বললো, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের বিরোধিতা করার জন্য এ পর্যন্ত যা কিছুই করেছো, তা ফলপ্রসূ হয়নি। এখন আমিই এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করবো, যা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

এরপর সে ব্যক্তি ইরাকে গিয়ে সেখান থেকে পারস্যের জাতীয় বীরদের কাহিনী, গল্পকথা, রূপকথা ও নানা ধরনের কল্পকাহিনী কিনে গায়িকা এবং নৃত্য পটিয়সীদের জড়ো করে মক্কায় আনলো। এভাবে নানা ধরনের গল্প-কাহিনীর আসর ও নাচ-গানের অনুষ্ঠান করে মানুষকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করলো। মনমাতানো নৃত্য-গীত ও কল্প-কাহিনী শুনিয়ে মানুষকে

www.pathagar.com

আত্ম-সমাহিত করে মহাসত্য সম্পর্কে উদাসীন-অমনোযোগী বানানোর অপচেষ্টা করতে থাকলো। নৃত্যের ছন্দে, গানের উদাসী সুরে আর কল্প-কাহিনীর ঐন্দ্রজালিক ছোঁয়ায় মানুষ যেন কল্পলোকে বিচরণ করে এবং মানুষের হৃদয়ে যেন কোরআনের আহ্বান প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, এ লক্ষ্যেই ইসলাম বিরোধী শক্তি এসব আয়োজন করেছিলো।

এদের এই অপতৎপরতার বিষয়টিই আলোচ্য আয়াতে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন অনেক মানুষ রয়েছে– যারা জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রকৃত সত্য চিনে জীবন পরিচালনা করে না। এরা নিজেরা যেমন বাস্তবতা বিবর্জিত পথে আবেগ-উচ্ছ্বাসের ওপর নির্ভর করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে এমন পথের দিকে ধাবিত হয়, যে পথ পার্থিব দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় বটে, কিন্তু এই পথের ঠিকানা ধ্বংসের অতল তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে। অপরদিকে সাধারণ মানুষকেও এরা নিজেদের অকল্যাণকর কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধ্বংস গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা মন ভুলানো গীত রচনা করে তা উচ্ছ্বাস জাগানো অশালীন নৃত্যের তালে তালে গেয়ে মানুষকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দেহের পরতে পরতে উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়িয়ে দেয়।

কবিতা-সাহিত্য ও উপন্যাসের নামে এমন সব কল্প-কাহিনী রচনা করে, যার সাথে মানুষের বাস্তব জীবন ও কল্যাণের দূরতম সম্পর্ক থাকে না। এসব পথভ্রষ্ট লোকদের রচিত কবিতা, সাহিত্য ও উপন্যাস মানুষকে আত্ম-সমাহিত করে রাখে এবং মারাত্মক ভাইরাসের মতোই কুরে কুরে খেয়ে মহাসত্যের দিক থেকে অমনোযোগী করে তোলে। মহাসত্য বিবর্জিত পথভ্রষ্ট কবির কবিতায়, সাহিত্য ও উপন্যাসে, গায়ক-গায়িকা ও নৃত্য শিল্পীদের গান-নৃত্যে একবার যারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাদের কাছে মহাসত্যের সন্ধান দিতে পারে এমন কবিতা, সাহিত্য, গান আর ভালো লাগে না। এসব সাহিত্যের একটি পৃষ্ঠাও পড়ে দেখার মতো ধৈর্য তাদের মন থেকে বিদায় নেয়। প্রকৃত সফলতার পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং মহাসত্যের পথে অগ্রসর করাতে পারে এ ধরনের সাহিত্য ও গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করার কথা বললে, তারা এমন আচরণ শুরু করে যে, মনে হয় তাদের কাছে কোনো খেল-তামাশার বিষয়বস্তু পেশ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, এদের কাছে সে বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনার কথা বললে, এরা শুধু হাসি-তামাশার মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখে না– কটূক্তিসহ ইসলামকে নানা ধরনের ভিত্তিহীন বিশেষণেও বিশেষিত করে। আল্লাহর বিধানকে মৌলবাদ, সেকেলে, বিজ্ঞানের যুগে অচল, সাম্প্রদায়িক আদর্শ ইত্যাদি ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যও করে থাকে। এসব লোক নিজেরা যেমন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, তেমনি তারা অন্য লোকদেরও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে তৎপর। এই পৃথিবীতে এরা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ও এই বিধান যারা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রাম করছে, তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্য বানিয়েছিলো, অকারণে সত্য পথের অনুসারীদেরকে অপমান করতো। এ জন্য এসব লোকদের জন্য মহান আল্লাহ তা'লাও লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

নৃত্য-গীত ও বাদ্যযন্ত্র

সূরা লুকমানের আলোচ্য আয়াতে যে লাহ্ওয়াল হাদীস শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের চিন্তাবিদগণ বলেছেন– এই শব্দ দিয়ে গান বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তিনবার মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছেন যে, এর অর্থ হলো গান। (বায়হাকী)

ইমাম কুরতুবী (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, লাহ্ওয়াল হাদীস বলতে গান বুঝানো হয়েছে।

স্বাধীন, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়ে অগণিত পুরুষের কামনা তাড়িত দৃষ্টির সামনে নৃত্য-গীত পরিবেশন করবে, সাধারণত এটা কল্পনাও করা যেতো না। চরিত্র বিধ্বংসী এই নোংরা প্রথা ও পেশা কেবলমাত্র কুরুচিপূর্ণ লোক ও দাসী-বাঁদীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো। বিখ্যাত মুফাস্সীর কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রাহঃ) আহ্কামুল কোরআন'-এ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহঃ) ও ইমাম মালিক (রাহঃ)-এর বরাত দিয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من جلس الى قينة يسمع منها صب اذنية الانك يوم القيمة–

যে লোক গায়িকা বাঁদীর অনুষ্ঠানে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে উত্তপ্ত শীশা ঢেলে দেয়া হবে।

তিরমিযী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لايحل بيع الغنيات ولاشراؤ هن ولاالتجارة فيهن ولاثمانهن–

গায়িকা মেয়েদের ক্রয়-বিক্রয় ও তাদের ব্যবসা করা বৈধ নয় এবং দান গ্রহণ করাও বৈধ নয়।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, তাদের মূল্য ভক্ষণ করাও বৈধ নয়। বাঁদীদেরকে গান-বাজনার শিক্ষা দেয়া এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয় এবং তাদের মূল্যও বৈধ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ يَّسْتَحِلُّوْنَ الْحَرَّ وَالْحَرِيْرَوَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ–

আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক দল সৃষ্টি হবে, যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। (বোখারী)

তিনি আরো বলেছেন– আমি বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–শেষ যুগে এই উম্মতের একটি দলের চেহারা বানর ও শুকরের চেহারায় পরিণত করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে

www.pathagar.com

চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ- কালিমায় সাক্ষ্য দিতো না? আল্লাহর নবী বললেন- হ্যাঁ, তারা রোযা পালন করতো, নামায পড়তো ও হজ্জও আদায় করতো। আল্লাহর রাসূলের কাছে পুনরায় জানতে চাওয়া হলো, তাহলে কেনো তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা বাদ্যযন্ত্র, ঢোল ও গায়িকাদের নিয়ে মদ পান করে রাত অতিবাহিত করেছে। প্রভাতে তাদের চেহারা শুকর ও বানরের চেহারায় পরিণত হয়েছে। (ইগাসাতুল লাহ্‌ফান, প্রথম খন্ড- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রাহঃ))

আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتُ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ-

আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মদ্যপান করবে এবং মদের প্রকৃত নামের পরিবর্তে নতুন ও ভিন্ন নাম রাখবে। তাদের শীর্ষদেশে বাদ্য বাজানো হবে, গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ তা'য়ালা যমীনে তাদেরকে ধ্বসে দিবেন এবং তাদের কতিপয়কে বানর ও শুকর বানিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজাহ্)

হাদীসে বানর ও শুকরের আকৃতির বিষয়টি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মদ আর নৃত্য-গীতে অভ্যস্থ, তাদের ভেতর থেকে মানবীয় সুকোমল প্রবৃত্তি ও লজ্জাশীলতা বিদায় গ্রহণ করে এর স্থলে লজ্জাহীন এক কদর্য প্রবৃত্তির সৃষ্টি হবে। শুকর ও বানর পশুশ্রেণীভুক্ত প্রাণী। যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও বন্ধন পরিহার করে স্বেচ্ছামূলক নীতি অবলম্বনে পশু অভ্যস্থ। পশুর মধ্যে বানর প্রজাতিভুক্ত প্রাণীগুলোই সবথেকে বেশী উচ্ছৃংখল। আর অন্যান্য পশুর তুলনায় শুকর এমন এক নির্লজ্জ ও নোংরা প্রাণী যে, এরা নোংরা পুতি-গন্ধময় স্থানই অধিক পছন্দ করে। একটি স্ত্রী লিঙ্গের শুকরকে একই সময়ে অনেকগুলো পুং লিঙ্গের শুকর ভোগ করে। অর্থাৎ নোংরামী, নির্লজ্জতা আর উচ্ছৃংখলতা এই প্রাণী দুটো স্বভাব।

মদ আর নৃত্য-গীতে যারা অভ্যস্থ, তাদের মধ্যে ঐ পশু-সুলভ প্রবণতা কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, তা বর্তমানে টেলিভিশন ও ডিস-এ্যান্টিনার যুগে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। আখিরাতে অবিশ্বাসী কল্প-কাহিনী রচিয়তা, গীতিকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, চলচিত্রকার ও খেলোয়াড়, মদপানে অভ্যস্থ ও মদের ব্যবসায়ীদের জীবনধারার দিকে দৃষ্টি দিলেই অনুভব করা যায়, এসব নারী-পুরুষ ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রথাগত কোনো নিয়ম-নীতি বা প্রথায় বিশ্বাস করে না। প্রয়োজনে এরা অসংখ্য মানুষের সম্মুখে নিজের লজ্জাস্থান অনাবৃত করতে পারে, প্রকাশ্যে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে, যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে কেনো ধরনের সীমারেখায় বিশ্বাস করে

www.pathagar.com

না, পোষাক ও আচরণে ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই, এরা দেহের যত্র-তত্র উল্কি এঁকে বা ছিদ্র করে অলঙ্কার ব্যবহার করে, এক কথায় লজ্জাশীলতার শেষ অনুভূতিটুকুও এদের ভেতর থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

এদের কাছে ভদ্রতা, সভ্যতা, লজ্জাশীলতা, মার্জিত রুচি ও আচার-আচরণ, পোষাকের শালীনতা ইত্যাদি হলো সেকেলে ও উপহাসের বিষয়। এসব লোকজনের অধিকাংশই দাম্পত্য জীবনে একজন সঙ্গীতে সন্তুষ্ট নয়। দাম্পত্য সঙ্গী তথা স্ত্রী বা স্বামী হলো এদের কাছে দেহের পোষাকের মতই- যা সতত পরিবর্তন যোগ্য। এ ক্ষেত্রে সঙ্গীর বয়স, ধর্ম বা আদর্শ কি তা দেখার বিষয় নয়। এই শ্রেণীর লোকদের দাম্পত্য জীবন খুব কমই স্থায়ী হয়। তালাকের আধিক্য এদের মধ্যে সবথেকে বেশী। এরা আকৃতিতে মানুষ কিন্তু এদের স্বভাব নিকৃষ্ট পশুর অনুরূপ। এ কারণেই এদেরকে হাদীসে বানর ও শুকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আত্ম-সমাহিত করার উপকরণ

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, গান ও বাদ্যযন্ত্র হলো শয়তানের হাতিয়ার। নৃত্য-গীত, অশ্লীল ছায়াছবি ও অর্থহীন কল্প-কাহিনী এবং উপন্যাসের প্রেমিক যারা, তারা শয়তানী শক্তির কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। শয়তানী শক্তির মধ্যেই তারা থাকে আত্ম-সমাহিত। এরা মহাসত্য তথা কোরআনকে ত্যাগ করে, কোরআনের কথা তথা ইসলামের বিধান এদের কাছে অসহ্য। এই পৃথিবীর জীবনকেই এরা একমাত্র জীবন বলে মনে করে এবং জীবনকে কানায় কানায় পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

আখিরাতে অবিশ্বাসী একজন কল্প-কাহিনী রচয়িতা, কবি, সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও গায়ক-গায়িকা যেমন কোনো ধরনের নিয়ম-নীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এমন কথা-কাহিনী ও দৃশ্যের অবতারণা করে, যা পাঠ করলে বা দেখলে মানুষের মধ্যে পশু-সুলভ প্রবণতার উদ্রেক হয়, যৌন কামনা-বাসনা সীমা লংঘন করতে পারে, মানুষ বাস্তবতা বর্জিত কল্পলোকে বিচরণ করতে পারে। এসব ব্যাপারে তারা যেমন সচেতনতার পরিচয় দেয় না, অনুরূপভাবে পাঠক, দর্শক-শ্রোতাও সচেতনতার পরিচয় দিতে পারে না। অর্থাৎ এই উভয় শ্রেণীই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকে এবং নিজের অজান্তেই মহাসত্যের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে ধ্বংস গহ্বরের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হতে থাকে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কোন্ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি বাধা সৃষ্টি করার জন্য এবং মানুষ যেন কোনোক্রমেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছে সফলতা অর্জন করতে না পারে, এ জন্য শয়তান তার মুরীদদের মাধ্যমে নানা ধরনের উপকরণ সৃষ্টি করেছে। এসব উপকরণকেই পবিত্র কোরআনের সূরা লুকমানের ষষ্ঠ আয়াতে لهو الحديث

www.pathagar.com

'লাহওয়াল হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই শব্দটি উল্লেখ করেই ليضل عن سبيل الله শব্দসমূহ ব্যবহার করেছেন। এই 'লিইউদিল্লা আ'ন ছাবিলিল্লাহ' শব্দসমূহের অর্থ হলো, আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তান ও তার মুরীদরা যতগুলো মাধ্যমের আবিষ্কার করেছে, তাহলো– মদ-জুয়া, নানা ধরনের খেলাধুলা। গান-বাজনা ও নৃত্য-গীত। কল্পকাহিনী, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। এসব জিনিসের ক্ষতিকর দিক মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য পরিবর্তিত নাম দেয়া হয়েছে সংস্কৃতি বা আর্ট। নৃত্য-গীত তথা গান-বাজনা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখার সবথেকে বড় হাতিয়ার। আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গান মানুষকে আত্মভোলা, উদাসীন ও আত্ম-সমাহিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

অশ্লীল গান, মনোমুগ্ধকর বাজনা এবং অশালীন নৃত্য মানুষকে কামনা তাড়িত করে যিনা, ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর করায়। শ্রোতার দেহের পরতে পরতে যৌন উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয়। ধর্ষনের মতো মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে অশ্লীল গান আর নগ্ন নৃত্য সবথেকে বড় ভূমিকা পালন করে। গান-বাজনা মানুষের মন-মস্তিষ্কের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতার পথ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার মতো চেতনাই থাকে না।

গান-বাজনা ও নগ্ন নৃত্যের প্রেমিক যারা– তারা শুধু এর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। ক্রমশ নিষিদ্ধ পানীয়ের প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মদ এমন সব উপাদানে প্রস্তুত করা হয়, যা পান করলে মানব দেহে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। মানুষের আদিম রিপু উস্কে দেয়। ফলে মদ্যপ ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে অসংলগ্ন কথা বলে এবং নিজের কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যে কোনো নারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মানুষকে মাদকাসক্ত করে মহান আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য একশ্রেণীর লোকজন মদের নাম পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে ওষুধের নামে এমন সব নেশা উদ্রেককারী উপকরণ প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা মানব দেহে মদের মতই ক্রিয়া করে থাকে।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ করা হয়েছে সঙ্কীর্ণ। মাত্র কিছু দিন পূর্বেও দশ সদস্যের পরিবারের প্রধান একা উপার্জন করে সকলের চাহিদা পূরণ করতো এবং অর্থ-সম্পদও সঞ্চয় করতো। বর্তমানে সকলে মিলে গলদঘর্ম হয়ে উপার্জন করেও যার যার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। জীবিকা অর্জনের জন্য চরম পরিশ্রম করার পরে যে অবসর সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, তা মহাসত্য জানার জন্য ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের কাজে ব্যয় করবে, সে সুযোগও রাখা হয়নি। এই অবসর সময়টুকুও মানুষ যেন অপচয় করতে বাধ্য হয়, এ জন্য নানা ধরনের চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস, লটারী-জুয়া, খেলাধূলা ও খেলার উপকরণ আবিষ্কার করে এর মধ্যে মানুষকে সমাহিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যান্য খেলাধূলার কথা বাদ দিয়ে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার দিকেই দৃষ্টি দেয়া যাক। এই খেলা দুটোর প্রতি সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব

www.pathagar.com

খেলাকে কেন্দ্র করে মানুষ অকাতরে অর্থ ও মূল্যবান সময়ের অপচয় যেমন করছে, তেমনি একে অপরের প্রাণহরণ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ দিন মজুর শ্রেণীও উপার্জনের চিন্তা বাদ দিয়ে খেলা দেখায় মগ্ন হয়ে পড়ে। ছাত্র তার লেখাপড়া নষ্ট করে খেলা দেখায় বিভোর হয়ে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অবহেলা প্রদর্শন করে। খেলার আয়োজক, খেলোয়াড় ও দর্শক এমনভাবে খেলায় মগ্ন হয়ে পড়ে যে, নামাযের সময় কখন শেষ হয়ে যায় এদের চেতনাই থাকে না।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী অমুসলিমদের আবিষ্কৃত সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের নামে নানা উপকরণের মধ্যে নিজেদেরকে এমনভাবে বিভোর রেখেছে যে, তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার মতো অবকাশই যেন নেই। সে কে? কোত্থেকে সে এসেছে? কে তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে? এই পৃথিবীতে তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি? যিনি তাকে পাঠিয়েছেন, সেই মহান স্রষ্টার পরিচয় কি? সেই স্রষ্টার প্রতি তার কি কোনো দায়িত্ব রয়েছে? দায়িত্ব থেকে থাকলে তা পালন করার পদ্ধতি কি?

এসব মৌলিক প্রশ্ন যেন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে জাগ্রত হতে না পারে, এ জন্য সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের অসংখ্য উপকরণ সরবরাহ করে মুসলমানদের এক ধ্বংসকারী নেশায় বিভোর রাখা হয়েছে। মুসলিম নামে পরিচিত যুবক যে মুহূর্তে খেলা দেখায় মগ্ন রয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে অগণিত মুসলিম মা, বোন, ভাই অমুসলিমদের অস্ত্রের নির্মম আঘাতে আর্তচিৎকার করছে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের করুণ আর্তনাদ যেন আরেক মুসলমানের কানে পৌঁছতে না পারে, আর পৌঁছলেও তার মনে সামান্যতম করুণার উদ্রেক করতে না পারে, এ জন্যই চিত্তবিনোদনের নানা উপকরণে তাকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এসবই হলো ন্যায়-ইনসাফ তথা মহাসত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শয়তানী কৌশল।

সময়ের মূল্য দিতে শেখা ও সময়ের মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে যে মুসলমানদেরকে যথাসময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেই মুসলমানই বর্তমানে শয়তানী শক্তির আবিষ্কৃত নানা উপকরণে নিজেদেরকে নিমজ্জিত রেখে সবথেকে বেশী সময়ের অপচয় করছে। এদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, এদের যেন করার মতো কোনো কাজই আর অবশিষ্ট নেই। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) দুঃখ করে বলেছেন–

وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے

نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

ওয়াক্তে ফুরসত হায় কাহাঁ, কাম আভী বাকী হায়

নূরে তাওহীদ কা ইতমাম আভী বাকী হায়।

এখনো তোমার অনেক কাজ অবশিষ্ট রয়েছে, তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করবে এই অবসর তোমার কোথায়? গোটা পৃথিবী ব্যাপী তাওহীদের নূর তোমাকেই প্রজ্জ্বলিত করতে হবে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর দুর্বল দেশকে শোষণ করে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করে। এই ঘৃণ্য কর্মকান্ড পরিচালনার সময় নিজের দেশের বিবেকবান জনতা যেন প্রতিবাদ না করে, এ জন্য নিজের দেশের জনগণকেও তারা প্রকৃত সত্য জানতে না দিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখে। যে মুহূর্তে আফগানিস্থান ও ইরাকের ওপর দস্যু-তস্করের মতোই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঠুনকো অজুহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অগণিত মজলুম মানুষের রক্তস্রোত প্রবাহিত করছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিজের দেশের জনগণকে চিত্তবিনোদনের নামে নানা উপায়-উপকরণ দিয়ে এমনভাবে মগ্ন রেখেছে যে, তারা চিন্তা করার মতো অবসরই পাচ্ছে না, কেনো তাদের দেশের শাসক গোষ্ঠী দুর্বল একটি দেশে সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে।

কারণ চিন্তা করার অবসর পেলে তারা প্রকৃত সত্য জেনে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে বা শাসক গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী থাবা গুটিয়ে নিতে বাধ্য করবে। অবাক করার মতোই বিষয় হলো, আমেরিকা-বৃটেন যখন আফগানিস্থান ও ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশ দুটো ধ্বংস স্তুপে পরিণত করলো, তখন পর্যন্ত সে দেশের অনেক মানুষই জানে না, বিশ্বের মানচিত্রে ইরাক বা আফগানিস্থান নামে কোনো দেশ রয়েছে। এ জন্যই শয়তানী শক্তি চিরকাল সাধারণ মানুষকে এমন সব অর্থহীন কাজে মগ্ন রেখেছে, তারা যেন প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানার সুযোগ না পায়।

শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে ভিডিও এবং টিভি গেম-বা কার্টুন আবিষ্কার করে দেশে দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং ডিস এ্যান্টিনার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এসব কার্টুন, ভিডিও ও টিভি গেম- যার অধিকাংশই যৌনতা ও সন্ত্রাস নির্ভর। এগুলোর প্রতি শিশু-কিশোররা এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যে, তারা শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিত না হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিডিও-টিভি গেম খেলায় মগ্ন থাকে।

একদিকে তারা অপরিণত বয়সে যৌনতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠছে, অপরদিকে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী প্রবণতার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থহীন এসব খেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে চিন্তা-গবেষণা করার স্বাভাবিক প্রবণতা হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে নানা উপকরণের মাধ্যমে মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। শয়তানী শক্তির লক্ষ্য একটিই- আর তাহলো মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে মহাসত্যের সন্ধান লাভ করতে না পারে।

www.pathagar.com

গান-খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের সীমারেখা

চলচ্চিত্র, নাটক, গান, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস এ্যন্টিনা-ইত্যাদি হলো ছুরির মতো। চিকিৎসক ছুরি ব্যবহার করে রোগীর সুস্থতার লক্ষ্যে। আর দুষ্কৃতিকারী ছুরি ব্যবহার করে মানুষের প্রাণহরণ করার লক্ষ্যে। যেসব মানুষ ঈমানদার তথা যাদের মনে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত রয়েছে, তাদের মধ্যে যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, কবিতা রচনা করে, উপন্যাস লেখে, সাহিত্যিক হয়, প্রচার মাধ্যমের অনুষ্ঠানমালা প্রস্তুত করে, তারা এসব মাধ্যমকে মানুষের চরিত্র গঠন, মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি, সমাজ ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে ব্যবহার করে থাকে।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এসব মাধ্যম বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে যাদের হাতে, তাদের অধিকাংশই আল্লাহ তা'য়ালা, রাসূল ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন, ইসলাম বিদ্বেষী এবং অনেকেই স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। ফলে এসব ব্যক্তিবর্গ যা কিছুই নির্মাণ বা রচনা করছে, তা জাতীয় চরিত্র বিধ্বংস করার লক্ষ্যেই করছে।

সুতরাং চলচ্চিত্র, নাটক, গান, কবিতা, উপন্যাস-সাহিত্য বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যম স্বয়ং কোনো খারাপ জিনিস নয়। এগুলো ভালো বা খারাপ উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যায়। প্রচার বা গণমাধ্যম মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরতের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলো প্রচারের সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। এই মাধ্যম যদি অন্যায়-অশ্লীল ও নোংরা কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ন্যায় ও কল্যাণের কাজে কেনো তা ব্যবহার করা যাবে না? প্রচারের উপায়-উপকরণ ও যন্ত্রের নিজস্ব কোনো দোষ নেই। দোষী তারাই যারা এসব মাধ্যমকে অন্যায় পথে ব্যবহার করছে। এসব মাধ্যমে যখন খারাপ কর্মসূচী দেয়া হয়, তাহলে তা নোংরামী ও অশ্লীলতার সেবা করা হবে আর গঠনমূলক ভালো কর্মসূচী দিলে কল্যাণ ও উত্তম কাজের সেবা করা হবে।

গানের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গী হলো, যেসব গানের মধ্য দিয়ে নির্লজ্জতা, উচ্ছৃংখলতা, যৌনতা ছড়ানো হয়, হারাম কাজের প্রশংসা করা হয়, ইসলামের বিপরীত পথ-মত, নীতি, আদর্শের প্রশংসা করা হয়, যে গানের ভাষা-ভাব কুৎসিত, নোংরা বা যা পাপ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে, অন্যায়ের দিকে উদ্বুদ্ধ করে, শিরকের গন্ধ রয়েছে এবং আল্লাহর প্রশংসা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বস্তুর প্রশংসা রয়েছে, তা অবশ্যই হারাম।

গান হতে হবে নির্দোষ, যে গান শুনলে মনে আল্লাহ ও পরকালভীতি সৃষ্টি হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, আল্লাহর বিধান অনুসরণে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাবে, মৃত্যুভয় জাগবে, ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে, ধৈর্য্য-সংযম, ত্যাগ-তিতীক্ষা, মানব সেবা ইত্যাদি সর্বোত্তম গুণাবলী অর্জনের অনুপ্রেরণা যোগাবে, এই ধরনের গান শোনা যেতে পারে। গানের কথাগুলো যদি ভালো হয় এবং ইসলামী ভাবধারার বিপরীত না হয়, তাহলে তা শোনায় বাধা-নিষেধ নেই। কিন্তু এসব গান শোনায় তখনই বাধা-নিষেধের প্রশ্ন আসবে, যখন তা বৈধতার সীমা অতিক্রম করবে।

www.pathagar.com

যেমন গানের কথাগুলো ভালো, কিন্তু গায়কের গাওয়ার ভঙ্গি নির্লজ্জতা উদ্দীপক এবং শ্রোতাদের মনে উত্তেজনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। গানের কথা নির্দোষ হলেও তখন তা শোনা যাবে না। কারণ ইসলাম কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ প্রশ্রয় দেয় না। যে গান শুনলে হৃদয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, মন-মানসিকতায় অবৈধ উত্তেজনার জন্ম নেয় এবং মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে, মনে পাশবিক ভাবের সৃষ্টি হয়, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে ছিদ্রপথে পদস্খলনের বাতাস প্রবেশ করতে পারে, ইসলাম সে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেয়।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, বাদ্যযন্ত্র হলো এমন জিনিস, যার বাজনায় মানুষের হৃদয়-মনে একদিকে যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা-উচ্ছৃঙ্খলতা ও গভীর আবেশের সৃষ্টি হয়, অপরদিকে ভীতিরও সৃষ্টি হয়। এসব অবস্থা সৃষ্টি নির্ভর করে বাদ্যযন্ত্রের ধরণ ও বাদকের কৌশলের ওপর। সৈন্যবাহিনী যখন কুচকাওয়াজ করে, তখন এমন ধরনের বাদ্য ব্যবহার করা হয় যে, তা সৈনিকদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পূর্বে যুদ্ধের ময়দানে এমন ধরনের বাদ্য ব্যবহার করা হতো, যা সৈনিকদের মনে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো, তেমিন প্রতিপক্ষের মনেও ভীতির সৃষ্টি করতো।

বিশেষ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে, যাকে দফ বলা হয়। এটি এক মুখ খোলা বিশিষ্ট ঢোল বিশেষ। এর আওয়াজে উচ্ছৃঙ্খলতা, মুর্ছনার আবেশ, আত্ম-সমাহিত হওয়ার ভাব বা অবৈধ উত্তেজনার কিছুই নেই। আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে এসব ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। এ কারণেই ইসলাম শুধুমাত্র দফ নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, সে যুগে একমাত্র দফ ব্যতীত অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি বিধায় ইসলাম অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি– বর্তমানের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি থাকলে ইসলাম তা ব্যবহারের অবশ্যই অনুমতি দিতো এবং বর্তমানে দফ-এর বিভিন্ন উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরবের ইতিহাস বা তদানীন্তন পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিই এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, সে যুগে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র ছিলো এবং তাদের কবিতা-সাহিত্যে অগণিত বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাদের রচিত কবিতা-সাহিত্য বর্তমানেও অনেকগুলো ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে। মনে রাখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।' বর্তমানে দফ-এর বিভিন্ন উন্নত সংস্করণ যারা ব্যবহার বৈধ বলে মনে করেন, তাদের এ কথা জানা উচিত যে, নবীজী ঐ দফ নামক বাদ্য ব্যবহারের অনুমতিও সকল ক্ষেত্রে দেননি। শুধুমাত্র বিয়ে ও ঈদ উপলক্ষ্যে এর ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে আর এটাই হলো চূড়ান্ত সীমা। এর বাইরে কারো জন্যে এটা ব্যবহার করা বৈধ নয়। এই চূড়ান্ত সীমাকে যারা 'সূচনা বিন্দু' বানাতে চান, হয় তারা অজ্ঞতার কারণেই এমন করতে চান অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করতে চান।

www.pathagar.com

ইসলাম মানুষকে শুষ্ক-নিরস রাখতে চায় না। ইসলামী জীবন বিধান শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় নয় বা এই বিধান মানুষকে অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও নানা ধরনের অলীক চিন্তা-চেতনার কুহেলিকায় আবদ্ধ রাখে না। বরং বাস্তবতায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে মানসিক প্রশান্তিসহ আনন্দ চিত্তে বসবাস করার স্থায়ী নীতির প্রবর্তন করেছে আল্লাহর বিধান এবং এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য নবী হিসেবে কোনো ফেরেশ্তাকে প্রেরণ করেননি। কারণ মানুষ এবং ফেরেশ্তার স্বভাব-চরিত্রে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এ জন্যই মানুষের মধ্য থেকেই আরেকজন মানুষকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, নবী যেন মানুষের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে।

মানুষের স্বভাব-চরিত্রে সৃষ্টিগতভাবে যেসব উপাদান রয়েছে, নবী-বা রাসূলের স্বভাব-চরিত্রেও তা-ই রয়েছে। ফেরেশ্তাগণ সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে যা করছে, মানুষের প্রতি সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি বা এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতাও মানুষের প্রতি আরোপ করা হয়নি। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহর বিধান মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত ভাবধারার প্রতি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। খাদ্য গ্রহণ তথা পানাহার যেমন মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদা, অনুরূপভাবে আনন্দ, উল্লাস, সন্তুষ্টি, উৎফল্লতা বা হাসি-কৌতুক ও খেলাধুলাও মানব প্রকৃতির ভাবধারা।

আল্লাহর রাসূলের কোনো কোনো সাহাবী সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত নামায-রোযা বা কোরআন তিলাওয়াতে ব্যয় করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁরা জাগতিক স্বার্থ, আনন্দ, উল্লাস বা হাসি-কৌতুক পরিহার করে চলা ভালো মনে করতেন। হযরত হানযালা উসাইদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি জানালেন যে, তিনি বোধহয় মুনাফিক হয়ে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর এর কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে, আল্লাহর নবীর কাছে থাকলে হৃদয়-মন সর্ব সময় আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের ভাবধারায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু যখনই আল্লাহর নবীর সাহচর্য থেকে দূরে সরে যান, তখন তাঁর মনে জাগতিক বিষয়াদি এসে ভীড় জমায়।

হযরত হানযালার কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও জানালেন যে, তাঁর মনের অবস্থাও অনুরূপই হয়। এরপর তাঁরা উভয়ে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। তাঁদের কথা শুনে আল্লাহর নবী বললেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنْ لَوْتَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِلَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى فَرْشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَكَرَّرَهٰذِهِ الْكَلِمَةَ سَاعَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ–

www.pathagar.com

যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ– তাঁর নামে শপথ! তোমরা আমার কাছে এবং আল্লাহর স্মরণের মধ্যে যে অবস্থা ও ভাবধারা অনুভব করো, এই অবস্থার মধ্যে যদি তোমরা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে থাকতে তাহলে আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ এসে তোমাদের বিছানায় ও পথে করমর্দন করতো। কিন্তু হে হানযালা! সময়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত একই অবস্থায় থাকা যায় না। (বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর নবী এই কথাটি তিনবার বলেছেন, মুসলিম)

মনে রাখতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয়। তিনি মহান আল্লাহকে সবথেকে বেশী ভয় করতেন, আখিরাতের চিন্তা সকলের তুলনায় বেশী করতেন, নিবিড় একাকীত্বে নামায আদায় করতেন, নামাযে দীর্ঘক্ষণ তিনি সিজ্‌দায় থেকে বিনয় ও ভীতি সহকারে কাঁদতেন। আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ধারায় তাঁর পবিত্র দাড়ি মুবারক সিক্ত হয়ে যেতো।

শামায়েলে তিরমিযীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাখীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'আমি একদিন আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম, তখন তিনি নামাযে ছিলেন। নামাযরত অবস্থায় তিনি এমনভাবে কাঁদছিলেন যে, তাঁর পবিত্র বক্ষ মুবারক থেকে উনুনে পাত্রের ভেতর থেকে কিছু ফুটে উঠলে যেমন শব্দ হয়, অনুরূপ শব্দ হচ্ছিলো।' নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পবিত্র পা মোবারক ফুলে উঠতো। এরপরও তিনি মানবীয় স্বভাব ধারায় জীবন-যাপন করতেন। হাসি-কৌতুক করতেন কিন্তু তাঁর হাসি-কৌতুক সত্যের বিপরীত ছিলো না।

প্রত্যেক মানুষেরই কান দুটো। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শিশু বয়স থেকেই আল্লাহর নবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুক করে তাঁকে ডাকতেন– হে দুই কানওয়ালা!

হাদীসের কিতাবসমূহে আল্লাহর রাসূলের অন্তরঙ্গ জীবনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নির্দোষ কৌতুক করতেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর খেদমতে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন! নবীজী বললেন, অবশ্যই কিন্তু আমি কখনো ভুল কথা বলি না।' অর্থাৎ নবীজীর কৌতুক ছিলো সত্যাশ্রয়ী- তা কখনো সত্যের বিপরীত হতো না।

আবু দাউদ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হাসি-খুশী ও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকা পছন্দ করতেন এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ–

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি দুশ্চিন্তা ও দুঃখানুভূতি থেকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র সাহাবায়ে কেরাম সত্যাশ্রয়ী হাসি-কৌতুক করতেন, মানব স্বভাবে যে প্রকৃতি নিহিত রয়েছে, তার নির্দোষ ডাকে সাড়া

www.pathagar.com

দিতেন। নিজেদের মন-মানসিকতায় আনন্দ দিতেন, হৃদয়ের প্রশান্তির ব্যবস্থা করতেন এবং এর মাধ্যমে নতুন উদ্যম ও কর্মক্ষমতা লাভ করতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, দেহের মতো মনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য আশ্চর্য ও বুদ্ধি দীপ্ত কথাবার্তা বলো। হৃদয়কে কিছু সময়ের জন্য সুখ-শান্তি ও আনন্দ দান করো। কারণ হৃদয়ের অস্বস্তি হৃদয়কে অন্ধ বানিয়ে দেয়।'

এ জন্য সত্যাশ্রয়ী নির্দোষ কৌতুকের মাধ্যমে মন থেকে যদি বোঝা নেমে যায়, এতে দোষের কিছু নেই। বৈধ কৌতুক ও খেলাধূলার মাধ্যমে যদি নিজের মন ও সঙ্গী-সাথীদের সান্ত্বনা বা মানসিক প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো।

কিন্তু এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এসব যেন স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত না হয় এবং সর্বক্ষণ শুধু এসব কৌতুক আর খেলার মধ্যেই নিমগ্ন থাকার প্রবণতা সৃষ্টি না হয়। কারণ চরিত্রে একবার এই অভ্যাস সৃষ্টি হলে তা দূর করা যেমন কঠিন, তেমনি অন্যান্য দায়িত্ব পালনে তা বাধার সৃষ্টি করে। এমনকি যেখানে গাম্ভীর্য প্রদর্শন একান্ত জরুরী, সেখানেও হাস্য-কৌতুকের অবতারণা হবে। খাদ্য দ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ হলে যেমন তা খাবার অনুপযোগী থাকে না, তেমনি কথাবার্তায় মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা কথার গুরুত্ব হ্রাস করে। স্মরণে রাখতে হবে, মানুষের মনে প্রশান্তি আনার জন্যে বা মানুষকে হাসানোর লক্ষ্যে মিথ্যা কাহিনী বা ঘটনার অথবা অশালীন কথার অবতারণা করা যাবে না। নবীজী বলেছেন-

وَيْلٌ لِّلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ مِنْهُ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ-وَيْلٌ لَّهُ-وَيْلٌ لَّهُ-

ধ্বংস তার জন্যে, যে মানুষকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে ধ্বংস, তার জন্যে ধ্বংস। (তিরমিযী)

নির্মল-নির্দোষ আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও খেলার বিভিন্ন ধরন এমন রয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্যে বৈধ করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে মুসলমান যেন আনন্দ লাভ করতে পারে এবং মনের বোঝা হালকা করতে পারে। এসব খেলা শরীর চর্চামূলক, শক্তিবর্ধক এবং তা ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণও বটে। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা দৌড় প্রতিযোগিতায় সবথেকে বেশী গতিসম্পন্ন দৌড়বিদ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

হযরত আশিয়া যখন হালকা-পাতলা ছিলেন, দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি আল্লাহর রাসূলের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলেন। বেশ কিছু দিন পরের ঘটনা, মা আয়িশা ইতোমধ্যে বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী এবং তাঁর শরীরও ভারী হয়ে উঠেছে। দৌড় প্রতিযোগিতা হলো, আল্লাহর নবী হযরত আয়িশাকে সেবার হারিয়ে দিয়ে বললেন, এবার সেবারের বদলা নিলাম। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বিখ্যাত কুস্তিগীর রুকানা নামক ব্যক্তির সাথে লড়াই করে তাকে কয়েকবার ভূলুণ্ঠিত করেছেন– পরাজিত করেছেন। (আবু দাউদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের তীর নিক্ষেপ করা দেখে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করো, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। (বোখারী)

দুইটি প্রাণীর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে আনন্দ অনুভব করা বা হাতের নিশানা ঠিক করার জন্য কোনো প্রাণীকে লক্ষ্য স্থির করা জায়েয নেই। বরং এর মধ্যে হিংস্রতা ও নির্দয়ের ভাবধারা রয়েছে। নির্দোষ-নির্মল খেলাধূলা অবশ্যই বৈধ। যেমন ভার উত্তোলন, নিশানা ঠিক করা, তীর-বল্লম নিক্ষেপ করা, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ঘোড়াকে দ্রুত গতিতে চালানো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– তোমাদের সন্তানদের সাঁতার কাটা ও তীর নিক্ষেপণের প্রশিক্ষণ দাও। ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে শক্তভাবে বসতে তাদেরকে অভ্যস্থ করো। (মুসলিম)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে বন্দুক চালানো বা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রযান চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাড মিন্টন, হকি, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কৌশল, সাঁতার, গাছে চড়া ইত্যাদির প্রশিক্ষণ ও খেলা করা যেতে পারে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে আল্লাহর বিধান লংঘিত হচ্ছে কিনা, দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা অনীহা দেখা দিচ্ছে কিনা বা কোনো ছিদ্রপথে অকল্যাণ প্রবেশ করছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। খেলার মধ্যে কোনো ধরনের জুয়ার গন্ধ দেখা দিলে বৈধ খেলাও তখন নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। নারী-পুরুষ পরস্পরকে প্রতিযোগী করে কোনো খেলার আয়োজন করা যাবে না। নারী-পুরুষ একত্রে খেলতেও পারবে না। নারীর খেলাধূলা পুরুষকে দেখতে দেয়া যাবে না। নারীর খেলার দর্শক হবে একমাত্র নারী।

বৈধ খেলাধূলার ক্ষেত্রে এমন পোষাকও ব্যবহার করা যাবে না, যা লজ্জাস্থান পরিদৃষ্ট হয় বা হাঁটুর উপরের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। খেলার আয়োজক, খেলোয়াড়, দর্শক ও শ্রোতাদেরকে নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। খেলার মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হওয়া যাবে না যে, নামায আদায়ের বিষয়টি স্মরণে থাকবে না। খেলাধূলা যদি মানুষকে মহান আল্লাহ থেকে অমনোযোগী করে দেয়, তাহলে সে ধরনের খেলা প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের প্রত্যেকটি তৎপরতা ও হৃদয়ের স্পন্দন হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

সুতরাং ইসলামী জীবন বিধান আনন্দ-কৌতুক ও খেলাধূলার যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এর বাইরের কোনো কিছু বৈধ নয়। অর্থাৎ আনন্দ-কৌতুক, চিত্তবিনোদন ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না, যে পদ্ধতির মধ্যে মানুষকে মহাসত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

www.pathagar.com

যেনো তাদের কান দুটো বধির

আলোচ্য সূরার ষষ্ঠ আয়াতে মহান আল্লাহর পথ তথা মহাসত্যের পথ থেকে যারা মানুষকে বিচ্যুত করে তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্য এবং বিচ্যুত করার উপকরণ-সামগ্রীর পরিচয় তুলে ধরে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। এরপর সপ্তম আয়াতে এসব লোকদের অবশিষ্ট স্বভাব-পরিচিতি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'এদেরকে যখন আমার আয়াত শোনানো হয় তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়- যেনো তারা তা শুনতেই পায়নি, যেনো তাদের কান দুটো বধির। সুতরাং এদেরকে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।'

সংস্কৃতির নামে যারা মানুষকে নিজের স্রষ্টা, প্রতিপালক, শাসক ও বিধানদাতা সম্পর্কে আত্মভোলা করে রাখার নানা মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যারা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাদেরকে যখন এসব ঘৃণ্য পথ পরিহার করে কোরআন সুন্নাহ্‌র সর্বোত্তম-মার্জিত সংস্কৃতি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়, তখন এরা দম্ভভরে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, 'আমরা কি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকিত সংস্কৃতি পরিহার করে অন্ধকার যুগের সেকেলে সংস্কৃতির অনুসরণ করবো?'

অথবা এরা এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করে যে, মনে হয় যেন মহাসত্যের পথের আহ্বানকারীর আহ্বান এদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করেনি। বর্তমান পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের দিকে যেসব মহৎ প্রাণ ব্যক্তি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, সিডি-ভিসিডি, বক্তৃতা-বিবৃতি, কবিতা সাহিত্যসহ নানা ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষকে মহাসত্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তাঁরা অসংখ্য সাহিত্য রচনা করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই মানুষের কাছে মহাসত্যের আলো সম্বলিত এসব গ্রন্থাবলী পৌঁছে দিচ্ছেন।

কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারী মানুষগুলোর কানে যেন সত্যের আহ্বান প্রবেশ করছে না। তারা এমন ভাব প্রদর্শন করছে, যেন সত্য প্রচারকদের কষ্টকর এসব প্রচেষ্টা হাস্যকর ব্যাপার মাত্র। নিজেদের জীবনকালের মূল্যবান সময় ব্যয় করে এরা ক্ষতিকর-নগণ্য বিষয় নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে, কিন্তু যে জিনিসটি তাদেরকে মহাক্ষতি থেকে হেফাজত করবে, সেই জিনিসটি তাদের কাছে এতই গুরুত্বহীন যে, সেই জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়টুকু যেন তাদের নেই। নানা ধরনের খেলাধূলা, গান-বাজনা, অর্থহীন কবিতা-সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে নিজের জীবনের মহামূল্যবান সময় কোনো ধরনের হিসাব ব্যতীতই ব্যয় করতে এরা প্রস্তুত- কিন্তু যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে মহাসত্যের পথের সন্ধান লাভ করা যাবে এবং জীবন প্রকৃত অর্থেই সফল হবে, সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করার জন্য মুহূর্তকাল তারা ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়।

www.pathagar.com

কারণ দম্ভ আর অহঙ্কার তাদেরকে মহাসত্যের বাণী সম্পর্কে এ কথাই বলে যে, 'ঐসব গুরুত্বহীন সেকেলে বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো প্রয়োজন নেই, ওগুলো অনেক পিছনের বিষয়। ওসবের পেছনে সময় অপচয় করার প্রয়োজন নেই, এখন সময় হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাবার।'

এ জন্যই তারা মহাসত্যের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়না এবং বধির যেমন কেনো শব্দ শুনতে পায় না, তেমনি এরাও আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেও বধিরের মতোই ভূমিকা পালন করে। এ কারণে এসব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'এদেরকে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।'

শাস্তি দেয়া হবে– এটি কোনো সুসংবাদ নয়, বরং ভয়াবহ দুঃসংবাদ। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করার পূর্বে দুঃসংবাদ না বলে সুসংবাদ বলেছেন এই জন্য যে, এসব লোক যেমন মহান আল্লাহর যাবতীয় যাবতীয় নে'মাত ভোগ করেও তাঁর বিধান সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালাও বধিরের অনুরূপ এসব লোকদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক হুমকির ভাষায় বলেছেন, এদেরকে আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

যদি তারা ফিরে আসে

এরপর আলোচ্য সূরার অষ্টম ও নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর অকাট্য অঙ্গীকার এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

যারা কোরআন বুঝতে আগ্রহী এবং কোরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করেন, অধ্যয়ন করার সময় তাদেরকে একটি বিষয়ে অনুসন্ধানী হতে হবে যে, পূর্বের আয়াতে বলা কথার সাথে পরবর্তী আয়াতে বলা কথার যোগসূত্র কোথায়। এই বিষয়টির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে হিদায়াতের এই মহাগ্রন্থ অনুধাবন করা সহজ হবে।

আলোচ্য সূরার ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুতকারী লোকদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হলো, আবার অষ্টম ও নবম আয়াতেই বলা হচ্ছে–'ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে রয়েছে নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত এবং সেই জান্নাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।'– এর কারণ কি?

এর কারণ হলো, কোনো অপরাধীর হৃদয়-মনে যখন এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, আমার দ্বারা যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এর কোনো ক্ষমা নেই। শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। তখন সেই অপরাধীর মধ্যে এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি হয় এবং এই হতাশা অপরাধীকে অপরাধ জগতের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করে।

www.pathagar.com

ক্ষমা যখন মিলবে না– শাস্তি অবধারিত, তখন একটি হত্যা করলেও ফাঁসি হবে একের অধিক হত্যা করলেও ফাঁসির রশি কণ্ঠে ধারণ করতেই হবে। তখন হত্যা মাত্র একটি কেনো– একের অধিকও হত্যা করা যেতে পারে।

অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে– এই মানসিকতাই অপরাধীকে পরবর্তী অপরাধ করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পৃথিবীর আদালতসমূহেও দেখা যায়, কাঠগড়ায় দন্ডায়মান আসামী যদি বিচারকের সম্মুখে নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দেয়, তাহলে বিচারক সদয় হয়ে সাজা হ্রাস করেন। আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করলো কিন্তু উভয় পক্ষের উকিলের যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে যদি বিচারক অনুভব করেন, আসামী প্রকৃতই অপরাধী। বিচারক তখন সদয় না হয়ে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা দিয়ে থাকেন।

অপরাধ করার পরে যারা অনুতপ্ত হয় বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকে, তারা আদালতে অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়ে সাজার মেয়াদ হ্রাস করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। আর অপরাধীর মনে যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে যে, অপরাধের স্বীকৃতি দিলেও যা সাজা হবে, না দিলেও তা-ই সাজা হবে। অপরাধী তখন নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আইনের ফাঁক-ফোকড় গলিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতেও অপরাধের দিকেই পা বাড়ায়।

এ জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অপরাধের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পরপরই আশার বাণী শুনিয়েছেন, ওহে তোমরা যারা অপরাধ করেছো, ভয়ের কোনো কারণ নেই- হতাশ হবারও প্রয়োজন নেই। তোমরা সত্যের পথ থেকে নিজেরা বিচ্যুত ছিলে এবং আমার অন্যান্য বান্দাদেরকেও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার কাজে তৎপর ছিলে। তোমরা যদি নিজেদের ভুল অনুভব করতে পারো এবং ঐ গর্হিত পথ থেকে ফিরে এসে তওবা করে মহাসত্যের পথ গ্রহণ করো, আমার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করো। তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যে জান্নাত নে'মাতে পরিপূর্ণ। সেখানে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ স্বল্প মেয়াদী হবে না– চিরকাল সেখানে তোমরা অবস্থান করবে।

এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করছি, আর আমার ওয়াদা এমন নয় যে, কোনো কারণে তা পালিত হবে না। তোমরা আমার বান্দা, পৃথিবীতে তোমরা পরস্পরের কাছে নানা ওয়াদা করে থাকো। ওয়াদা পালন করার মানসিক দৃঢ়তা থাকার পরও ক্ষেত্র বিশেষে এমন পরিস্থির উদ্ভব হয় যে, তোমরা ওয়াদা রক্ষা করতে সক্ষম হও না। আমার বিষয়টি এমন নয়– আমার ওয়াদা অভ্রান্ত ও অলংঘনীয় এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমি ওয়াদা করে থাকি। আমার ওয়াদা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, আমার ওয়াদা বাস্তবায়নে সেই পরিস্থিতি এসে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সৃষ্টি জগতে এমন কোনো শক্তি নেই যে, আমার ওয়াদা বাস্তবায়নের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

যে ব্যক্তি যে জিনিসের অধিকারী নয়– আমি তাকে তা দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদাও করি না বা আমি ভুল ভিত্তির ওপর ওয়াদাও করি না। আমি মহাপরাক্রমশালী, আমার ওয়াদা অবশ্যই

www.pathagar.com

পালিত হয় এবং অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতেই আমি ওয়াদা করে থাকি। তোমরা যদি ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসো এবং ঈমান এনে আমার বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করো, তাহলে অবশ্যই আমার ওয়াদানুসারে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

সূরা লুকমানের অষ্টম ও নবম আয়াতে মানুষের স্রষ্টা, রব, মালিক, ইলাহ্, বাদ্শাহ যে অসীম ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল, করুণাময়, দয়ালু, অনুগ্রহকারী, ক্ষমাকারী এই বিষয়টিই উল্লেখিত আয়াতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে যাবতীয় নে'মাত দিয়ে তাকে পৃথিবীতে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দিলেন, সেই আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার পরও তিনি সেই বিদ্রোহী বান্দাকে ধ্বংস না করে, তার জীবন ধারনের উপকরণ হ্রাস করে অথবা সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাকে কষ্টে নিক্ষেপ করলেন না। বিদ্রোহী বান্দার মাথায় আকাশ থেকে কোনো আযাব প্রেরণ করলেন না, তার পায়ের নীচের যমীনও ধ্বসিয়ে দিলেন না। বরং বিদ্রোহী বান্দাকে তিনি অবসর দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى-

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সাথে সাথে গ্রেফতার করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। (সূরা আন্ নাহ্ল-৬১)

বান্দা না বুঝে- না জেনে, নফ্স বা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে অন্যায় করেছে। বান্দাকে তিনি অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দিলেন। বিদ্রোহী বান্দার পাপের কারণে মহান আল্লাহর ক্রোধ আল্লাহ তা'য়ালার ওপর প্রভাব বিস্তার করলো না বরং তাঁর রহমতই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করলো। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের রহমত সম্পর্কে বলেন–

قَالَ عَذَابِىْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ-

শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দেই, কিন্তু আমার রহমত সমস্ত জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দেবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। (আ'রাফ-১৫৬)

বান্দা ভুল করেছে, শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার মনে হতাশার উদ্রেক করলেন না। বরং রহমত, ক্ষমা আর অনুগ্রহের ওয়াদা করে বান্দার মনে আশার উদ্রেক করলেন। অবাধ্য সন্তানকে পিতামাতা যেমন গভীর মমতায় বুঝিয়ে থাকেন, 'বাবা! এমন আর করিস না। ভালোভাবে চল, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কর। এবারে যদি পরীক্ষায় ফলাফল

www.pathagar.com

ভালো করতে পারিস তাহলে তোকে অমুক অমুক জিনিস দেবো।' যে আল্লাহ্ পিতামাতার মনে এত করুণার উদ্রেক করলেন, সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কি সীমাহীন- অসীম করুণার অধিকারী!

আহা! আমার আল্লাহর কত দয়া! কত করুণা! তাঁর কি অসীম ধৈর্য্য! বান্দা অপরাধ করেছে তিনি শাস্তি দিলেন না। বান্দার রিয্ক বন্ধ করলেন না। অপরাধ করার সাথে সাথে এমন রোগ দিলেন না যে, বান্দা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। এমন বিপদ দিলেন না যে বান্দা দিশাহারা হয়ে পড়লো।

বরং বান্দাকে অপরাধ থেকে বিরত থাকার সুযোগ দিয়ে সেই বিদ্রোহী বান্দাকে শুনিয়ে দিলেন, তুমি অপরাধ করেছো তো কি হয়েছে? তোমার অপরাধের তুলনায় আমার করুণা অনেক বড়। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। শুধু ক্ষমাই করবো না, তোমাকে আমি নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত দান করবো, তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অপরাধীকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা সুযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। পবিত্র কোরআনে একাধিকবার ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا-اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

আর যারা খারাপ কাজ করার পরে (অনুতপ্ত হয়ে) তওবা করে ও ঈমান আনে, নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আ'রাফ-১৫৩)

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ-وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ-

তোমার রব মানুষের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর এ কথাও সত্য যে, তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আর রা'দ-৬)

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ-لَاۤاِلٰهَ اِلَّا هُوَ-

আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, গোনাহ্ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং দয়ালু, তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের আর কেউ অধিকারী নেই। (সূরা আল মুমিন-৩)

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ-

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। (সূরা আশ্ শূরা-২৫)

www.pathagar.com

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا-عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ-اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ-

আরো কিছু লোক এমন আছে, যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের, কিছু ভালো কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহশীল হবেন–কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আত্ তাওবা-১০২)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ–যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের দান কবুল করেন, আর প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (তাওবা-১০৪)

আকাশ রয়েছে শূন্যমার্গে

আলোচ্য সূরার সপ্তম, অষ্টম ও নবম আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখুন, সেখানে বলা হয়েছে– এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতার ধারণা ছাড়াই মানুষকে অর্থহীন-মনোমুগ্ধকর বিষয়ের সাথে জড়িত করে মহান আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। এসব লোকদের যখন মহাসত্যের পথে আহ্বান জানানো হয়, তখন তারা দর্প-অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের জন্যে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। ভুল পথের পথিক এসব লোক যদি নিজেদের গর্হিত কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে, তাহলে তাদের জন্যে ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে এবং বিনিময় হিসেবে তারা জান্নাত লাভ করবে– এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা।

নবম আয়াতের শেষের দিকে দৃষ্টি দিন, সেখানে বলা হয়েছে– 'তিনি পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানময়।'– পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় শব্দ দুটো কেনো ব্যবহার করা হলো?

এর জবাব হলো, যে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে একশ্রেণীর লোকজন সত্য পথ থেকে বিচ্যুতকারী নানা ধরনের মাধ্যম আবিষ্কার করেছে, সেই আল্লাহর ব্যাপক পরিচিতির সামান্য অংশ নবম আয়াতের শেষের দিকে তুলে ধরা হয়েছে। একশ্রেণীর মানুষ অর্থহীন নানা কিছু আবিষ্কার করে আরেক একশ্রেণীর মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করছে– এই উভয় দলের যিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক, বাদশাহ্, আইনদাতা-বিধানদাতা কত অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী– সেই পরিচয়ের অতিক্ষুদ্র অংশের দিকে ঐ উভয় শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচ্য সূরার দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আকাশসমূহ তোমরা দেখতে পাচ্ছো কোনো স্তম্ভ ব্যতীতই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যমীনের ওপরে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন যেনো তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এরপর সেখানে নানা ধরনের উত্তম বস্তু উৎপন্ন করি।'

www.pathagar.com

স্তম্ভ বিহীন আকাশ, রহস্যে ঘেরা উর্ধ্ব জগৎ, অগণিত জগৎ ও আকাশের সৃষ্টি, কৃষ্ণ গহ্বর, অসংখ্য সূর্য-নক্ষত্র ও নিহারিকা পুঞ্জ, ছায়াপথ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, মহাকাশে পাথরের সাম্রাজ্য, অদৃশ্য ছাতা, অতিবেগুনি রঞ্জনরশ্মিসহ অন্যান্য রশ্মি ও বায়বিয় পদার্থ, মাটি ও মাটির নানা উপাদান, মাটির উর্বরা শক্তি, মাটির নীচের গলিত পদার্থ, পাহাড় ও পাহাড়ের সৃষ্টি কৌশল, মাতৃগর্ভে ভ্রুণের বিকাশ, প্রত্যেক জীবের সৃষ্টি ও তার স্বভাব-প্রকৃতি, পানি ও পানির উপাদান, পৃথিবীতে পানির পরিমাণ, সাগর-মহাসাগরের সৃষ্টি কৌশল, মিষ্ট ও লবণাক্ত পানি, মাটির সাথে পানির মিশ্রণে কিভাবে উদ্ভিদ সৃষ্টি হচ্ছে, এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও তার ধ্বংস ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমরা তাফসীরে সাঈদী সূরা ফাতিহার তাফসীরের ১৩৭ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৭ পৃষ্ঠা, ২৫৬ পৃষ্ঠা থেকে ২৭০ পৃষ্ঠা, ৩২৫ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠা, ৪৬৪ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ ছাড়া তাফসীরে সাঈদী আমপারার সূরা আন্ নাবা-এর ৮ নম্বর আয়াত থেকে ১১ নম্বর আয়াত, সূরা আত্ তাকভীরের ১ ও ২ নম্বর আয়াত, সূরা আল ইনফিতারের ১ ও ২ নম্বর এবং ৭ ও ৮ নম্বর আয়াত, সূরা আল ইনশিকাকের ১ থেকে ৫ নম্বর আয়াত, সূরা আত্ তারেকের ১ থেকে ৭ নম্বর আয়াত, সূরা আল আ'লার ২ থেকে ৫ নম্বর আয়াত, সূরা আশ্ শামসের ১ থেকে ৮ নম্বর আয়াত, সূরা আল লাইলের ১ থেকে ৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ ছাড়া আমার রচিত 'আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান' নামক একটি স্বতন্ত্র বই রয়েছে।

এই আলোচনা পাঠ করলে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা কি অসীম শক্তির অধিকারী, তাঁর সৃষ্টিসমূহ কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করছে, কিভাবে এই বিশাল সৃষ্টি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে, অবর্ণনীয় বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন। সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতা, সৃষ্টি কৌশল, প্রতিপালনের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'এসবই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এবার আমাকে দেখাও তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে মা'বুদ বানাচ্ছো তারা কি সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই জালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।'

সত্যের পথ থেকে যারা নিজেরা বিচ্যুত এবং অন্যকেও নানা অর্থহীন ও মনোমুগ্ধকর মাধ্যমের দিকে আকৃষ্ট করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে আত্মভোলা, অমনোযোগী, আত্ম-সমাহিত করে রাখার ব্যবস্থা করছে, তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার অবকাশ দিয়ে বলা হচ্ছে, যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো এবং নিজেকেই প্রশ্ন করো, কোন্ শক্তি এসব জটিল সৃষ্টি কার্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমাপ্ত করেছেন এবং পরিচালনা করছেন?

সৃষ্টি ও প্রতিপালনের এসব বৈজ্ঞানিক জটিলতা দেখে তোমাদের কি মনে হয়, ঐ মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার প্রতি তোমাদের কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই? তিনি কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীতই শুধুমাত্র খেল-তামাশার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করেছেন?

www.pathagar.com

তোমরা ঐ মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর পথ থেকে নিজেরা বিচ্যুত হয়েছো এবং অন্যকেও বিচ্যুত করার লক্ষ্যে তৎপর রয়েছো, এর পেছনে কি কোনো যুক্তি রয়েছে? অবশ্যই কোনো যুক্তি নেই এবং অজ্ঞতার ভিত্তিতেই তোমরা ভ্রান্ত পথে ধাবিত হয়ে নিজেদের প্রতি অন্যায়-অবিচার তথা জুলুম করছো।

ভালো করে দেখো এবং চিন্তা-গবেষণা করো, তোমাদের সৃষ্টি, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন, প্রতিপালন, নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি জগতের যাবতীয় ক্ষতিকর দিক থেকে তোমাদের মুক্ত রাখা ইত্যাদি কাজগুলো কে করছে? তোমাদের নিজ দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, দেখতে পাবে দেহের জটিল বিষয়সমূহ একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে না এবং করার ক্ষমতাও কারো নেই। সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা না তোমার নিজের চোখে পড়বে না ঐ মানুষদের তুমি দেখাতে পারবে– যাদেরকে তুমি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করছো।

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন, তোমার যাবতীয় প্রয়োজন যিনি গভীর আড়ালে থেকে পূরণ করছেন, তুমি চাওয়ার পূর্বেই যিনি দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর প্রতি তুমি স্বয়ং যেমন কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছো না, তেমনি অন্যদেরকেও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বাধার সৃষ্টি করে কি নিজেকে নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট প্রমাণ করছো না?

নিজের ও সৃষ্টি জগতের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার কাছে এ বিষয় লুকায়িত থাকবে না যে, কোন্ শক্তির দাসত্ব করতে হবে এবং প্রকৃত ইলাহ, মা'বুদ তথা আইনদাতা-বিধানদাতা কে। কার নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে, প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণ করতে হবে– এ বিষয় তোমার কাছে গোপন থাকবে না।

সুতরাং প্রকৃত সত্য তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হবার পরেও কেনো তোমরা অন্যের রচিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে? তোমরা যখন নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছো, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ধানের সামান্য একটি খোসাও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়– তাহলে কোন্ যুক্তিতে ঐ আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান অনুসরণ করবে? মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَيَخْلُقُ-اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ-وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَتُحْصُوْهَا-

তাহলে ভেবে দেখো তো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি সজাগ-সচেতন হবে না? যদি তোমরা আল্লাহর নে'মাত গণনা করতে চাও তাহলে তা গুণতে পারবে না। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৭-১৮)

এভাবে যারা জেনে বুঝে সচেতনভাবে মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে এবং তারা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট। এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদেরকে জালিম এবং সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় রুকুর তাফসীর

প্রথম রুকুর সাথে দ্বিতীয় রুকুর যোগসূত্র

সূরা লুকমানের প্রথম রুকুতে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, সেই বক্তব্যের সারমর্ম স্মরণে রাখলে দ্বিতীয় রুকুর বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে। প্রথম রুকুতে বলা হলো, যে কথাগুলো পেশ করা হচ্ছে তা অজ্ঞতা প্রসূত, অযৌক্তিক, আবেগ নির্ভর বা অর্থহীন কোনো মনোমুগ্ধকর কথা নয়। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের কথা। এই জ্ঞানগর্ভ কিতাব ঐসব লোকদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করবে, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে এবং পৃথিবীতে আখিরাত ভিত্তিক জীবন-যাপন করে। এই লোকগুলোই সত্য-সঠিক পথে রয়েছে এবং এরাই প্রকৃত সফলতা অর্জন করবে। এর বিপরীতে মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী রয়েছে, যারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন অর্থহীন মনোমুগ্ধকর বিষয় আমদানী করে তার মধ্যে মানুষকে মশগুল করে এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এই শ্রেণীর মানুষদের জ্ঞানগর্ভ কিতাব কর্তৃক নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান জানালে এরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে এমনভাবে তা এড়িয়ে যেতো, যেনো তারা শোনেইনি– বধির। এরা যেমন আল্লাহর পথের আহ্বান শুনলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, তেমনি তাদেরকেও বিদ্রুপাত্মক ভাষায় হুশিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। তবে যারা তওবা করে জ্ঞানগর্ভ কিতাব কর্তৃক নির্দেশিত পথে ফিরে আসবে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত এবং এ ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। এরপরেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিপালন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এসবই হলো সেই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, এ সত্য ঐ শ্রেণীর মানুষের কাছেও স্পষ্ট– যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিজেদের আইনদাতা-বিধানদাতা মনে করে। এসব লোকদের জালিম নামে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, এরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

প্রথম রুকুয় উল্লেখিত কথাগুলো স্মরণে রেখে একটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে যে, মানুষ সাধারণত না জেনে, অজ্ঞতাবশতঃ বা প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে স্পষ্ট না হবার দরুন নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছে এবং এমন কিছুকে মহাশক্তিধর হিসেবে কল্পনা করেছে, প্রকৃতপক্ষে যার কোনো শক্তিই নেই। বর্তমান যুগেও বরফাচ্ছিত এলাকায় বা গভীর অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চলে যেসব লোক বাস করে, তারা বিশাল কোনো বৃক্ষ বা বৃক্ষের গায়ে কল্পিত কারো ছবি খোদাই করে তার সম্মুখে অবনত হয়। জোড় হাতে প্রার্থনা করে মনের কামনা-বাসনা পেশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা বিবর্জিত মানুষ এমন আচরণে অভ্যস্থ যে, যা সমাজ-দেশ ও জাতির জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর তাদের নিজেদের জন্যে। কোনো কোনো সম্প্রদায় এমন বস্তুকে আহার্য বস্তুতে পরিণত করে, যা স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।

www.pathagar.com

প্রসূতি বিদ্যা বা সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় এবং ভূমিষ্ঠকালে বা সন্তান ভূমিষ্ঠ পরবর্তী সঠিক কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগেও অসংখ্য মা ও শিশু চরম বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। এসব কিছুর মূলে রয়েছে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা। অর্থাৎ সঠিক শিক্ষার অভাবেই মানুষ এমন বস্তুকে শক্তিধর হিসেবে কল্পনা করে, আদৌ যার কোনো শক্তি নেই। বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে না জানার কারণেই ক্ষতিকর বস্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্রসূতি বিদ্যা না জানার কারণেই সন্তান গর্ভে এলে বা প্রসবের পর সতর্কতা অবলম্বন করে না। প্রকৃত জ্ঞান থাকলে মানুষ ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে যথাযথ নীতি বা ক্ষতি মুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

সূরা লুকমানের প্রথম রুকুর ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে কিছু সংখ্যক মানুষ কর্তৃক গৃহিত যে ক্ষতিকর নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় রুকুতে এমন ঘটনার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, যে ঘটনা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে তা অনুসরণ করলে ক্ষতিমুক্ত থাকতে পারবে এবং প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। মানুষ নিজের সম্পর্কে যেনো ক্ষতিমুক্ত নীতি অবলম্বন করতে সক্ষম হয়, এ জন্যেই দ্বিতীয় রুকুতে এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি তাঁর প্রিয় সন্তানকে ক্ষতিকর নীতির ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রুকুতে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার যে ক্ষতিকর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, পরবর্তী রুকুতে সেই ক্ষতি থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যাবে, তা একটি অতুলনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লুকমান-এর পরিচিতি

আলোচ্য সূরার দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলাম যেনো সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে, সে ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত যে- আল্লাহ কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।'

এই আয়াতের সূচনাই হয়েছে এভাবে যে, 'আমি লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলাম যেনো সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।'

মহান আল্লাহ তা'য়ালা লুকমান নামক যে মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গ দিয়ে এই আয়াতের সূচনা করেছেন, তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ইসলামী চিন্তবিদদের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত লুকমান নবী ছিলেন না। কারণ আল্লাহর কোরআন একজন নবী-রাসূলের বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে যে ধারা অবলম্বন করেছে, তাঁর ব্যাপারে তা অবলম্বন করা হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হযরত লুকমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক মতানৈক্য ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সে যুগে কোনো লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না বা মানুষ লিখিত ইতিহাস রচনায় অভ্যস্থ ছিলো না।

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী মানুষ বংশ ও গোত্র পরম্পরায় যা কিছু শুনতো, এসব তারা স্মৃতির কোঠায় সংরক্ষিত করে পরবর্তী বংশধরদের শোনাতো। এভাবে বংশ পরম্পরায় শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে অনেকে হযরত লুকমানকে শক্তিশালী আ'দ জাতির বাসস্থান ইয়েমেনের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রাহঃ) 'আরদুল কোরআন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইতিহাসে ধ্বংস প্রাপ্ত যেসব জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আ'দ জাতি হলো তাদের অন্যতম। এরা মহান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী ছিলো। হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামকে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আল্লাহর প্রেরিত নবীর সাথেও তারা বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর আযাব প্রেরণ করেন। এরপর হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোকদের নিয়ে আযাবের স্থান থেকে হিজরত করেন। হিজরতকারী সেই লোকগুলো থেকে যে মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটে তারা ইয়েমেনে বসবাস করতো। তাদের বংশের সন্তান ছিলেন হযরত লুকমান এবং তিনি ছিলেন ইয়েমেনের শাসক।

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালের চিন্তাবিদগণ হযরত লুকমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হযরত লূকমান সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ছিলেন হাবশী শ্রেণীভুক্ত একজন দাস।

পরবর্তীকালের অনেক গবেষক তাঁদের মতামত সমর্থন করেছেন। আবার হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত লুকমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, হযরত লূকমান ছিলেন নুবা নামক স্থানের অধিবাসী। হযরত সাঈদ ইবনে মাসাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মিশরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত লুকমান।

হযরত লুকমান সম্পর্কে উল্লেখিত মনীষীবৃন্দের মতামতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ সে যুগে আরবের অধিবাসীরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাবশী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই চিহ্নিত করতো। হযরত লূকমান সম্পর্কে যাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, তিনি ছিলেন নুবা নামক স্থানের অধিবাসী, তাঁদের মন্তব্যের সমর্থনে গবেষকগণ বলেছেন– নুবা হলো সুদান নামক দেশটির উত্তরে এবং মিশর নামক দেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। এই অঞ্চলের লোকগুলোর গাত্রবর্ণ কালো। হযরত লূকমান কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন, এ সম্পর্কে মতপার্থক্য এখানে যে, কেউ বলছেন তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন কেউ বলছেন, তিনি মিশরের অধিবাসী আবার কেউ বলছেন, তিনি নুবা নামক অঞ্চলের লোক ছিলেন। সকলের মন্তব্যে শব্দের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কালো বর্ণের লোক ছিলেন।

হযরত লূকমান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেছেন, তিনি নুবা অঞ্চলের লোক হলেও বসবাস করতেন মাদ্‌য়ান– বর্তমানে পরিবর্তিত নাম আকাবাহ্ নামক এলাকায়। আর এই এলাকার ভাষা ছিলো আরবী, এ জন্যই তিনি আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিষয়টি আরব এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করেছিলো।

www.pathagar.com

সুক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত লূকমানের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি লূকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলাম যেনো সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।'

উল্লেখিত আয়াতে হযরত লূকমান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, এর দুটো দিক রয়েছে। প্রথমদিক হলো, তাঁকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়েছিলো এবং দ্বিতীয়দিক হলো, তিনি যেনো মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হন।

তাঁকে কি ধরনের সুক্ষ্মজ্ঞান দান করা হয়েছিলো, তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হযরত লূকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন– তা বিশ্লেষণ করলেই অনুভব করা যায়। তিনি তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, এই নয়টি উপদেশ পালন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা। তিনি তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র সেই যুগের মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য ছিলো না, বরং তা কালজয়ী এবং বিশ্বজনীন অবশ্যই পালনীয় উপদেশ। পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য অনুসরণীয় এবং পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র ও সর্বশেষ মাধ্যম।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত খালিদ রাবঈ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর মনিবের কাছে কিছু সংখ্যক লোকজন এসে তাঁর সম্পর্কে জানালো, আপনার গোলামটি প্রবল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সে মানুষকে নানা ধরনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকে।

লোকজনের কথা শুনে মনিব তাঁর গোলাম লূকমানের জ্ঞানের পরিধি যাচাই করার উদ্দেশ্যে একদিন তিনি হযরত লূকমানকে বললেন, একটি ছাগল জবেহ করো এবং ছাগলের দেহের সবথেকে উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। তিনি মনিবের কথা অনুসারে ছাগল জবেহ করে ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করে বললেন, এটাই ছাগলের গোটা দেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ।

এরপর মনিব পুনরায় তাঁকে আদেশ দিলেন, আরেকটি ছাগল জবেহ করো এবং সেই ছাগলের দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। মনিবের আদেশে হযরত লূকমান আরেকটি ছাগল জবেহ করলেন এবং এবারও তিনি ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করলেন।

মনিব অবাক দৃষ্টিতে তাঁর গোলাম হযরত লূকমানের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, লোকজনের মুখে তোমার জ্ঞানের প্রশংসা শুনি। তুমি নাকি লোকজনকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকো। এখন দেখছি, তোমার মাথায় কিছুই নেই। তোমাকে আমি বললাম, ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। তুমি আমাকে ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা এনে দিলে। আবার যখন তোমাকে আমি আদেশ দিলাম একটি ছাগল জবেহ করে তার দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে আনো। তুমি এবারও ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা এনে আমার সামনে রাখলে, বিষয়টি কি?

www.pathagar.com

হযরত লুকমান মনিবের কথার উত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন– আপনি ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ উপস্থিত করতে বলেছেন। আমি আপনার আদেশ অনুসারেই কাজ করেছি।

মনিব অবাক কণ্ঠে বললেন, বিষয়টি কি আমাকে বুঝিয়ে বলো।

হযরত লুকমান বললেন, দেহের মধ্যে কলিজাই হলো সবথেকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অংশ। কারণ এই কলিজা যদি কারো ভালো থাকে, তাহলে তার গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর এই কলিজা যদি কারো খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়।

মনিব তার গোলামের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিধি অনুভব করে অবাক হয়ে গেলেন। এ জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْاَلْجَسَدُ كُلُّه وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّه اَلاَ وَهُوَ الْقَلْبُ-

দেহের মধ্যে এমন একটি গোস্তপিন্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকবে, সমস্ত দেহও সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকবে। আর ঐ গোস্তপিন্ডটি যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র দেহটিই চরমভাবে রোগাক্রান্ত ও বিষ-জর্জরিত হয়ে পড়বে। তোমরা জেনে রাখো যে, ঐ গোস্তপিন্ডটিই হলো কল্‌ব বা হৃদপিন্ড।

এ কথা স্বতসিদ্ধঃ যে, দূষিত হৃদয়-মন থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। হৃদয়-মনে যে চিন্তা-চেতনার উদ্রেক হয়, মানুষের স্বভাব হলো তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। যারা শুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত, তাদের কাজকর্মে তা যেমন প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে যারা অশুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তাদের কর্মকান্ডেও তা প্রকাশ পায়। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে হৃদয়কে অশুভ চিন্তা-চেতনা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বার বার মানুষকে স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন, তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্‌ল-৭৪)

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি মানুষের মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত রয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা মানুষের সমস্ত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাও আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে।

হৃদয়-মন ও মস্তিষ্ক সুস্থ এবং শুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা সার্বক্ষণিক প্রভাবিত রাখার বিষয়টি হযরত লূকমান পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন বিধায় তিনি তাঁর মনিবের নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে দুই বারই ছাগলের কলিজা এনে মনিবের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। আপন সন্তানকে দেয়া সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত নয়টি উপদেশ আমরা পরবর্তীতে পর্যায়ে আলোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত লূকমান সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তার দ্বিতীয়দিক হলো, তিনি যেনো মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তথা আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালককে পরিপূর্ণভাবে চিনে-জেনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই জ্ঞান কি শুধুমাত্র হযরত লূকমানকেই দেয়া হয়েছিলো? সাধারণভাবে সকল মানুষকে কি নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জ্ঞান দেয়া হয়নি? এই প্রশ্নের জবাবও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এভাবে দিয়েছেন-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا-وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ-لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

আল্লাহ তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমাদের কোনো চেতনাই ছিলো না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-গবেষণা করার মতো হৃদয় দিয়েছেন, যেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৭৮)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এমন সব উপকরণ দিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন, যা প্রয়োগ করে মানুষ পার্থিব বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে। মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যত বেশী অসহায়, পরনির্ভরশীল ও অজ্ঞ হয়, পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদি অর্থাৎ শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যেই মানুষ উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, হিংস্র প্রাণী ও বিশাল দেহী পশুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে উপকার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে।

যে কোনো মানুষই যেনো তার নিজের স্রষ্টাকে চিনতে পারে, এটা যেমন তার প্রকৃতির মধ্যে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা তাফসীরে সাঈদী সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমপারার সূরা আশ্ শাম্‌সের তাফসীরেও আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি একজন বিখ্যাত কবি তার হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'তোমাকে কি করে প্রমানিত করা যাবে সে জিনিস দিয়ে, যার

www.pathagar.com

অস্তিত্বই তোমার মুখাপেক্ষী? তুমি কবে কোন্দিন কোথায় অদৃশ্য ছিলে যে, তোমার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হবে? তুমি কখন দূরে ছিলে যে, তোমার সান্নিধ্যে পৌছতে নিদর্শন অনুসন্ধান করতে হবে? হে মহান সত্তা! তুমি তো পূর্ণ চাকচিক্য সহকারে চির ভাস্বর, তুমি কেমন করে প্রচ্ছন্ন হতে পারো, তুমি তো সদা-সর্বদা প্রকাশমান! অথবা তুমি কেমন করে অদৃশ্য হতে পারো, তুমি তো চিরদিন উপস্থিত, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষক।'

সুতরাং মানুষের নিজের দেহ থেকে শুরু করে সৃষ্টির প্রত্যেক পরতে পরতে মহান আল্লাহ প্রকাশমান, তাঁকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন হয় না। মানুষের ব্যর্থতা শুধু এখানেই, যে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শোনার জন্যে কান দিয়েছেন, এই কান সে সকল কিছু শোনার জন্য ব্যবহার করে, কিন্তু মহান আল্লাহর কথা শোনার জন্যে ব্যবহার করে না। তিনি দেখার জন্যে চোখ দিয়েছেন, এই চোখ দিয়ে যাবতীয় বস্তু দেখে, কিন্তু মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখার ক্ষেত্রে কৃপণতা প্রদর্শন করে। আল্লাহর দেয়া হৃদয়, মন-মস্তিষ্ক দিয়ে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ অন্যান্য সকল কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, কিন্তু তার প্রতি যে অনুগ্রহ করে এসব দান করেছেন, সেই অনুগ্রহকারী সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না।

একজন গন্ডমূর্খ অন্ধ ভিক্ষুকও চিন্তা-ভাবনা করে ভিক্ষা চাওয়ার কৌশল আয়ত্ব করে, কোন্ পদ্ধতিতে আবেদন করলে মানুষ তাকে কিছু দিতে আগ্রহী হবে। শুধু চিন্তা-ভাবনা করে না, কে তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, কে তাকে সৃষ্টি করেছেন, কে তাকে এই পৃথিবীতে বসবাসের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং স্রষ্টাকে চিনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জ্ঞান প্রত্যেক মানুষকেই দেয়া হয়েছে, প্রয়োজন শুধু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান প্রয়োগ করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যে জ্ঞান ও হৃদয়ের চোখ দিয়েছেন, এর প্রথম দাবী তো এটাই ছিলো যে, মানুষ নিজেকে মহান মালিকের অনুগৃহীত মনে করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে এবং প্রত্যেক স্পন্দনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এই কৃতজ্ঞতা সে মৌখিকভাবে, চিন্তা-চেতনায় ও বাস্তব কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করবে। তার চিন্তার জগতে প্রত্যেক মুহূর্তে এই কথা সঞ্চালিত হতে থাকবে যে, এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ও যা কিছু লাভ করেছে, তা মহান মালিকের একান্তই অনুগ্রহ। মহান মালিকের বিধান যারা অমান্য করছে, তাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সংগ্রাম করে সে এ কথারই প্রমাণ দেবে যে, সে প্রকৃতই তার মালিকের অনুগত, গুণগ্রাহী ও মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞশীল।

পৃথিবীতে কতক মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরন এমন যে, মনিবের প্রতি সে কৃতজ্ঞ ও আনুগত্য পরায়ণ হয়ে থাকে। কারণ মনিব তাকে বেতন দেয়, তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে, এ জন্যে সে মনিবের স্বার্থ দেখা-শোনার মাধ্যমে মনিবের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায়। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ তার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের অমূল্য প্রাণও দান করে। মনিব তাকে মাস শেষে কিছু অর্থ দেয়, এ জন্যে সে কৃতজ্ঞশীলতার কারণে মনিবের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে নিজের প্রাণও দিতে পারে। কিন্তু হতভাগা মানুষ, নিজের

www.pathagar.com

প্রকৃত মনিবের অগণিত দানের কথা মুহূর্তকালের জন্যেও স্মরণ করে না। প্রকৃত মনিব যদি মাত্র একটি মুহূর্তের জন্যে তাঁর দানের উন্মুক্ত হস্ত সংকুচিত করে নেন, তাহলে মানুষের পক্ষে মুহূর্তকালের জন্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেই মনিবের দেয়া উপকরণ ব্যবহার করে তাঁকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ অবলম্বন করে না। হযরত লুকমান মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহার করেই প্রকৃত মনিবকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ অবলম্বন করেছিলেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিজেরই কল্যাণ

হযরত লুকমান সম্পর্কে বলার পর আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে, সে ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত যে- আল্লাহ কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।'

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'য়ালা যে মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যাবতীয় নে'মাত দানে ধন্য করলেন, সেই মানুষ যদি আল্লাহর বিধান অমান্য করে তথা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করে, তাহলে ক্ষতি যা হবার তা বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনকারীরই হয়- আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌম কর্তৃত্বে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই হয় না। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনকারী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, একমাত্র আল্লাহরই মুখাপেক্ষী তথা সমগ্র সৃষ্টি শুধুমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন্ সৃষ্টি কখন কোন্ মুহূর্তে তাঁর প্রশংসা করবে, এদিকে তিনি চেয়ে থাকেন না। বরং তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। এ বিষয়টি আমরা তাফসীরে সাঈদী- সূরা ফাতিহার ১৩৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

কোন্ ধরনের শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি, বিশ্ব জগতের প্রত্যেক অণূ-কণিকা নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে একমাত্র তাঁরই প্রশংসায় নিবেদিত রয়েছে। এই প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্রষ্টার প্রয়োজনে নয়, বরং সৃষ্টির নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি তার স্রষ্টার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, উপকারীর উপকার যে ব্যক্তি স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি সর্বত্র নিন্দিত ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে সে ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হলে কেউ-ই তার উপকার করতে এগিয়ে আসে না। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। আর অকৃতজ্ঞতা চিরকালই নিন্দিত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালাকে চিনার উপকরণ মানুষের দেহের মধ্যেই দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, মানুষ যেন তাঁর আপন রব-এর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের সম্মান, মর্যাদা সমুন্নত করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ-

www.pathagar.com

তুমি কি দেখো না সমুদ্রে নৌযান চলে আল্লাহর অনুগ্রহে, যেনো তিনি তোমাদের দেখাতে পারেন তাঁর কিছু নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর জন্য। (সূরা লূকমান-৩১)

যারা ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তারা সৃষ্টির প্রত্যেক পরতে মহান আল্লাহর নিদর্শন দেখে আপন রব-কে চিনে তওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর বিধান একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে। এরা অস্থির চিত্তের হয় না বরং এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে থাকে অবিচলতা-দৃঢ়তা। সুসময়ে বা দুঃসময়ে তথা যে কোনো পরিস্থিতিতে এরা মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে থাকে। সকল অবস্থায় এরা একটি সৎ ও সুস্থ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকে। বিপদ এলে আল্লাহকে ডাকবে আর বিপদ অতিক্রান্ত হলেই আল্লাহকে ভুলে যাবে, সুসময় এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর বিপদ এলে আল্লাহকে অভিশাপ দেবে- এ ধরনের ঘৃণ্য নীতি এরা অবলম্বন করে না।

যিনি দান করলেন, সেই দানকে দানকারীর দান মনে করে অন্য কারো দান মনে করা, দানকারীর অনুগ্রহভাজন না হয়ে অন্য কারো অনুগ্রহভাজন হওয়া বা প্রশংসা করা দানকারীর দানকে অস্বীকার করার শামিল। একজন অভাবী লোককে দানশীল দান করেন এ জন্যে যে, সে তার দান গ্রহণ করে নিজের অভাব মোচন করবে। দান গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি সেই দানের অর্থ বা সম্পদ গর্হিত কোনো কাজে ব্যবহার করে, তাহলে দানকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় আর এই ধরনের ব্যক্তি সর্বত্র নিন্দা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা যে মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলেন, সে ছিলো শুক্রবিন্দু- যার মধ্যে নিছক একটি প্রাথমিক জীবন-কীট ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না, সেখান থেকেই তাকে সৃষ্টির সেরা জীবে উন্নিত করা হয়েছে, সেই মানুষ মহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে স্বয়ং নিজের স্রষ্টা আল্লাহর বিরুদ্ধে নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করে নিজেকে ঘৃণা ও নিন্দার পাত্রে পরিণত করে। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَوَلَمْ يَرَالاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ-

মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে? (সূরা ইয়া-সীন-৭৭)

মানুষ প্রথমে কি ছিলো এবং কোন্ স্তর থেকে সে বর্তমান সুন্দর অবয়বে রূপান্তরিত হলো, কে তাকে অপবিত্র বস্তু থেকে সুন্দর আকৃতি দান করলেন, এই বিষয়টি অনুভব করে কৃতজ্ঞতায় নিজের মালিকের প্রতি সিজ্দায় অবনত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ তা না করে অকৃতজ্ঞতার পথই অনুসরণ করে নিজের মর্যাদার প্রতি আঘাত হানে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَبَدَاَ خَلْقَ الاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْئِدَةَ-قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ-

www.pathagar.com

তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে রুহ্ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। (সূরা আস্ সাজ্দাহ্-৭-৯)

অনুভব, অনুধাবন ও জ্ঞানার্জন করার মাধ্যম হলো চোখ, কান ও হৃদয়। এগুলো আল্লাহ তা'য়ালা খেল-তামাশার জন্য দেননি। এগুলো কাজে লাগাতে হবে এবং আপন স্রষ্টার নির্দেশিত পথেই ব্যবহার করতে হবে এবং এটাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয় উল্লেখ করার সাথে সাথে ধৈর্য্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, যাদের মধ্যে ধৈর্য্য নামক দুর্লভ গুণের অভাব রয়েছে, তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অক্ষম। ধৈর্য্যই মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকে অগ্রসর করায়।

আদরের সন্তান ইন্তেকাল করলে কেউ যদি এ কথা মনে করে ধৈর্য্য ধারণ করে যে, সন্তান তাকে যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই আবার তা নিজের কাছে নিয়েছেন। এই সন্তান তার কাছে আমানত হিসেবে ছিলো। সেই আমানত যিনি রেখেছিলেন, তিনিই তা ফেরৎ নিয়েছেন। এতে অধৈর্য্য হবার কিছুই নেই। এই অবস্থাতে ঐ সন্তানহারা ব্যক্তিও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তার সন্তানের মৃত্যু দিলেন, এ জন্য সে অধৈর্য্য হয়ে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে না বা তাঁর গোলামী ত্যাগ করবে না– আর এটাই হলো কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহর সিদ্ধান্তে কেউ যদি অধৈর্য্য হয়ে মহান মনিবের প্রতি বিদ্রোহের নীতি তথা অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করে, এতেও মহান আল্লাহর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হয় না। মানুষ তাঁকে মানলেও তিনিই আল্লাহ– আর না মানলেও তিনিই আল্লাহ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে– মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বা কৃতঘ্ন হওয়াতে আল্লাহর কিছুই এসে যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ-وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ-وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ-

যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য অকৃতজ্ঞতার আচরণ পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (সূরা আয্ যুমার-৭)

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে যে কথা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালার তা এতই পছন্দ হয়েছিলো যে, তিনি তা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

www.pathagar.com

لِيَبْلُوَنِى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ-وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ-وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيْمٌ-

আর যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তার নিজের জন্যেই উপকারী। অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আমার রব কারো পরোওয়া করেন না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি মহীয়ান। (সূরা আন্ নাম্‌ল-৪০)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে বলেছিলেন-

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ-

যদি তোমরা এবং সারা পৃথিবীবাসী একত্রিত হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত। (সূরা ইবরাহীম-৮)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা আল্লাহর প্রশংসা করা না করায় আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌমত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এ সম্পর্কে হাদীসে কুদ্‌সীতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاعِبَادِىْ لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا-يَاعِبَادِىْ لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَانَقَصَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا-يَاعِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا-فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ-

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবথেকে আল্লাহভীরু লোকের হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে সামান্যতম বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবথেকে বেশী খারাপ লোকের হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে না। হে আমার বান্দারা! এসব তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসাবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এসবের পরিপূর্ণ প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। সুতরাং যার তকদিরে যে কল্যাণ এসেছে তার পক্ষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং যে অন্য কিছু লাভ করেছে তার নিজেকে ভর্ৎসনা করা উচিত। (মুসলিম)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা মানুষ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে এবং এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক দাবীই হলো মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক মাধ্যম হলো মহান আল্লাহর দাসত্ব করা তথা তাঁর বিধান নিজে অনুসরণ করা এবং সমাজ ও দেশে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা যে দেহ কাঠামো এবং জ্ঞানার্জনের উপকরণ দিয়েছেন, এর মাধ্যমে আপন রবকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নীতি যদি অবলম্বন করা না হয়, তাহলে সেই মানুষের চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা ও মগজ আর পশুর চোখ, কান, জিহ্বা ও মগজের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়?

এসব উপকরণ পশু যেসব কাজে ব্যবহার করে, মানুষও কি সেভাবেই ব্যবহার করবে? এসব উপকরণ দিয়ে পশু যেমন তার দেহ ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করে, মানুষও কি তা-ই করবে? অথবা এসব উপকরণ দিয়ে মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের জীবনমান উন্নত করার কৌশল আবিষ্কার করবে? নিজের মনিব মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে চিনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কাজে কি এসব উপকরণ ব্যবহার করবে না? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ-وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ-وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ-اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার জন্য অন্তঃকরণ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, দিন রাতের আবর্তন তাঁরই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। এ কথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? (সূরা আল মু'মিনূন-৭৮-৮০)

মানুষ তার নিজের কথা, কাজ ও চিন্তাধারা দিয়ে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হযরত লুকমান মহান আল্লাহর দেয়া যাবতীয় উপকরণ আপন মনিব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে চেনা ও জানার কাজে ব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা এত বেশী বৃদ্ধি করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে তাঁকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে চিরন্তন করে দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন ক্রীতদাস, তাঁর মনিব নিজের ক্রীতদাসের সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাঁর সম্মান-মর্যাদা এতই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, তাঁর বলা কথাগুলো মহাগ্রন্থ আল কোরআনে স্থান দিয়েছেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'য়ালাও তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মানুষ ধৈর্য্য সহকারে আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আল্লাহ ছুব্‌হানুহু তা'য়ালাও তাঁর সে বান্দাকে নে'মাত দানে ধন্য করবেন- এটাই তাঁর স্থায়ী নীতি এবং তাঁর নীতিতে কখনো পরিবর্তন সূচিত হয় না।

শির্‌ক হলো সবথেকে বড় জুলুম

হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের রব, ইলাহ, মা'বুদ, বাদশাহ তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিপতি মহান আল্লাহর সাথে জড়িত। পরের ছয়টি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত। ইনসাফের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক যে, মানুষ সর্বপ্রথম নিজের মনিবের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তাঁর হক আদায় করবে। এরপর সে নিজের এবং নিজের সাথে যারা জড়িত তাদের হক আদায় করবে। এ জন্য হযরত লুকমান প্রথমেই তাঁর সন্তানকে আপন মনিব মহান আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তাঁর উপদেশের ধরন এবং যে ব্যাপারটি সর্বপ্রথমে বলা প্রয়োজন, তিনি তা-ই বলেছেন। এদিকে দৃষ্টি দিলেও তাঁর সুক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যে ভাষায় ও শব্দ ব্যবহার করে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'স্মরণ করো যখন লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কারণ শির্‌ক হলো সবথেকে বড় জুলুম।'

হযরত লুকমান যে উপদেশ দিলেন, এই উপদেশের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দুটো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রশ্ন হলো, এই উপদেশ তিনি কি তাঁর ঔরসজাত সন্তানকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন না তিনি জাতির প্রধান হিসেবে গোটা জাতিকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন? কারণ জাতির প্রধান হিসেবে গোটা জাতি ছিলো তাঁর নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি ছিলেন সেই পরিবারের প্রধান। রাষ্ট্র নামক পরিবারের প্রধান হিসেবে তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যই ছিলো, জাতিকে শির্‌ক মুক্তকরণ এবং নৈতিক মানে উন্নীতকরণ। অথবা সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন একজন জ্ঞানবান পিতা কর্তৃক তাঁর সন্তান ও সমকালীন তরুণ-যুবসমাজকে লক্ষ্য করে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন? কারণ সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হিসেবেও সমাজকে কলুষ মুক্তকরণের দায়িত্ব তাঁর ছিলো এবং সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোকে নৈতিক মানে উন্নতকরণের কর্তব্যও তাঁর ছিলো।

প্রথম প্রশ্নের তথ্য নির্ভর জবাব চিন্তাবিদ ও গবেষকদের কাছে এ জন্য নেই যে, হযরত লুকমান রাষ্ট্র বা সমাজের প্রধান ছিলেন অথবা সাধারণ একজন নাগরিক ছিলেন, এ বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও এ তথ্য অবশ্যই নির্ভুল যে, তিনি একজন সুক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেনো ছিলেন জ্ঞানের কুঞ্জবন এবং জ্ঞান পিপাসু মধুমক্ষিকার দল তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। জ্ঞান সুধা আহরণের লক্ষ্যে জ্ঞান পিয়াসী মানুষ তাঁর চার পাশে ভীড় জমাতো, তাঁর কাছ থেকে মানুষ নিজের মনিব মহান আল্লাহ সম্পর্কে যেমন নির্ভুল ধারণা লাভ করতো, তেমনি পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ এবং সফলতা অর্জনের পথের সন্ধান লাভেও ধন্য হতো।

www.pathagar.com

এ জন্যই তিনি সে যুগের একজন জনপ্রিয় বিখ্যাত জ্ঞানী ও অন্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। এর প্রমাণ হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তাঁকে কেন্দ্র করে চর্চা, তাঁর জ্ঞানের সংরক্ষণ সর্বোপরি তাঁর বিষয়টি মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করা। তা ছাড়া তিনি যে শব্দে সম্বোধন করেছেন- يَبُنَيَّ ইয়া বুনায়্যা অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান। এই শব্দটি এক বচন। এতে মনে হয় তিনি তাঁর নিজ সন্তানকেই উপদেশ দিচ্ছিলেন। যদি সমকালীন কোনো যুবসমাবেশে বক্তৃতা উপলক্ষ্যে এই উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সম্বোধনের ভঙ্গী হতো, يَبَنِيْ ইয়া বানী- অর্থাৎ হে সন্তানগণ! এবং ইসরাঈলীদের সম্বোধন করে যদি উপদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সম্বোধনের ভঙ্গী হতো ইয়া বানী ইসরাঈল। অর্থাৎ হে ইসরাঈলের সন্তানরা! সুতরাং তাঁর সম্বোধনের ভাষা থেকে অনুভব করা যায় যে, তিনি তাঁর সন্তানকেই লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়েছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে আগমন করেছিলেন, ইতিহাস সাক্ষী- সে সময়ে আরবী ভাষা উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছেছিলো। সে সময়ের রচিত কবিতা-সাহিত্য বর্তমান যুগেও বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হচ্ছে। তদানীন্তন যুগের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় হযরত লূকমানের উল্লেখ রয়েছে এবং তখন যারা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাদের কাছে 'সহীফা লূকমান' নামক তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ মালার একটি সঙ্কলন সংরক্ষিত ছিলো। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিজরতের তিন বছর পূর্বে মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মানুষটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম ছিলো সুওয়াইদ ইবনে সামিত। এই মানুষটি তাঁর জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, যোগ্যতা, বীরত্ব, কাব্য-সাহিত্যে সমকালীন সমাজে প্রশংসিত ছিলেন। উচ্চ বংশের একজন হওয়ার কারণে তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এ জন্যই তিনি মদীনায় একজন কামিল বা পূর্ণ মানব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাসু এবং সত্যানুসন্ধিৎসু। তিনি সেই যুগের পদ্ধতি অনুযায়ী হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কায় গমন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে আগত লোকদের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। সুওয়াইদ ইবনে সামিতের কাছে আল্লাহর রাসূল দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছালে তিনি বলেন, আপনি আমার কাছে যে ধরনের কথা বলছেন, অনুরূপ ধরনের কথা সম্বলিত একটি কিতাব আমার কাছেও আছে।

আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন, সেই কিতাবটি কি ধরনের?

সুওয়াইদ ইবনে সামিত জানালেন, সেই কিতাবটি হলো সহীফা লূকমান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেই কিতাব থেকে পড়ে শোনানোর অনুরোধ জানালে কিছু অংশ তিনি পড়ে শোনান। এরপর আল্লাহর রাসূল মন্তব্য করলেন, কথাগুলো বড়ই সুন্দর। তবে আমার কাছে এর থেকেও সুন্দর কথা রয়েছে।

এ কথা বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শোনান। আল্লাহর নবীর অতুলনীয় কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত শুনে

www.pathagar.com

সুওয়াইদ ইবনে সামিত অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকৃতি দিলেন, সহীফা লুকমানের তুলনায় এটা অবশ্যই সুন্দর। এই ঘটনার কিছু দিন পরে ইতিহাস বিখ্যাত সেই বুয়াসের যুদ্ধের সূচনা হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর গোত্রের লোকদের বিশ্বাস ছিলো যে, সুওয়াইদ ইবনে সামিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তিনি يَابْنَ 'ইয়া ইবনু' অর্থাৎ ওহে ছেলে, শব্দ ব্যবহার না করে 'ইয়া বুনায়্যা' হে আমার প্রিয় সন্তান, শব্দ কেনো ব্যবহার করেছেন? কারণ ইবনু আর বুনায়্যা- এই শব্দ দুটোর মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরবী أَبْنَاءُ আবনাউ- শব্দের অর্থ হলো পুত্রগণ, একবচনে إِبْنُ ইবনু। إِبْنَتِي ইবনাতী শব্দের অর্থ হলো, আমার পুত্র। بَنُوْنَ বানুন শব্দের অর্থও ছেলে কিন্তু এটা বহুবচন। আর বানিয়্যা বা বুনায়্যা শব্দের অর্থ হলো, আমার ছেলে- আমার প্রিয় সন্তান বা আমার প্রিয় বৎস।

একজন পিতা তার সন্তানকে সম্বোধন করলো, এই ছেলে! আরেকজন পিতা তার সন্তানকে সম্বোধন করলো, বাবা অথবা আব্বু আমার। ছেলে চঞ্চলতা প্রকাশ করছে, পিতা তা দেখে সন্তানকে বললো, এই ছেলে! শয়তানী করে না! একই কারণে আরেকজন পিতা সন্তানকে বললো- আব্বু আমার, দুষ্টামী করে না!

এই উভয় সম্বোধনের ভাষা ও ভাব প্রকাশের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম সম্বোধনের ভাষা সন্তানের মর্ম স্পর্শ করবে না এবং এই সম্বোধন শুনে সন্তানের মন বিগলিত হবে না বা পিতার আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্যে প্রবল আগ্রহেরও সৃষ্টি হবে না। কারণ এই সম্বোধনের ভাষা স্নেহের পরশ বর্জিত।

চঞ্চলতা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও প্রথমে যে ভাষায় সম্বোধন করা হলো, এর মধ্যেও ধমক বা হুশিয়ারী রয়েছে এবং চঞ্চলতা পরিহার না করলে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই সম্বোধনে সন্তানের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। দ্বিতীয় সম্বোধনের ভাষা ও ভাবের মধ্যে রয়েছে পরম মমতা আর স্নেহের পরশ। এই সম্বোধনে সন্তানের মনে পিতার প্রতি এক আবেগের সৃষ্টি করবে।

হযরত লুকমানকে আল্লাহ তা'য়ালা সুক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলেন। তিনি আপন সন্তানকে কোনো মামুলী বিষয়ে সতর্ক করছিলেন না। বিষয়টি এমনও নয় যে, সন্তান তার কথা মেনে চলুক বা না চলুক। তার বলা প্রয়োজন তিনি বলেছেন, এতে করেই তার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এ কারণে তিনি ওহে ছেলে বা ইয়া ইবনু বলে সম্বোধন করেননি। কারণ এই সম্বোধন একেবারেই সাধারণ পর্যায়ের এবং এই সম্বোধনে সন্তানের মনে কথা মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি করবে না।

তিনি আপন সন্তানকে এমন এক বিষয়ে সতর্ক করছিলেন, যে বিষয়টির সাথে মানব জীবনের সার্বিক সফলতা ও কল্যাণ জড়িত। এ ব্যাপারে সামান্যতম অসতর্ক হলেই মহাক্ষতির সম্মুখীন

www.pathagar.com

হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ জন্যই তাঁর অন্তরে প্রবল আগ্রহ ছিলো যে, সন্তান তাঁর কথা অনুসরণ করুক এবং তাঁর কথা যেনো সন্তানের মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর উপদেশ আমৃত্যু যেনো সন্তান স্মরণে রেখে সতর্ক হয়ে পথ চলে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ জন্যই তিনি পরম স্নেহের ভাষায় মিষ্টি-মধুর ভঙ্গিতে, হৃদয়ের অতল তলদেশে যেনো তাঁর আহ্বান স্পর্শ করে, সেই ভাষা ও ভাবে সন্তানকে সম্বোধন করলেন, ইয়া বুনায়্যা অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান।

আব্বু আমার, এদিকে এসো তো! সন্তানকে এই ভাষায় যখন আহ্বান জানানো হয়, সন্তানের মনে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রবল এক ভাবাবেগের উদ্রেক হয়। অবাধ্য সন্তানও বিনয়-বিগলিত অবস্থায় পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। পিতা যা বলেন তা মেনে চলার জন্যে সন্তান নিজেকে প্রস্তুত করে। ঠিক এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে প্রথম উপদেশেই বললেন– বাবা আমার! এই মহাবিশ্ব, গোটা সৃষ্টি জগৎ, আমাকে এবং তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন, সৃষ্টিসমূহ যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি এক, একক এবং অদ্বিতীয়। এসব কাজে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং প্রয়োজনও হয় না। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বা গোলামী করতে হবে, অন্য কারো গোলামী তথা আইন-কানুন, বিধি-বিধান অনুসরণ করা যাবে না।

আলোচ্য সূরার ১৩ নম্বর এই আয়াতটির সূচনা হয়েছে এভাবে যে, 'স্মরণ করো যখন লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কারণ শির্ক হলো সবথেকে বড় জুলুম।'

প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহ কোন্ লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'স্মরণ করো!' যার কথা স্মরণ করতে বলেছেন, সেই হযরত লুকমান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, আরবের সেই লোকগুলো বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর মানুষের ন্যায় শির্কে নিমজ্জিত ছিলো। আল্লাহকে ত্যাগ করে তারা নানা ধরনের অসার শক্তিকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতার অধিকারী মনে করতো। বর্তমান যুগের কিছু মানুষ যেমন মাজারে শায়িত মৃত মানুষকে প্রয়োজন পূরণের মালিক মনে করে, মাজারে গিয়ে নিজের মনের আশা-আকাংখা ব্যক্ত করে, সাহায্য চায়, মৃত মানুষের নামে মানত করে। আরবের লোকগুলোও তেমনি মূর্তিসহ নানা ধরনের অসার শক্তির কাছে গিয়ে নিজেদের আশা-আকাংখার কথা ব্যক্ত করতো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত কিছুর মালিক। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের মালিকও তিনি। সুতরাং যে কোনো ধরণের প্রয়োজনে মানুষকে আল্লাহর দরবারেই ধর্ণা দিতে হবে। এই সহজ-সরল কথাটি সে লোকদের মাথায় ঢুকতো না। সূরা লুকমানের আলোচ্য আয়াতে এই সহজ কথাটিই প্রথম দিকে মহান আল্লাহ তাদেরকে বুঝিয়েছেন। এই সূরার প্রথম দিকে একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শির্কের যুক্তিহীনতা, অবাস্তবতা ও অসারতা প্রমাণ করার পর মক্কার তাওহীদ বিরোধিদের এ কথাই স্মরণ করতে বলা হচ্ছে যে, তাওহীদ

www.pathagar.com

সম্পর্কিত এ যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও বাস্তবভিত্তিক কথা এই প্রথমবারই তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে না, বরং অতিতেও জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন তাওহীদের প্রতিই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তোমরা যে লুকমানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করো, তাঁর সম্পর্কে তোমরা চর্চা করো, সেই লুকমানও শির্‌ক ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং মানুষকে শির্‌ক থেকে দূরে রাখার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে তোমরা কেমন করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ প্রশ্ন করতে পারো যে, শির্‌ক কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাস নয় এবং এটা যদি অযৌক্তিক বিশ্বাস হতো তাহলো তোমার পূর্বে এ কথা কেউ বলেনি কেনো? অথচ তোমরা জানো যে, তোমরা যাকে শ্রদ্ধার সাথে সবসময় স্মরণ করো সেই লুকমানও এ কথা বলে গেছে যে, শির্‌ক করা বড় ধরনের জুলুম। অতএব তোমরা জেনে বুঝে আমার নবী যে তাওহীদের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তার বিরোধিতা করতে পারো না।

শির্‌ক ও তাওহীদ সম্পর্কে জানার মাধ্যম

যে বিষয় সম্পর্কে মানুষের নূন্যতম ধারণা নেই, সেই বিষয় সম্পর্কে মানুষ ভুল করবে এটাই তো স্বাভাবিক। শির্‌কের ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হচ্ছে এবং বলা হয়েছে, শির্‌ক হলো সবথেকে বড় জুলুম। এই শির্‌ক সম্পর্কে যদি সম্যক জ্ঞান না থাকে, তাহলে নিজের অজান্তেই মানুষ শির্‌কে লিপ্ত হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন লোক আরেকজন লোকের প্রশংসা করতে গিয়ে জানালো, 'লোকটি এতই সৎ যে, গোনাহ্ সম্পর্কে তার সামান্যতম ধারণাও নেই।'

হযরত ওমর বললেন, 'তাহলে তো ব্যাপারটি বড়ই ভয়ানক। তার যদি গোনাহ্ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে লোকটির পক্ষে গোনাহে জড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।' কারণ পাপ-পূণ্য সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই সেই ব্যক্তিকে পাপে জড়ানো খুবই সহজ। এ কারণেই শির্‌ক ও তাওহীদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে–আর শির্‌কের সাথে তাওহীদ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, এ জন্য শির্‌ক সম্পর্কে জানার পূর্বেই তাওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সর্বপ্রথমে এই বিষয়টির মীমাংসা হতে হবে যে, তাওহীদ ও শির্‌ক সম্পর্কে জানার মাধ্যম কি এবং যেহেতু মানুষের সাথে স্বয়ং স্রষ্টার সরাসরি যোগসূত্র নেই, মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না এবং স্রষ্টা স্বয়ং মানুষের সাথে কথাও বলেন না। সেহেতু মানুষ স্বয়ং তার স্রষ্টার কাছ থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছুই জানতে পারে না।

নিজেকে কেউ যদি স্রষ্টাকে জানার মাধ্যম হিসেবে দাবী করে এবং কিছু মানুষ তার দাবী মেনে নিয়ে তার কথা মেনে নেয়, তাহলে তারা স্রষ্টা সম্পর্কে মন-মস্তিষ্ক প্রসূত ধারণাই লাভ করবে, নির্ভুল বা অভ্রান্ত ধারণা লাভ করবে না। এ জন্য স্বয়ং স্রষ্টাকে জানার জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল মাধ্যম প্রয়োজন এবং এই মাধ্যম হতে হবে স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত। নবী-রাসূলগণই হলেন সেই অভ্রান্ত মাধ্যম, যাঁরা ছিলেন মহান আল্লাহ কর্তৃক

www.pathagar.com

নির্বাচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জানার মাধ্যম হিসেবে সমকালীন মানব সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট লোকটিকে নির্বাচিত করেছেন, এই সত্য কোন্ পন্থায় অনুধাবন করা যাবে?

এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক জবাব অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। মূল কথা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা আছেন এবং তিনি যে এক, একক ও অদ্বিতীয়– বিষয়টি সম্পর্কে জানার মাধ্যম কি? মানুষ হিসেবে আমাদের যে জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান কি আমাদেরকে কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করে? এই প্রশ্নের সঠিক এবং একমাত্র জবাব হলো, না। মানুষের জ্ঞান হলো সসীম, এই সসীম জ্ঞান মানুষকে সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে না। মানুষের জ্ঞান মানুষকে ভুল পথেও পরিচালিত করে। মানুষের দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শ্রবণশক্তি, অনুভবশক্তি, বাকশক্তি তথা সমস্ত শক্তিই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন মানুষ রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে অনেক দূরে সে দেখতে পায়, দু'পাশের রেল লাইন যেনো এক হয়ে গিয়েছে। রেল লাইন আর দুটো নেই, একত্রে মিশে গেছে। আকাশের প্রান্তের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক দূরে আকাশ পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে গেছে।

বিশাল জলধী সমুদ্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু পানি আর পানি। ওপার দেখা যায় না। ওপারে যে বৃক্ষ-তরু লতার অস্তিত্ব রয়েছে, জনবসতী রয়েছে, দৃষ্টিশক্তি তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং মানুষের দৃষ্টিশক্তি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়।

মানুষের শ্রবণশক্তির অবস্থা আরো শোচনীয়। একত্রে পাঁচজন মানুষ যদি কোনো শব্দ শোনে, পাঁচজন পাঁচ ধরণের মন্তব্য করে। প্রকৃত যে কিসের শব্দ, তা আড়াল থেকে অনুভব করা বড় কঠিন। মানুষের শ্রবণশক্তিও মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয় না বা ব্যর্থ হয়। মানুষের ত্বক, যা দিয়ে মানুষ স্পর্শ অনুভব করে, ত্বকও মানুষকে প্রকৃত সত্য অবগত করতে ব্যর্থ হয়। আড়াল থেকে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ স্পর্শ করলে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় চোখে না দেখে বলতে পারে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের একটি ঘটনা, হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নামক একজন বেদুঈন সাহাবী ছিলেন। তিনি নবীজীকে নিজের প্রাণের থেকেও বেশী ভালোবাসতেন। প্রায়ই নবীজীর জন্যে তিনি উপহার প্রেরণ করতেন। একদিন তিনি তাঁর এলাকা থেকে শহরের বাজারে এলেন কিছু জিনিষ বিক্রি করার জন্য। তিনি দাঁড়িয়ে জিনিষ বিক্রি করছেন, এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেছন দিক দিয়ে এসে তাঁকে নিজের বুকের সাথে জাপটে ধরলেন।

হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখতে পাননি কে তাঁকে জাপটে ধরেছে। তিনি একটু কঠিন কণ্ঠেই বললেন, 'এই কে, ছেড়ে দাও বলছি!'

তারপর দেখলেন, দুই জাহানের সম্রাট তাঁকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছেন। তখন তিনি নিজের শরীরটা আরো বেশী করে নবীর শরীরের সাথে মিশিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কৌতুক করে লোকজনকে বললেন, 'তোমরা কি কেউ এই গোলামটি কিনবে!'

নবীজীর সাহাবী হাসতে হাসতে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মত মূল্যহীন গোলাম যে কিনবে সেই ঠগবে।'

নবীজী তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর কাছে তোমার মূল্য কিন্তু অনেক বেশী।' (সীরাৎ উন্ নবী)

হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি অনুভব করতে পারতেন যে, তাঁকে যিনি অনুগ্রহ করে জড়িয়ে ধরেছেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব। তাহলে তিনি অমন করে, 'এই কে, ছেড়ে দাও বলছি' বলতেন না। অর্থাৎ দেখা গেলো, মানুষের অনুভবশক্তি তথা ত্বক মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে দেয় না।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে নবী এবং রাসূল ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ মানব জাতির সামনে খোলা নেই। এ ব্যাপারে মানুষের বিবেক বুদ্ধিও রায় দেয়, ওহীজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সত্য জানার আর কোনো মাধ্যম নেই। আর ওহীজ্ঞান কোনো নবী বা রাসূল ব্যতীত মানব জাতি লাভ করবে, সে উপায়ও নেই। মানুষের বিবেক কিভাবে রায় দেয়, সেটিও আলোচনা সাপেক্ষ।

অলৌকিক কিছু ঘটতে দেখলে মানুষ তার মূল রহস্য জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠে। নতুন ধরনের কোনো মেশিন দেখলে সে মেশিন কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে তা জানার জন্য মানুষ উদগ্রিব হয়ে ওঠে। বর্তমান এই শতাব্দীতে প্রত্যেক দেশেই কম বেশী বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার কর্ম সম্পাদন করছে। ইয়ার কুলার, ফ্যান, টেলেক্স, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, লিফ্‌ট, বৈদ্যুতিক সিঁড়ি, ওয়ারলেস যন্ত্র ইত্যাদী ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই এব যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব যন্ত্র কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ সম্পর্কে আমাদের ভেতরে কোনো দলাদলি নেই, দ্বিমত নেই। কিন্তু কেনো দ্বিমত নেই? কি কারণে দ্বিমত নেই? কারণ আমরা জানি, কিভাবে এসব যন্ত্র কর্ম সম্পাদন করে। এসব যন্ত্র ক্রয় করার সময় এর সাথে একটি অপারেটিং গাইড থাকে, আমরা তা পাঠ করলে বুঝতে পারি, কিভাবে এসব যন্ত্র অপারেট করতে হবে এবং কোন্ পন্থায় এসব যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে বা ব্যাটারীর সাহায্যে বা সৌর শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হবে।

যদি এসব মেশিনের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা না থাকতো, তাহলে কি ঐসব মেশিনের কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সমস্ত মানুষ একমত হতে পারতাম? অবশ্যই একমত হতে পারতাম না। আমরা নানাজনে নানা মতামত পেশ করতাম। ফলে আমাদের ভেতরে নানা দল উপদল সৃষ্টি হতো। কারণ, মেশিনগুলো কিভাবে কাজ করছে, তার কাজ করার পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতো, তখন আমাদের মনে বিরাট বিস্ময় জাগতো, সেই সাথে মন অস্থির হয়ে উঠতো। মেশিনসমূহ কিভাবে কাজ করছে, এ রহস্য অনুসন্ধানে মানুষ এগিয়ে আসতো, মানুষ বিভিন্ন ধরণের মতামত পেশ করতো, নানা রকমের অনুমান করতো এবং এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

বর্তমান পৃথিবীতে যত যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এসব যন্ত্র কিভাবে কাজ করে, কোত্থেকে এসব যন্ত্র শক্তি লাভ করে, আসুন আমরা ক্ষণিকের জন্য মেনে নেই যে, আমরা এসব সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা শুধু দেখছি, আমাদের দৃষ্টির সামনে এসব যন্ত্র বিভিন্নভাবে তাদের কাজ করছে। কিন্তু কিভাবে, কোন শক্তিতে করছে, আমরা তার কিছুই জানিনা। টেলিফোন, টেলেক্স কিভাবে কাজ করে, মোবাইল ফোনে কিভাবে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে কথোপকথন করা যায়, টেলিভিশনে কিভাবে সমস্ত কিছু জীবন্ত দেখা যায়, কথা শোনা যায়, ছাপাখানার মেশিনগুলো কিভাবে কাজ করে, মাথার ওপরে ফ্যান কিভাবে ঘোরে, বৈদ্যুতিক আলো কিভাবে জ্বলে, বৈদ্যুতিক সিঁড়ি কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, লিফ্ট কিভাবে ক্ষণিকের ভেতরে ৫০ তলায় পৌঁছে যায়, বিভিন্ন ধরনের Medical Instrument মেডিকেল যন্ত্রসমূহ কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, আমরা তার কিছুই জানিনা। আমরা শুধু অবাক বিস্ময়ে এসব মেশিনের অলৌকিক কর্মকান্ড দেখছি।

অবস্থা যদি এমনই হতো, তাহলে এই পৃথিবীর মানুষের অবস্থা কি হতো? মানুষতো নানাজনে নানা রকম মতামত পেশ করতো। একদল মানুষ বলতো, এসব মেশিন স্বয়ংক্রিয়। প্রয়োজন অনুসারে এসব মেশিন স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে, কর্ম সম্পাদন করে পুনরায় আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এসব মেশিনের পেছনে কোনো শক্তিই ক্রিয়াশীল নেই।

আরেক দল মানুষ তাদের ধারণা ব্যক্ত করতো এভাবে, এসব মেশিনের গঠন প্রকৃতির ভেতরেই তাদের কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। এ কারণেই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। এক সময় এই ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয় বা ধ্বংস। কিছু মানুষ আবার এই ধারণা পেশ করতো যে, একজন স্রষ্টা এসব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি হাজার হাজার দেবতা সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা প্রতিটি দেবতাকে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেছেন। স্রষ্টা বর্তমানে অবসর ভোগ করছেন। প্রত্যেক মেশিনের পেছনে একজন করে দেবতা রয়েছে। তারা প্রয়োজন অনুসারে এসব মেশিনের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করাচ্ছেন।

আরেকদল মানুষ এসব মেশিনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোনো কুল কিনারা করতে না পেরে হতাশ হয়ে বলতো, এসব কিছুর লীলা খেলা বুঝা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এসব মেশিনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়া মানুষের জন্য বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানুষের কাজ হলো, মেশিনগুলো থেকে উপকৃত হওয়া। প্রতিদিন মেশিনগুলোর সামনে হাত জোড় করে সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। মেশিনগুলোর পেছনে কোনো স্রষ্টা আছে কি নেই, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঠিক নয়।

অর্থাৎ প্রত্যেক দলের ধারণা অনুমান-বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রকৃত সত্য বলতে কিছুই নেই। মেশিনগুলো কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ জ্ঞান তাদের নেই। এ কারণে তারা নানা মত আবিষ্কার করেছে। তাদের এই আবিষ্কারের পেছনেও কোনো সত্য নেই। সবই তাদের ভ্রান্ত কল্পনা মাত্র। মনে করুন, এই ভ্রান্ত কল্পনার ওপরে নির্ভর করে যুগের

www.pathagar.com

পরে যুগ, শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে এই মানব গোষ্ঠী মতো বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ করে এক আকস্মিক ঘটনা ঘটলো। একজন ব্যক্তি এসে হঠাৎ করে দাবী করলো যে, তোমরা এসব মেশিনগুলো সম্পর্কে যে মতামত পেশ করছো- তা ভুল। কারণ যেখানে এসব মেশিন প্রস্তুত করা হচ্ছে আমি সেখানে দেখে এলাম, কিভাবে এসব মেশিন প্রস্তুত করা হচ্ছে। যিনি এসব মেশিন আবিষ্কার করেছেন, তিনি কিভাবে এসব পরিচালনা করছেন, আমি তা দেখে এসেছি। তোমরা যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতে দেখছো, একজন সুদক্ষ কারিগর তোমাদের চোখের আড়ালে বিশেষ একস্থান থেকে এসব কিছুই পরিচালিত করছেন।

এই ব্যক্তি তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। মানুষ তাঁর দাবী গ্রহণ করলো না। তারা তাদের বিভিন্ন বিশ্বাসে অটল রইলো। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবীকে তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। শুধু তাই নয়, মানুষ তাঁকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার শুরু করলো। গোটা দেশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। তাঁকে শারীরিকভাবে প্রহৃত হতে হলো, অপমানিত লাঞ্ছিত করা হলো, বাড়ি-ঘর ছাড়া করা হলো এবং দেশ থেকেও বহিষ্কার করা হলো।

তাঁর ওপরে মানুষ নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দিল। কিন্তু তিনি তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। সমস্ত বিপদ নির্যাতন তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েও তিনি তাঁর দাবী মানুষের সামনে পেশ করতে থাকলেন। মানুষ তাঁকে তাঁর দাবী প্রত্যাহার করার জন্য ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন ও লোভ-লালসা দেখালো, অবশেষে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করলো, তবুও তিনি তাঁর দাবী হতে বিচ্যুত হলেন না। তাঁর দাবীর সপক্ষে তিনি নানা প্রমাণ পেশ করতে থাকলেন। তিনি তাঁর আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ও কার্যাবলী দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, তিনি তাঁর দাবীতে পাহাড়ের মতই অটল রয়েছেন।

এই দাবী করতে করতে এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আবার দীর্ঘ দিন পরে আরেক ব্যক্তি এসে ঐ পূর্বের লোকটির মতো একই দাবী করতে থাকলো। অথচ এই দুই ব্যক্তির ভেতরে কোনো সময় দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। প্রথম ব্যক্তির ইন্তেকালের বহুদিন পরে পরবর্তী ব্যক্তি পৃথিবীতে এসে প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ দাবী পেশ করতে থাকলো। মানুষ এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথেও একই আচরণ করলো; যেমন তারা প্রথম ব্যক্তির সাথে করেছিল।

এভাবে একদিন এই ব্যক্তিও ইন্তেকাল করলো। দীর্ঘদিন পরে আরেক ব্যক্তি এলেন। তিনিও ঐ একই দাবী দৃঢ়তার সাথে পেশ করলেন। তিনিও নির্যাতিত হলেন। এই দাবীদারদের আগমন ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলো। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে এক সময় লক্ষাধিক হয়ে গেল। তাঁরা সবাই ঐ প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ দাবী করতে থাকলেন। প্রথম ব্যক্তি যে শব্দে দাবী পেশ করেছিলেন, শেষের ব্যক্তিও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ একই শব্দে দাবী পেশ করলেন।

স্থান কাল অবস্থার পার্থক্য ছিল, পরিবেশের পার্থক্য ছিল তবুও তাদের দাবীর মধ্যে সামান্য পার্থক্য সূচিত হলো না। দেশের লোকজন তাঁর সাথে শত্রুতা করলো। তাঁকে পাগল, যাদুকর,

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করলো। তাঁর দেহের রক্ত-মাংস ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলো। নানা লোভ দেখালো। তবুও তিনি বা তাঁরা তাদের দাবী হতে সরে দাঁড়ালেন না অথবা তাদের দাবীর মধ্যে পরিবর্তন আনলেন না এবং তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখা দিল না।

পৃথিবীর কোনো শক্তিকেই তাঁরা পরোওয়া করলেন না। সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে, তাঁর প্রাণ হরণ করার জন্য ওৎ পেতে থেকেছে। তাঁকে দেশের বাদশাহ বানানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী তাঁকে ভোগের জন্য দিতে চেয়েছে। সম্পদের পাহাড় এনে তাঁর পায়ের কাছে জমা করেছে। তবুও তাঁরা তাদের দাবী হতে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হননি। গোটা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাদের মানসিক দৃঢ়তা অবলোকন করেছে। দেখেছে তাদের অসীম ধৈর্য্য। তাঁরা সবাই এই দাবী করেছেন যে, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোনো মানুষের কাছে নেই।'

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, যারা এই দাবী করতেন, তাঁরা সে সমাজের একজন ছিলেন এবং যাবতীয় দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। একজন মানুষও তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে শোনেনি। কোনো ধরনের দুষ্কর্মের সাথে তাঁকে কেউ কখনো জড়িত হতে দেখেনি। কোনো নারীর প্রতি তাঁকে কেউ কখনো খারাপভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখেনি। কারো আমানতের খেয়ানত করতে দেখেনি। তিনি কারো সাথে কখনো অন্যায় আচরণ করেছেন, তা কেউ দেখেনি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সে সমাজের সবচেয়ে চরিত্রবান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তাদের একজনের সাথে আরেক জনের দেখা সাক্ষাৎও হয়নি যে, তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে মানুষের কাছে একই দাবী পেশ করবে।

তিনি কখনো অসংলগ্ন কথা বলেছেন, তা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এক কথায় তিনি ছিলেন সবদিক দিয়ে কলুষমুক্ত। তাঁর মতো সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে সমাজে কেউ ছিল না, এ কথা তাঁর প্রাণের শত্রুও স্বীকার করতো। তিনি এমন সব কথা বলতেন, এমন শিক্ষা মানুষকে দিতেন, এমন আইনকানুন মানুষের সামনে পেশ করতেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ উপস্থাপন করতে পারতো না। গোটা পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ তাঁর শিক্ষা ও বিধান সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন।

www.pathagar.com

প্রয়োজন বিচারক সুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সামনে দুটো দল বর্তমানে আছে। একটি দল হলো, পরস্পর বিরোধী চিন্তার অধিকারী দল। কিন্তু তাদের ভেতরে চিন্তা ও মতামতের পার্থক্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে বিরোধিতা করছে, যিনি বা যারা বলছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোনো মানুষের কাছে নেই।'

আরেকটি দল হলো, সে সমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী লোকের দল, যাঁরা যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দাবী করছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোনো মানুষের কাছে নেই।'

এই দুটো দলের মধ্যে কোনো দলটি মহাসত্যের ওপর অবস্থান করছে, এই বিচার করবে কে? পৃথিবীর বুকে এমন কোনো আদালত বর্তমানে রয়েছে, যে আদালত এই দুই দল অর্থাৎ নবী-রাসূলের দল এবং তাদের বিরোধিতাকারী দল– এই দুই দলের যাবতীয় কার্যাবলী সামনে রেখে রায় দেবে অমুক দল মহাসত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত?

হ্যাঁ; সেই আদালত বা বিচারক হলো মানুষের বিবেক আর বুদ্ধি। এই বিবেক বুদ্ধির আদালতে উভয় দলের মোকদ্দমা পেশ করে তারপর বিচার করে দেখতে হবে, কোন্ দল সত্য। কিন্তু তাঁর পূর্বে বিচারক হিসেবে বিবেক-বুদ্ধির দায়িত্ব হলো, সর্বপ্রথমে সে নিজের অবস্থা অনুধাবন করবে। কেননা, স্বয়ং বিচারক অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির অবস্থা হলো, তাঁর কাছেও প্রকৃত সত্য জানার কোনো মাধ্যম বর্তমানে উপস্থিত নেই। বিচারক বা বিবেক-বুদ্ধি স্বয়ং সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। বিচারকের সামনে শুধুমাত্র উভয় পক্ষের অর্থাৎ নবী-রাসূলের এবং তাদের অস্বীকারকারী দলের যুক্তি প্রমাণ, বক্তব্য, তাদের নৈতিক চরিত্র, সামাজিক চরিত্র, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও কিছু নিদর্শন রয়েছে।

এসবের প্রতি বিচারক সুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এসব দিক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে তাকে দেখতে হবে, এই দুই দলের ভেতরে কোন্ দল সত্যের কাছাকাছি অবস্থান করছে বা কোন্ দলের দাবী সত্য। এই সিদ্ধান্ত বিবেক-বুদ্ধি নামক বিচারককে গ্রহণ করতে হবে। বিচারককে প্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে ঐ দলের প্রতি, যেদল বিরোধিতা করছে– সে দলের অবস্থা কি? সে দলের অবস্থা হলো, তারা যে সত্য বিশ্বাস করছে, তাদের বিশ্বাসের ভেতরে একতা নেই। তাদের বিশ্বাস নিয়ে তারা বিভক্ত। নবীর সাথে বিরোধিতার ব্যাপারে তারা একজোট হলেও তারা নিজেরা নিজেদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসারী। তারা নিজেরাও স্বয়ং স্বীকার করছে যে, প্রকৃত সত্য জানার কোনো মাধ্যম তাদের কাছে নেই। তারা পরস্পরে শুধু এ দাবী করছে যে, তোমাদের তুলনায় আমরা অধিক সত্যের অনুসারী। আমরা যে অনুমান করছি, আমাদের অনুমান তোমাদের অনুমান অপেক্ষা শক্তিশালী। বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটি সামনে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

তাদের বিশ্বাসের প্রতি তারা অটল নয়। তাদের জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা ততই নিজেদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। নিজেরা নিত্য-নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করছে। ক্ষণে ক্ষণে তারা তাদের মত পরিবর্তন করছে। কোনো একটি বিশ্বাসের ওপর অটল থাকছে না। আজ যে বিশ্বাস নিয়ে উল্লসিত হচ্ছে, পরের দিন তা পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নতুন মত গ্রহণ করছে। বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটিও স্মরণে রাখতে হবে।

'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোনো মানুষের কাছে নেই।' এই দাবীর দাবীদার নবীদের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাদের যুক্তি হলো– নবী যে দাবী করছেন, তিনি দেখে এসেছেন, উক্ত মেশিনগুলো একজন পরিচালিত করছেন, কিন্তু তিনি কিভাবে পরিচালিত করছেন তা নবী দেখাতে পারেননি। অথচ তিনি দাবী করছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোনো মানুষের কাছে নেই।' তাদের এই দাবীর ওপরে কিছুই না দেখে কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটিও সম্মুখে রাখতে হবে।

এবার বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালতকে বা বিচারককে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই' এই দাবী যারা করছেন, তাঁদের প্রকৃত অবস্থা কি? তাঁদের প্রথম অবস্থা হলো, তাঁরা সবাই তাঁদের দাবীর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ এবং যাবতীয় মৌলিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে চিন্তা ও মতের পার্থক্য নেই। দুই একজন ব্যতীত একজনের সাথে আরেকজনের সাক্ষাৎ ঘটেনি, অথচ যে দেশে বা স্থানেই তাঁরা আগমন করেছেন, তাঁরা অভিন্ন দাবী পেশ করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটিও স্মরণে রাখতে হবে।

এই দাবী যারা করছেন, তাঁরা কখনো একথা বলেননি যে, তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে বা অনুমান করে অথবা কল্পনার ভিত্তিতে এই দাবী করছেন। বরং তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবী করছেন যে, উক্ত মেশিনসমূহের কর্ম যারা সম্পাদন করাচ্ছেন, যারা উক্ত মেশিন পরিচালিত করছেন এবং যিনি করাচ্ছেন, তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিচালকের নির্দেশে সেখান থেকে কর্মচারীগণ আমার কাছে আসা যাওয়া করেন, তাঁরা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। আমি নিজের চোখে উক্ত মেশিন পরিচালনার অবস্থা দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের দাবী কল্পনা বা অনুমান নির্ভর নয়। আমরা নিজের চোখে দেখেছি, আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমাদের দাবী পেশ করছি। বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটিও স্মরণে রাখতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি যে দাবী করেছিল, তারপর থেকে যতো ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, তাঁরা সকলেই ঐ একই দাবী করেছেন। জীবনের প্রথম থেকে তাঁরা অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত একই দাবী করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁদের দাবীর ভেতরে কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি করেননি। প্রথম ব্যক্তি যা বলেছেন, শেষের ব্যক্তিও একই কথা বলেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভেতরে কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি করেননি। বিবেক-বুদ্ধি নামক বিচারককে এই দিকটির প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি দিতে হবে।

যারা এই দাবী করতেন, তাঁরা সে সমাজের সমস্ত দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের জীবনকে সামান্যতম কলুষতাও স্পর্শ করেনি। যারা জীবনের প্রত্যেক দিকে ছিলেন সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ তাঁরা মাত্র এই একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যা দাবী পেশ করতে পারেন না, এদিকটিও বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

তাঁরা যে দাবী করতেন, এই দাবী তাদের জন্য শেষ মুহূর্তে এমন কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে, হয় তাঁরা এই দাবীর প্রতি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে প্রাণ দান করবেন নতুবা তাঁরা তাদের দাবীর ব্যাপারে বিজয়ী হবেন। এ কারণে তাদেরকে সংগ্রাম মুখর হতে হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন। রক্ত দিয়েছেন, নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। তবুও তাঁরা তাঁদের দাবীর প্রতি অবিচল থেকেছেন। এই দাবীদারগণ তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে দাবী করেছেন, এ কথা তাঁদের প্রাণের শত্রুও প্রমাণ করতে পারেনি। এদিকটিও বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

এই দাবীদারগণ সমকালীন মানুষকে এ কথা বলেননি যে, তোমরা আমার দাবী গ্রহণ করছো না কেনো? তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও? ঠিক আছে, আমি তোমাদের সামনে তাদেরকে উপস্থিত করছি, যারা উক্ত মেশিনসমূহ পরিচালিত করছেন। তোমাদেরকে আমি ঐস্থান থেকে ভ্রমণ করিয়ে আনছি, যেখান থেকে এসব মেশিন শক্তি লাভ করে কাজ করছে। যে অদৃশ্য জগৎ থেকে এসব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, তোমাদেরকে আমি সেই অদৃশ্য জগতের কর্ম সম্পাদন পদ্ধা দেখাতে পারি। এমন কথা তাঁদের একজনও বলেননি। বরং তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছুই দেখাতে পারবো না। আমার প্রতি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছি, তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। এদিকটিও বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

প্রথম দল যারা দাবী করছে যে, উক্ত মেশিন কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ সম্পর্কে আমরা যা অনুমানের ভিত্তিতে দাবী করছি তা সত্য। তাদের অবস্থা বিবেক নামক আদালত দেখলো। তাদের সার্বিক দিকসমূহ বিবেকের আদালত পর্যালোচনা করে এটাই অনুধাবন করলো যে, তাদের কাছে প্রকৃত সত্য নেই। কেননা, তারা নিজেদের অবস্থানে অত্যন্ত নড়বড়ে। নিজের বিশ্বাসের প্রতি তারা অটল তো নয়ই এমনকি নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতেও তারা ব্যর্থ।

দ্বিতীয় দল অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ যে দাবী করছেন, তাদের দাবীর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ তাঁরা দেখাতে পারেন। তাঁরা এমন কিছু মু'যিযা প্রদর্শন করছেন, যে মু'যিযা গোটা পৃথিবীর সমস্ত যাদুকর একত্রিত হয়েও অনুরূপ কোনো ঘটনা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এমন এক মু'যিযা প্রদর্শন করলেন, যে ঘটনা আজ পর্যন্তও কেউ দেখাতে

www.pathagar.com

পারেনি, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এমন মু'যিযার অধিকারী ছিলেন, তাঁর মত মু'যিযা কেউ প্রদর্শন করতে পারেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন সব মু'যিযা দেখিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা কেউ প্রদর্শন করতে পারবে না।

তারপর বিভিন্ন দেশে এবং যুগে বিভিন্ন সময়ে যে সব নবী-রাসূল আগমন করেছেন, সেসব দেশের এত অধিক সংখ্যক মানুষ নবীদের প্রবর্তিত মতবাদের স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি? কারণ সকল নবী-রাসূল এক বাক্যে এই দাবী করেছেন যে, তাঁদের কাছে এক অসাধারণ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে এবং ঐ মাধ্যমের সাহায্যে তাঁরা সবাই বাইরের চিহ্ন এবং নিদর্শনগুলোর অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ অবগত হয়েছেন। এই দিকটি তাদের এই দাবীর সত্যতা গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে আমরা দেখি যে, তাঁরা যে তথ্য পেশ করেছেন, তার ভেতরে সামান্যতম বিরোধ নেই এবং তাদের পরিবেশিত তথ্য জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী নয়। আবার কিছু মানুষের ভেতরে এমন কিছু অলৌকিক শক্তি থাকা যা সাধারণভাবে অন্য মানুষদের মধ্যে থাকে না, তা জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির নীতিমালা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

নবী-রাসূলগণ যা দাবী করছেন, তাঁদের সে দাবীর ব্যাপারে তাদের ভেতরে সামান্যতম দুর্বলতা নেই। একজন নবীর সাথে আরেকজন নবীর কোনো বিরোধ নেই। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম মানুষকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর পরে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন, প্রত্যেক নবী-রাসূলই মানুষকে ঐ একটি কথার দিকেই আহ্বান করেছেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদেরকে সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ঐ মহান আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করো, যিনি তোমাদের রব।'

সর্বশেষে এলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তিনিও মানুষকে ঐ একই কথার দিকে আহ্বান করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সাথে পরবর্তী কালের নবী রাসূলদের সাক্ষাৎ হলো না। অথচ তাঁদের সকলের আহ্বান একই দিকে। তাদের আন্দোলনের ভেতরে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা সকলেই তৎকালীন সমাজেই শুধু নয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুরূপ অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে না। সুতরাং তাঁদের দাবী মিথ্যা হতে পারে না এবং এটাই হলো বিবেক-বুদ্ধি নামক আদালতের বা বিচারকের সর্বশেষ রায়। অতএব, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের যে পরিচিতি প্রকাশ করেছেন, সেই পরিচিতিই একমাত্র সত্য। এর বিপরীতে মানুষ এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে যা ধারণা-কল্পনা করে থাকে, তা অবশ্যই ভ্রান্ত।

www.pathagar.com

তাওহীদ ও শিরক

মানব সৃষ্টির সূচনাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মানুষটিকে সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করলেন, তাঁকে সাধারণ কোনো মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করলেন না। বরং তাঁকে নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করলেন এবং তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে জ্ঞান দিলেন। সূরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যাবতীয় বস্তুর নাম ও ব্যবহার পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহর দাসত্ব কিভাবে করতে হবে, সেটিও তাঁকে শিক্ষা দেয়া হলো। গোনাহ্ করার পরে তওবা করাও আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে শামিল। কিভাবে তওবা করতে হবে, এ বিষয়টিও পৃথিবীর প্রথম মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা শিক্ষা দিলেন। সূরা বাকারার ৩৭ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ-اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

তখন আদম তার রব-এর কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করলো। তার রব তার এই তওবা মঞ্জুর করলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা)

শুধু তওবাই মঞ্জুর করা হলো না, পৃথিবীতে কোন্ বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করলে পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করা যাবে, সে বিষয়টিও মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে দিলেন-

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছবে, যারা আমার সেই বিধান অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। (বাকারা-৩৮)

সুতরাং মানব সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের কাছে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কিত বিষয়াদি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। এ কারণেই কোরআন থেকে এ কথা জানা যায় যে, অপরাধ সংঘটিত হবার পরে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম অন্য কারো কাছে অনুতপ্ত হননি। অনুতাপবোধে তাড়িত হয়ে নিজের অপরাধের জন্য অন্য কারো কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। কিন্তু কেনো করেননি? ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, এ জ্ঞান কি তাঁর ছিলো না?

ক্ষমা প্রার্থনার জ্ঞান তাঁর ছিলো এবং তিনি এ কথা জানতেন যে, ক্ষমা মঞ্জুর করার মালিক হলেন আল্লাহ তা'য়ালা এবং একমাত্র তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কারো কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে শিরক করা হবে, এ জন্য তিনি একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّا مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

হে আমাদের রব! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা আল আ'রাফ-২৩)

www.pathagar.com

সুতরাং তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে জ্ঞান সৃষ্টির সূচনাতে যেমন মানুষকে দেয়া হয়েছে, পরবর্তীতে সকল নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের সেই ভুলে যাওয়া শিক্ষা নতুন করে দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল মানুষকে তওহীদ ও শিরক সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেছেন এবং মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের সকলের আহ্বান ছিলো-

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ-

হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। (সূরা আল আ'রাফ-৫৯)

নবী-রাসূলদের এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই তওহীদ ও শিরক-এর মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ রেখা টেনে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে, তাওহীদ কি এবং কোন্‌টি শিরক। অর্থাৎ একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব করাই হলো তাওহীদ আর তাঁর দাসত্ব পরিত্যাগ করে অন্য কারো দাসত্ব করাই হলো শিরক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব স্বীকার করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা। এতেই তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় নিহিত রয়েছে। (সূরা বাকারা-২১)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, এর মধ্যেই তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দাসত্ব করার মধ্যেই রয়েছে শিরক থেকে আত্মরক্ষার করার উপায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানব মন্ডলীর জন্য যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছিলেন, এই জীবন বিধানের ভিত্তি ছিলো তাওহীদ এবং পরিশেষে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে পবিত্র কোরআন নামক যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, এর ভিত্তিও তাওহীদ। সকল নবী ও রাসূল মানুষকে শিরক মুক্ত করণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সূরা যুমারের ৬৫ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

তোমার কাছে এবং ইতোপূর্বেকার সকল নবীর কাছে এ অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রায় প্রত্যেক সূরায় তাওহীদের বিষয়টি বিভিন্নভাবে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়- তাওহীদ সম্পর্কে কোরআনে স্বতন্ত্র একটি সূরাও

www.pathagar.com

অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে সূরাটি হলো ত্রিশপারার সূরা ইখলাস। আমরা তাফসীরে সাঈদী-আমপারার সূরা ইখলাসের তাফসীরে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং সূরা লুকমানের এই তাফসীর অধ্যয়নকালে সূরা ইখলাসের তাফসীর সামনে রাখলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে।

মনে রাখতে হবে, তাওহীদের বিষয়টি ইসলামে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়টি বুঝে অনুসরণ করা না করার ওপরই মানুষের মুক্তি, সফলতা, কল্যাণ তথা জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করে। প্রকৃত তাওহীদ বুঝে সেই জ্ঞান অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপন যেনো সহজ হয়, এই লক্ষ্যে চিন্তাবিদ, গবেষক ও কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী মনীষীগণ তাওহীদের এই বিশ্বাসকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

তাওহীদের প্রথম পর্যায়

তাওহীদের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক, একক ও অদ্বিতীয়- এই বিষয়টি আমরা তাফসীরে সাঈদী-আমপারার সূরা ইখলাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাওহীদের এই বিষয়টি অধ্যয়নকালে উক্ত সূরার তাফসীর সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। তাওহীদের এই প্রথম বিষয়টি হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মূল সত্তা। অর্থাৎ তিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর অনুরূপ বা সাদৃশ্য কিছু নেই, তাঁর সাথে উপমা বা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে, এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাঁর প্রতিকৃতি কল্পনাও করা যায় না। তিনি অখন্ড মহান সত্তা, তিনি অবিভাজ্য, তাঁর সত্তা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। সৃষ্টি লোকের কোনো বস্তুর মতো তিনি নন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يُحْىٖ وَيُمِيْتُ-وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ-وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

আল্লাহর তাস্বীহ্ করছে এমন প্রত্যেকটি জিনিসই যা পৃথিবী ও আকাশরাজ্যে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন তিনিই এবং সব কিছুর ওপর তিনিই শক্তিমান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমানও, তিনি প্রচ্ছন্নও এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হাদীদ-১-৩)

سُبْحٰنَه وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

পবিত্র তিনি এবং এরা যে শির্ক করছে তার উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। (সূরা নাহ্ল-১)

যাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তা'য়ালা একা নন এবং তাঁর সাথে আরো অংশীদার রয়েছে। এসব লোক এতটাই নির্বোধ, এই ছোট্ট বিষয়টি

www.pathagar.com

এদের মাথায় প্রবেশ করে না– সাধারণ কয়েকজন সদস্যের একটি পরিবারে যদি দুইজন কর্তা হয়, তাহলে সেই পরিবারের ব্যবস্থাপনা ক্ষণিকের জন্যেও ভালোভাবে চলে না। একটি স্কুলে দুই জন প্রধান শিক্ষক, একটি ইউনিয়নে বা পৌরসভায় দুই জন চেয়ারম্যান, একটি আসনে দুই জন পার্লামেন্ট সদস্য, একটি জেলায় দুই জন ডিসি– এ কথা কি কল্পনা করা যায়? এ থেকেই তো স্পষ্ট বুঝা যায়, এই মহাবিশ্বের সমগ্র ব্যবস্থা পৃথিবীর অতল তলদেশ- ভূগর্ভের স্তর থেকে শুরু করে ঐ মহাকাশে সবথেকে দূরে অবস্থানকারী গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত একটি বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর অসংখ্য ও অগণিত বস্তুগুলোর ভেতরে যদি একের সাথে অপরের সামঞ্জস্য, সমঝোতা, সমতা, সহযোগিতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকতো, তাহলে এই বিশ্ব ব্যবস্থা মুহূর্তকালের জন্যও সঠিক নিয়মে চলতো না। এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الِهَةٌ الاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا-

যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ইলাহ থাকতো, তাহলে পৃথিবী ও আকাশ উভয়ের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। (সূরা আল আম্বিয়া-২২)

এসব সৃষ্টির পেছনে কোনো প্রবল শক্তিশালী সত্তা ও মহাক্ষমতাধরের আইন-বিধান এসব অসংখ্য সৃষ্টি বস্তু ও শক্তিকে পূর্ণ সমতা ও ভারসাম্য সহকারে একের সাথে অপরকে সহযোগিতা করতে বাধ্য না করতো, তাহলে মহাবিশ্বে কি সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকতো? একথা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে যে, অসংখ্য এবং পৃথক পৃথক স্বাধীন দেশে সার্বভৌম শাসকের রাজ্যে একই ধরনের আইন ও নিয়ম পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে পারে? গোটা মহাবিশ্বের প্রত্যেক সাম্রাজ্যে যে সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে এবং তা মানুষ স্পষ্ট অনুধাবন করছে, যেমন সূর্যের সাম্রাজ্যে চন্দ্র প্রবেশ করে না, দিনের সাম্রাজ্যে রাত প্রবেশ করে না। এই নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা স্বয়ং একথারই প্রবলভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনের ক্ষমতা একই সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত রয়েছে, মহাবিশ্বের পরিচালকের অস্তিত্ব একক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিভক্ত নয়। সূরা মু'মিনুন-এর ৯১ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ-

এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। এবং তারপর তারা একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হতো।

চিন্তাশীল মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় রয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিতে অসংখ্য শক্তি কার্যকর রয়েছে এবং অগণিত বস্তু ও গ্রহ-নক্ষত্র মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এসব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা কার্যকর রয়েছে এবং এটাই স্পষ্ট

www.pathagar.com

প্রমাণ করছে যে, সমগ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মাত্র একজন আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। আল্লাহর যদি কোনো অংশীদার থাকতো, তাহলে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা নিয়ে অর্থাৎ কর্তৃত্ব নিয়ে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো এবং একজন আরেকজনের সিংহাসন দখল করার প্রচেষ্টা চালাতো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ الِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيلاً- سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّ يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا-

এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো। পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪২-৪৩)

এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামান্য একটি শস্য দানা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমগ্র বিশ্ব জাহান তথা পৃথিবী ও আকাশরাজ্যে এবং এর মধ্যস্থিত যাবতীয় শক্তির কিছু না কিছু ভূমিকা কার্যকর রয়েছে। মাটি বীজ ধারণ করছে, উর্বরা শক্তি প্রদান করছে, বাতাস তার গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সাহায্য করছে, আকাশ থেকে পানি ও সূর্যের তাপ সহযোগিতা করছে অর্থাৎ সকল শক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টায় শস্য দানা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব শক্তি ও সাম্রাজ্যে যদি পৃথক পৃথক সার্বভৌম শাসকের অস্তিত্ব থাকতো অথবা আল্লাহ তা'য়ালা যদি পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমতা ভাগ করে দিতেন, তাহলে সমন্বিত প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হতো না। বাতাস সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক যথাসময়ে বাতাস প্রবাহিত করতো না। তাপশক্তির নিয়ন্ত্রক যথানিয়মে তাপ দেয়া থেকে বিরত থাকতো। পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রক সঠিক সময়ে পানির ধারা প্রবাহ করতো না। বরং একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।

যেসব নির্বোধ মানুষ মহান আল্লাহর সত্তাকে অবিভাজ্য মনে করে না তাদের ধারণার প্রতিবাদ করে পবিত্র কোরআন বলছে-

اَللّهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ-هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ-سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ-

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে? পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তার বহু উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। (সূরা রূম-৪০)

আল্লাহর সাথে যারা অন্য শক্তিকেও কল্পনা করে, তাদের ধারণা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে-

اَمْ لَهُمْ اِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ سُبْحَنَ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ব্যতীত এদের আরও কোনো ইলাহ্ আছে নাকি? আল্লাহ মহান ও পবিত্র সেই শিরক থেকে যা এসব লোক করছে। (সূরা আত্ তুর-৪৩)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও একক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৬৩ আয়াত ঘোষণা করছে-

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ-لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ-

তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক, সেই মেহেরবান ও দয়ালু ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই।

এই ধারণা ও বিশ্বাসের পেছনে কোনোই যুক্তি নেই যে, আল্লাহ তা'য়ালা অংশীদার বানিয়ে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব তাদের ওপরে ন্যস্ত করেছেন। বরং তিনি এক ও একক এবং সমস্ত সৃষ্টিসমূহের মালিক তিনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاۤءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا-

সেই একজনই আকাশেও আল্লাহ্ এবং যমীনেও আল্লাহ। তিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী। অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা যার মুষ্টিতে যমীন ও আকাশসমূহ এবং যমীন ও আকাশে যা কিছু রয়েছে তার প্রত্যেক জিনিসের বাদশাহী। (সূরা আয্ যুখরুফ-৮৪-৮৫)

আল্লাহ তা'য়ালা এক ও একক। তিনি এমন অক্ষম নন যে, তিনি নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব একা পরিচালিত করতে পারেন না বিধায় অন্যদের ওপর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কারো প্রতি তাঁকে নির্ভর করতে হয় না এবং তাঁর কোনো সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কেউ অংশীদার ছিলো না। তিনি একাই আপন ক্ষমতাবলে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তেমনি তাঁর ক্ষমতাতেও কেউ শরীক নেই। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্বে তাঁর শরীক কেউ নেই। (সূরা আল ফোরকান-২)

তাঁর ক্ষমতা বিভক্ত নয়, একমাত্র তাঁর কাছে কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেক জিনিসের সার্বভৌমত্বই তাঁরই মুষ্টিবদ্ধ। (সূরা ইয়াছিন-৮২)

তিনিই এক, একক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁকে কারো কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে-

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ-

তিনি যা করেন সেজন্য তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বরং অন্য সবাই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। (সূরা আল আম্বিয়া-২৩)

অতএব গোলামী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। যেসব মানুষ আইন-কানুন, মতবাদ-মতাদর্শ তৈরী করে অন্য মানুষকে তা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানায়, তারা হলো পথভ্রষ্টকারী। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি কাজে এদের অংশ গ্রহণ দূরে থাক, এরা নিজেরাই মহান

www.pathagar.com

আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তাঁরই আইন মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَا اَشْهَدْ تُّمْ خَلْقَ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا–

আমি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাইনি। আর না আমার সৃষ্টি কাজে তাদেরকে শরীক করেছিলাম। আর পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা আমার নীতি নয়। (সূরা কাহ্ফ-৫১)

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرتٍ بِاَمْرِه اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبرَكَ اللّهُ رَبُّ الْعلَمِيْنَ–اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً–

তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন-বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। তোমরা আল্লাহকে ডাকো, মিনতি পূর্ণ কণ্ঠে ও চুপে চুপে। (সূরা আ'রাফ-৫৪-৫৫)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ–اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ–قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ–اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ–

হে নবী! বলে দাও, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো যে, আল্লাহ তা'য়ালা যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপরে দীর্ঘ করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাওনা? হে নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ আছে যে, রাত এনে দিতে পারবে– যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পারো? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না? (সূরা কাসাস-৭১-৭২)

সুতরাং তাওহীদের প্রথম পর্যায় হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এক, একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই এই প্রয়োজনীয়তা থেকে তিনি মুক্ত। এই বিশ্বাসে কারো যদি সামান্যতম দুর্বলতা থাকে, তাহলে তার যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসে কোনো ধরনের বক্রতার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। কথা, কাজ ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তাওহীদের প্রতি এই বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায়

তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, মহান আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কথা, কাজ ও চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করা। আর এর জন্য অপরিহার্য হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। মানুষ যদি না জানে যে, তাঁর মনিব কোন্ কোন্ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী, তাহলে সে মানুষ নিজের অজান্তেই অন্যের মধ্যে এমন ধরনের গুণের সমাবেশ আছে বলে বিশ্বাস করবে, যে গুণের অধিকারী স্বয়ং তারই মনিব। আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সত্তা অবিভাজ্য, এই বিষয়টির প্রতি ঈমান আনার পরে মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীর ওপর ঈমান আনতে হবে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহর গুণাবলী অতুলনীয় ভাব ও ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে, যা থেকে আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। পবিত্র কোরআনের দুটো স্থানে আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীর ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম স্থান হলো-

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ-لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه-يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ-وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه اِلَّا بِمَاشَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَلَايَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا-وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে এমন আছে, যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সম্মুখে রয়েছে, তাও তিনি জানেন আর যা কিছু তাদের অগোচরে, সে সম্পর্কেও তিনি পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন। তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোনো জিনিসই তাদের জ্ঞান-সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে দান করতে চান (তবে ভিন্ন কথা)। তাঁর কর্তৃত্ব সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা। (সূরা বাকারা-২৫৫)

উল্লেখিত আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত এবং হাদীসে এই আয়াত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে এই আয়াত তিলাওয়াত করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য রাত ব্যাপী প্রহরাদার নিযুক্ত করে দিবেন। প্রহরায় নিযুক্ত ফেরেশ্তা তার সাথে সকাল না পর্যন্ত থাকবে এবং শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না। (বোখারী)

www.pathagar.com

আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত আয়াতটি মোট দশটি বাক্য নিয়ে গঠিত এবং এর প্রত্যেকটি বাক্যই অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার গুণ-বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যারা মনে করে, মহান আল্লাহ ব্যতীতও আরো অনেক ইলাহ্ রয়েছে এবং মহাবিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই অন্যান্য ইলাহও ভূমিকা পালন করে। এসব ধারণা খন্ডন করে আয়াতুল কুরসীতে বলা হয়েছে, অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধ লোকগুলো নিজেদের কল্পনা শক্তি দিয়ে যত ইলাহ্-ই বানিয়ে নিক না কেনো, প্রকৃত সত্য এটাই যে- মহান আল্লাহ এককভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই।

তিনি অবিনশ্বর- চিরঞ্জীব। তিনি সৃষ্টির অনুরূপ কখনো অনস্তিত্ব ছিলেন না, অবিনশ্বরত্ব শুধুমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল তিনিই শুধু অমর, অক্ষয় ও অবিনশ্বর। অবিনশ্বরের এই গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র তিনিই। পবিত্র কোরআন বলছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ-وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ-

এই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব-এর মহান সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। (সূরা আর রাহ্মান-২৭)

যেসব নির্বোধ লোকগুলো ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে অক্ষয়-অবিনশ্বর, শাশ্বত-চিরন্তন মনে করছে, তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র অবশিষ্ট থাকবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবিনশ্বর, চিরন্তন-শাশ্বত শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম সত্তা, যাঁর বিরাটত্ব, মহানত্ব ও অবিনশ্বরত্ব সম্পর্কে সমস্ত সৃষ্টিলোক সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই অবিনশ্বর-চিরঞ্জীব আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব ধ্বংসশীল সত্তাকে যারা নিজেদের মা'বুদ, ইলাহ, বিপদ দূরকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, আকাঙ্খা পূরণকারী ইত্যাদি মনে করে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের জন্য ঐ চিরঞ্জীব সত্তা মহান আল্লাহর দিকে নিজেদের ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে রেখেছে। যারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে না, তারা অন্যকে কিভাবে রক্ষা করবে? পৃথিবী থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সীমাহীন-শেষহীন বিশালতায় যা কিছুই হচ্ছে তা সবই একমাত্র সেই চিরঞ্জীব মহান আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। মূল কার্যকারণে তিনি একা ব্যতীত দ্বিতীয় কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার মতো শক্তির অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ-

আর আল্লাহই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করতে পারে এমন কেউ-ই নেই। (সূরা আর রা'দ-৪১)

তিনি নিজস্ব সত্তা দ্বারাই চিরঞ্জীব এবং তাঁরই অনুগ্রহ শক্তির ওপর নির্ভর করেই সমগ্র সৃষ্টিলোক সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নিজের বিশাল সাম্রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি তিনি একা নিজেই, অন্য কেউ তাঁর অনুরূপ গুণের অধিকারী হতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, এসবের তিনিই নিরঙ্কুশ মালিক। সমস্ত কিছুই তাঁর

www.pathagar.com

মালিকানায়, ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বে এবং রাজত্ব ও বাদশাহীর ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো শক্তির বিন্দুমাত্র শরীক নেই। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যে সত্তাকে ইলাহ মনে করে, সেই ইলাহ সৃষ্টিসমূহের মধ্য থেকেই একটি হবে। যেমন চাঁদ, সূর্য, তারকা, বৃক্ষ, প্রস্তর খন্ড অথবা অন্যান্য কিছু। এসবই ধ্বংসশীল এবং এসবের মালিকও সেই অবিনশ্বর সত্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এসব কিছু তাঁরই দাসানুদাস মাত্র।

মহান আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে এটাও অন্যতম গুণ যে, সৃষ্টি করতে ও সৃষ্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ক্লান্ত হন না, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না, এ জন্য তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শও করে না। তিনি অবষন্ন হন না, ভুলেও যান না এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগীও হন না। মানুষ যেমন অপূর্ণ, নগণ্য ও তুচ্ছ সত্তার অধিকারী এবং যেসব দুর্বলতা স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসবের অনেক উর্ধ্বে। এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, মহান আল্লাহর ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবে বা তার কথায় আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন। কারো এ সাহসও নেই যে, তাঁর সম্মুখে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কথা বলবে। মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো ব্যাপারে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। (সুপারিশ বা শাফায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে তাফসীরে সাঈদী-আমপারা সূরা নাবা-এর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর আয়াত দেখুন)

আর দ্বিতীয় স্থান হলো সূরা হাশরের নিম্নে উল্লেখিত আয়াতসমূহে-

هُوَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ-هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ-هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-يُسَبِّحُ لَه مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ-وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনিই রহমান ও রাহীম। তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি মালিক বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। পরিপূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ পবিত্র ও মহান সেই শিরক থেকে যা লোকেরা করছে। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর তাসবীহ করে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং মহাবিজ্ঞানী। (সূরা আল হাশর-২২-২৪)

(মহান আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নাম রহমান ও রাহীম-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াত)

www.pathagar.com

মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে যে দয়া ও অনুকম্পা দেখা যায়, তা নিতান্তই আংশিক ও সীমাবদ্ধ। এই দয়া ও অনুকম্পা মানুষ বা অন্যান্য জীবের অভ্যন্তরীণ নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এই দয়া ও অনুকম্পা মহান আল্লাহ তা'য়ালার দান এবং সৃষ্টির প্রয়োজনেই তিনি তা দান করেছেন। এক সৃষ্টি আরেক সৃষ্টির প্রতি যে মমতা বা দয়া অনুভব করে, একে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতিপালন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মাধ্যমে পরিণত করেছেন এবং এটাও মহান আল্লাহর একান্তই অনুগ্রহ। উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনিই প্রকৃত বাদশাহ। এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও নিরঙ্কুশ বাদশাহ্ একমাত্র তিনিই। তাঁর প্রভুত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা সমগ্র সৃষ্টিলোকের ওপর নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে পারে, এমন শক্তির অস্তিত্ব সৃষ্টিলোকের কোথাও নেই। তাঁর ব্যবস্থাপনায় কেউ শরীক নেই। সূরা সিজ্‌দা-এর ৫ আয়াতে বলা হয়েছে-

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ-

আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল পর্যন্ত সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপনা শুধু তিনিই করে থাকেন।

মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই গোলাম এবং সমস্ত কিছুই তাঁর আদেশের অধীন। সূরা রূম-এর ২৬ আয়াত জানিয়ে দিচ্ছে-

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ-

পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর দাসানুদাস, সবই তাঁর আদেশানুগত।

সৃষ্টিসমূহ সূচনা থেকে যেমন তাঁরই আদেশের অনুগত এবং পরিশেষে সমস্ত কিছুরই পরিণতি হলো তাঁরই দিকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ-إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ-

পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের বাদশাহী-সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র তাঁরই এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। (সূরা আল হাদীদ-৫)

পৃথিবীতে কেউ কাউকে অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ, ধন-দৌলত বা ক্ষমতা দান করলে তা পরবর্তীতে ছিনিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা এমনই এক বাদশাহ যে, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা সংকুচিত করার, সীমাবদ্ধ করার, হারিয়ে যাওয়ার, হ্রাস পাবার, ছিনিয়ে নেয়ার মতো শক্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। তিনি কোন্ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বাদশাহ, কোন্ প্রকৃতির সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তা সূরা হাশরের শেষ আয়াতসমূহে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তিনি হলেন সেই বাদশাহ, যিনি রহমান ও রাহীম। যিনি কুদ্দুস, সালাম, মুমিন, মুহাইমিন, আযীয, জাব্বার, মুতাকাব্বির, খালিক, বারী এবং মুছাব্বির।

যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুর্বলতা, ত্রুটি ও অপবিত্রতা রয়েছে, এর বিপরীত শব্দ হলো কুদ্দুস। এই শব্দ এমন এক সত্তার প্রাতি প্রয়োগ হবে, যে সত্তায় কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি,

অসম্পূর্ণতা, অপবিত্রতা, দুর্বলতা, বিষন্নতা, অবসন্নতা, অশোভনতা বা অশুচিতা থাকবে না। পবিত্র কোরআন বলছে–

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ–

পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি সম্মান-মর্যাদার অধিকারী। (সূরা সাফ্‌ফাত-১৮০)

এই ধরনের সত্তার অধিকারী কোনো মানুষ বা কোনো সৃষ্টিই হতে পারে না। কোনো সৃষ্টির মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না বিধায় সৃষ্ট কোনো বস্তু মানুষের প্রকৃত মা'বুদ, ইলাহ্ বা মালিক হতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই এসব গুণের অধিকারী এবং তিনিই মানুষের প্রকৃত বাদশাহ্।

সূরা হাশরের শেষ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর পরবর্তী গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী। মনে রাখতে হবে, সৃষ্ট কোনো প্রাণী বা বস্তু নিজের নিরাপত্তা বিধান নিজে করতে পারে না। নিরাপত্তার জন্য তাকে কোনো মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু ঐ মহান আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ হলেন মানুষের এমন বাদশাহ যে, তিনিই সকল কিছুর নিরাপত্তা দানকারী এবং এই গুণ কোনো সৃষ্টির মধ্যে নেই বিধায় এক সৃষ্টি আরেক সৃষ্টির মা'বুদ, মনিব, ইলাহ, আইনদাতা বিধানদাতা তথা বাদশাহ হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সেই বাদশাহ্, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখেন–

اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ–

এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রত্যেক জিনিস দেখছেন? (সূরা হামিম সাজ্‌দা-৫৩)

এরপরের গুণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মুমিন এবং মুমিন শব্দের অর্থ হলো, যে অন্যদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। তাঁর দ্বারা কারো ক্ষতি হওয়া বা ক্ষতির কল্পনাও করা যায় না। একমাত্র মহান আল্লাহই হলেন সেই বাদশাহ্, যাঁর কাছে সমগ্র সৃষ্টি নিরাপদ, তাঁর কাছ থেকে কোনো সৃষ্টি সামান্যতম ক্ষতির আশঙ্কা করে না। আল মুমিন হলো সেই সত্তা, যে সত্তার কাছ থেকে সমগ্র সৃষ্টি ওয়াদা ভঙ্গ, হক নষ্ট, কর্মফল নষ্ট বা অন্য কোনো ধরনের ক্ষতির কল্পনাও করতে পারে না। এই ধরনের গুণাবলী একমাত্র মহান আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে। সকল সৃষ্টির অধিকার মহান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ–

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অন্যায় করেন না। (সূরা আনফাল-৫১)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কারো বিন্দু পরিমাণ অধিকার বিনষ্ট করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজেদের অধিকার নষ্ট করে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ–

নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের ওপর জুলুম করেন না, লোকেরা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুম করে। (সূরা ইউনুস-৪৪)

এরপরের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি সমগ্র সৃষ্টির সংরক্ষক, পর্যবেক্ষক এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী। তিনি মহাপরাক্রমশালী সত্তা, যাঁর বিরুদ্ধে কেউ সামান্যতম আওয়াজও করতে পারে না, তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি বিরাট, বিশাল ও মহান কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি মহানত্ব ও বড়ত্ব গ্রহণকারী। বড়ত্ব একমাত্র তাঁরই শোভা পায়। তিনি সমগ্র সৃষ্টির পরিধি নির্ধারক, পরিমাণ নির্ণয়কারী ও পরিকল্পনাকারী। তিনিই মহাবিশ্বকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, সমস্ত কিছুর তদারক করছেন, যাবতীয় সৃষ্টির সুবিধা-অসুবিধা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। তিনিই সৃষ্টির চাহিদা পূরণ করেন, তাঁর জন্যে রয়েছে অতীব সর্বোত্তম নামসমূহ এবং তিনিই যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিধায় তিনিই মানুষের প্রকৃত বাদশাহ।

আল্লাহর অবস্থান ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপক ধারণা

গোটা আকাশ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। এই আকীদার প্রশ্নে মুসলমানকে বুঝতে হবে-জানতে হবে আল্লাহ্ কোথায় আছেন? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোরআন ও সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, তবুও না জানার কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। যে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অনেকে বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বত্র বিরাজমান এবং হাজির-নাজির। এই ধারণা ও বিশ্বাস সঠিক নয়, কোরআন ও হাদীসের বিপরীত। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবস্থান আরশের ওপর কিন্তু তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমতা, কুদরত ও দেখা শোনার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন।

আল্লাহ কোথায় আছেন, এই প্রশ্নের জবাব কোনো মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব হবে না বিধায় স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোথায় আছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের অবস্থান সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে, তিনি আরশে আযীমে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

ثُمَّ سْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ-

এরপর স্বীয় আরশের ওপর আসীন হয়েছেন। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪)

এই একই বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনুস, সূরা রা'দ, সূরা ত্বাহা, সূরা ফোরকান, সূরা সিজ্দা ও সূরা হাদীদে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর তিনি

www.pathagar.com

আরশে সমাসীন হয়েছেন- আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার বাস্তব রূপ অনুধাবন করা কোনো মানুষের পক্ষে কক্ষণই সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা এই কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব এবং এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, এসব সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'য়ালা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি বা তিনি সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি। তিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে অচেতন, বেখবর, অসজাগ, অসতর্ক বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি। অথবা সৃষ্টি করে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগৎ পরিচালনার দায়িত্বও কারো প্রতি অর্পণ করেননি।

এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা মহাবিশ্বের শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই নন-তিনি এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পর্যবেক্ষক, সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, আবেদন শ্রবণকারী, দোয়া কবুলকারী এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও বিধান রচনাকারী ও দানকারী।

আল্লাহ তা'য়ালা আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন- এই বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দিয়ে তিনি এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি এই মহাবিশ্বকে অস্তিত্বশীল করে অবসর গ্রহণ করেননি এবং মহাবিশ্ব থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। বরং মহাবিশ্বলোকের ক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ অংশ পর্যন্ত সর্বস্তরের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব তিনিই করছেন। শাসন কার্য পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই মুষ্টিতে নিবদ্ধ। মহাবিশ্ব ও এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু তাঁরই অধীন ও মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর বিধানের অধীনে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিসমূহের ভাগ্য চিরস্থায়ীভাবে তাঁরই বিধানের অধীনে বন্দী।

আল্লাহ তা'য়ালা কয়েকটি স্তরের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন- এই কথার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টি কাজে যেমন কারো কোনো অংশীদার ছিল না, অনুরূপভাবে সৃষ্টি কাজের পরিচালনা, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও কারো সামান্যতম অংশীদারিত্ব নেই। তাঁর আরশ বা সিংহাসন- যা সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে, সেখান থেকেই তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মানুষকেও তিনি স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে ছেড়ে দেননি। মানুষের প্রত্যেকটি স্পন্দনের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বিধি-বিধান প্রয়োজন, সে বিধানও তিনি আরশ বা সিংহাসন থেকে অবতীর্ণ করেছেন।

সুতরাং মানুষের স্বেচ্ছাচারী হওয়া বা নিজের ভাগ্যের মালিক নিজেকে মনে করার কোনো অবকাশ নেই- এই কথাটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে যে, তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রে থেকে তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشَهُ فَوْقَ سَمٰوٰتِهِ وَقَالَ بِاَصْبَعِهِ مِنَ الْقُبَّةِ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা নিজ আর্‌শের ওপর রয়েছেন। তাঁর আরশ হচ্ছে সমস্ত আকাশের ওপর। (আবু দাউদ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরশে আসীন হয়েছেন আর আরশ হলো অগণিত আকাশের ওপরে। আল্লাহ তা'য়ালা যে তাঁর মহান আরশে অধিষ্ঠিত এবং আরশ যে ওপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে–

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ-

তাঁরই দিকে আরোহন করে উত্তম কথা এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। (সূরা ফাতির-১০)

بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ-

বরং আল্লাহ তাঁকে (ঈসাকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে। (সূরা আন্ নিসা-১৫৮)

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে,– এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো স্থান থেকে বা নীচু স্থান থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে অবতীর্ণ করা বুঝায় না। ওপর থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে তা অবতীর্ণ করা বুঝায়। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন সম্পর্কে বলেছেন–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

এটি একটি কিতাব যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসো। (সূরা ইবরাহীম-১)

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ-

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতরণ করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা বুঝিয়েছেন তা দিয়ে তুমি মানুষের মধ্যে শাসন ও ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিসা-১০৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর বায়তুল মাক্‌দাসকে কিবলা হিসেবে নামায আদায় করতেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন, মক্কার কা'বাঘরকে যদি কিবলা বানানো হতো। এ জন্য তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি দিতেন। তাঁর দৃষ্টি দেয়ার অর্থ এটা ছিলো যে, ওপর থেকে আল্লাহ তা'য়ালা যদি কোনো আদেশ দিতেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের মনের অবস্থা দেখলেন এবং জানিয়ে দিলেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ-

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখি। (বাকারা-১৪৪)

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের থেকে মহান আল্লাহর পরিচয় আর কে বেশী কে জানে? তিনিই সবথেকে বেশী আল্লাহর পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওপরে আরশে আযীমে অবস্থান করছেন। এ জন্যই তিনি বার বার ওপরের দিকে তাকাতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ فِى خُطْبَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ-اَلاَهَلْ بَلَّغْتُ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَرْفَعُ اِصْبَعَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ-

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আমি কি তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জবাব দিলেন, অবশ্যই। তখন তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে ইশারা করে আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলী উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। (মুসলিম)

এ কথা যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা সব জায়গায় আছেন বা তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাহলে তিনি পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়, সাগর, মহাসাগর, আকাশ-বাতাস, আগুন-পানি, ময়লা আবর্জনার ভাগাড়, মল-মূত্রের ভান্ড তথা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত সকল স্থানেই তিনি রয়েছেন। যেসব জায়গা অবাঞ্ছনীয়, অবান্তর সেসব জায়গাতেও আল্লাহকে থাকতে হয়। পৃথিবীর সবথেকে নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধময়, অপবিত্র তথা যেখানে বা যে স্থানে কোনো মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়– সেখানেও আল্লাহ তা'য়ালা রয়েছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দাসীকে প্রশ্ন করলেন–

اَيْنَ اللّٰهُ؟ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا؟ قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ-

বলো, আল্লাহ তা'য়ালা কোথায়? দাসী জবাব দিলো, আল্লাহ তা'য়ালা আকাশের ওপর। তিনি পুনরায় সেই দাসীকে প্রশ্ন করলেন– বলো, আমি কে? দাসী জবাব দিলো, আপনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকামকে আদেশ দিলেন, এই দাসীকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে ঈমানদার।

প্রকৃত বিষয় হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন। মূল কথা হলো আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান এই কথার অর্থ হলো আল্লাহর ইলমে, আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে আল্লাহর নজরের সামনে গোটা সৃষ্টি জগত রয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোথায় রয়েছেন, এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগবে। মানুষ এই প্রশ্নের সঠিক জবাব কারো কাছ থেকে পাবে না। এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই এই প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছেন–

www.pathagar.com

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى-وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى-

তিনি পরম দয়াবান। বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন। যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশে রয়েছে, যা কিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে রয়েছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে রয়েছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চাইতেও গোপনে বলা কথাও জানেন। (সূরা ত্বা-হা-৫-৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, এই পৃথিবীতে তোমাদের স্থিতি অবস্থিতি ও তোমাদের শান্তি-নিরাপত্তা প্রত্যেক মুহূর্তেই আমার অনুগ্রহের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তোমরা এখানে আনন্দ-ফূর্তি করছো, অহঙ্কার প্রদর্শন করছো, আমার বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছো, লিখছো, মিছিল-মিটিং করছো, আমার আদেশের বিপরীত পথে জীবন পরিচালিত করছো। এসব কিছু তোমরা করছো তোমাদের নিজেদের ক্ষমতাবলে নয়। তোমাদের জীবনের এখানে অতিবাহিত প্রত্যেকটি মুহূর্ত মহান আল্লাহ তা'য়ালার সংরক্ষণ বা হেফাযতের পরিণতি মাত্র। তাঁর ইঙ্গিতে যে কোনো মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী ভূ-কম্পনের মাধ্যমে এই যমীন তোমাদের জন্য আনন্দ-ফূর্তির স্থান না হয়ে কবরস্থানে পরিণত হতে পারে। তোমরা যেসব বিলাস সামগ্রী নির্মাণ করেছো, সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছো, তা মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ-

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গিয়েছো সেই মহান সত্তা সম্পর্কে যিনি আকাশে রয়েছেন, এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করে দিবেন এবং এই ভূ-তল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হয়ে কাঁপতে শুরু করবে? (সূরা মূল্‌ক-১৬)

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا-

তোমরা কি এই ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়ু প্রবাহিত করবেন? (সূরা মূল্‌ক-১৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের ওপর যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

এই হাদীসেও আল্লাহ তা'য়ালার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি আসমানের ওপরে আরশে আযীমে অবস্থান করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে দিন ও রাতে পালাক্রমে আল্লাহর ফেরেশতারা যাওয়া আসা করে থাকেন।

www.pathagar.com

এই পালা পরিবর্তন হয় আসর ও ফজরের নামাযের সময়। এরপর যেসব ফেরেশ্‌তারা তোমাদের সাথে রাতে থাকেন, তারা আকাশে উঠে যান। তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমারা আমার বান্দাকে কোন্ অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? অথচ তিনি বান্দার অবস্থা সম্যক অবগত রয়েছেন। প্রশ্নের জবাবে ফেরেশ্‌তাগণ বলেন, তাদেরকে নামায আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং তারা যখন নামায আদায় করছিলো, তখন তাদের কাছে গিয়ে পৌছে ছিলাম। (বোখারী ও মুসলিম)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রেখেছেন। এই ফেরেশ্‌তারা ফজর ও আসরের সময় পালা পরিবর্তন করেন। এ জন্য এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে যে ফেরেশতারা বান্দার সাথে থাকেন, তাঁরা ফজরের নামাযের সময় চলে যান এবং আরেক ফেরেশ্‌তা বান্দার কাছে আসেন। বান্দা যদি নামাযে থাকে, তাহলে যে ফেরেশ্‌তা চলে গেলেন তিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যিনি এলেন, তিনিও আল্লাহ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি। এভাবে আসরের সময়ও ফেরেশ্‌তাদের পালা পরিবর্তন হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দাও না? আমি তো ঐ সত্তার কাছে বিশ্বস্ত যিনি আকাশের ওপর রয়েছেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আমার কাছে আকাশের সংবাদ এসে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান এ কথার অর্থ হলো— আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলম গোটা সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর ইলমের ভেতরে রয়েছে সব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা তালাক-১২)

অর্থাৎ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের বাইরে যা কিছু রয়েছে, এর মধ্যে অণু-পরমাণু বা তার থেকেও অতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়— মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানের জগতে বিরাজমান, ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও তাঁর জানার বাইরে নেই। অনুরূপভাবে তাঁর রহমতও সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى-

যখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপরে একটি কিতাবে লিখেছেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

www.pathagar.com

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ-

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্‌ল-৭৪)

সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কারো বিন্দুমাত্র অংশ ছিল না। সুতরাং মানুষের দেহ একজন সৃষ্টি করলো আর আরেকজন তার চিন্তার জগৎ বা মনের জগৎ সৃষ্টি করলো, বিষয়টি এমন নয়। মানুষের দেহ ও মন-মস্তিষ্ক তথা চিন্তার জগৎ সেই একজনই সৃষ্টি করেছেন– যাঁর নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সূরা আনকাবুতের ১০ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ-

বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ তা'য়ালা কি তা সম্যক অবগত নন?

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি মানুষের মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত রয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা মানুষের সমস্ত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাই আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে।

পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত– এই পৃথিবীর বুকে কোথায় কত সংখ্যক কি আকৃতির মানুষ বাস করেছে এবং কোন্ অঞ্চলে কি আকৃতির কত সংখ্য প্রাণী বাস করেছে, তার সঠিক পরিসংখান পরিপূর্ণভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গবেষণার মাধ্যমে কিছুটা অনুমান করতে পারে মাত্র। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাণীসমূহের ফসিল ও মানুষের কঙ্কাল যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপর গবেষণা করে একটি অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্তে মানুষ পৌঁছতে পারে। পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে যেখানে যে পরিবর্তন ঘটেছে, পাহাড়-পবর্ত, নদী-সাগর-মহাসাগর, আগ্নেয়গিরি, মৃত্তিকার তলদেশে তথা সমগ্র সৃষ্টিজগৎ জুড়ে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার সঠিক কারণ নির্ণয় এবং সঠিক সময় ও কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তার যথাযথ তথ্য জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধুতাই নয়– বর্তমান সময় থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোথায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, কোন্ আকার-আকৃতির ও চিন্তা-চেতনা এবং রুচির অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে আগামীতে আগমন করবে, এর সঠিক তথ্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

www.pathagar.com

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ-

তোমাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (সূরা হিজ্‌র-২৪)

কোথায় বৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে খরা হবে, কখন কোন্ নদী বা সাগরে জলোচ্ছ্বাস ঘটবে, আকাশের কোন্ কোণে মেঘমালা পুঞ্জিভূত হয়ে প্রচন্ড ঝড়ের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ স্থানে মৃত্তিকার তলদেশে কি আলোড়ন হচ্ছে এবং তা ভূমিকম্পের আকারে কখন কিভাবে আঘাত করবে, এসব বিষয় মানুষের জানা নেই। তারা শুধু অনুমান করতে পারে এবং তাদের অনুমান প্রচার মাধ্যমে প্রচার করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারে না। মাটির ওপরে যে দুর্বা ঘাস, সেই ঘাসের ওপরে ওপর থেকে গাছের পাতা পড়ার কারণে যে শব্দ হয় এবং দুর্বা ঘাসের ওপর থেকে ঐ পাতা যখন মাটিতে পড়ার সময় যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটাও মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকারে কোথায় কখন কোন্ উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং কোন্ বীজ বিনষ্ট হবে, মহান আল্লাহর জ্ঞানে সবকিছু রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا الاَّ هُوَ-وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ الاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمتِ الاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ الاَّ فِىْ كِتبٍ مُّبِيْنٍ-

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আনআম-৫৯)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। (সূরা ইউনুস-৬১)

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ-

তিনি জীবন্তকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে বের করে আনেন। আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও মৃত অবস্থা থেকে বরে করে আনা হবে। (সূরা রূম-১৯)

وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَآئِنُه-وَمَانُنَزِّلُه اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ-وَاَرْسَلْنَا

www.pathagar.com

الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوهُ-وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِينَ-وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ-وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ-وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ-إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ-

এমন কোনো জিনিস নেই যার ভান্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি। বৃষ্টিবাহী বায়ূ আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভান্ডার তোমাদের হাতে নেই। জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টির সম্মুখে আছে। অবশ্যি তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন। (সূরা আল হিজ্‌র-২১-২৫)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ- وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُورًا-وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا-وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا-

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দুয়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরী করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দুটো পৃথক ধারা চালিয়েছেন। তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন। (সূরা আল ফুরকান-৫৩-৫৪)

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِينَ نَذِيرًا- الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا-

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি এই ফুরকান তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। (সূরা ফুরকান-১-২)

মহাবিশ্বের কোনো একটি জিনিসও বিশৃংখল ও অপরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

জিনিসেরই একটি তাকদির বা একটি সামগ্রিক পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। এই পরিমাণ অনুযায়ীই একটি বিশেষ সময় তা অস্তিত্বশীল হয় এবং একটি বিশেষ রূপ ও আকার-আকৃতি ধারণ করে। একটি বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত তা প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে এবং একটি বিশেষ সময়ে তা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ-

আমি প্রত্যেকটি জিনিসই একটি পরিমাপসহ সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার-৪৯)

তিনি রব, কোন কিছুই ভারসাম্যহীন করে সৃষ্টি করেননি। যা সৃষ্টি করেছেন, তার ভেতরে ভারসাম্য রক্ষা করেই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মানব সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহান রব এমন নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আধিপত্য ও শক্তি সামর্থ লাভের সুযোগ দেন। কিন্তু কোন দল যখন সেই সীমা লংঘন করতে শুরু করে, তখন অপর এক মানব গোষ্ঠীকে দিয়ে তার শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। পৃথিবীতে যদি একটি দল ও একটি জাতির স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা করা হতো এবং তার স্বৈরাচারী নীতি আর জুলুমমূলক ব্যবস্থা অমর অক্ষয় হয়ে থাকতো, তাহলে গোটা পৃথিবীতে এক চরম দুর্যোগ, ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখা দিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ-لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের মাধ্যমে দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা সব বিনষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি পৃথিবীবাসীর প্রতি বড়ই করুণাময়। (সূরা বাকারা-২৫১)

এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুতেই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর বুকে কোন জালিমই স্থায়ীভাবে তার জুলুমের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। দম্ভ, অহঙ্কার স্থায়ী হয়নি।

প্রাণীজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায়, রাব্বুল আলামীন তাদের ভেতরে কি সুন্দরভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছেন। সামুদ্রিক কচ্ছপগুলোর যখন ডিম দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উঠে আসে, দিনের আলোয় আসে না। দিনের আলোয় এসে ডিম দিয়ে গেলে তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর চোখে পড়বে। তার ডিম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ডিম দেয়ার সময় পা দিয়ে তারা বালির ভেতরে গর্ত করে। গর্ত করা শেষ হলেই একের পর এক ডিম দিতে থাকে। মুরগী, হাঁস বা অন্যান্য পাখি যে সংখ্যক ডিম দিবে, তা প্রতিদিন একটি করে দিয়ে থাকে। আর কচ্ছপ যে ডিমগুলো দিবে তা একই সময়ে একটির পর একটি করে দিতে থাকে। যতগুলো ডিম দেয়া প্রয়োজন, তা পনের বা বিশ

www.pathagar.com

মিনিটের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপর ডিমে পরিপূর্ণ গর্ত পায়ের সাহায্যে বালি দিয়ে ভরে দেয়। ডিমের ওপরে বসে তা দিতে হয় না। মাটি বা বালির অভ্যন্তরীণ তাপেই ডিমগুলো নির্দিষ্ট দিন পরে ফোটে। যেখানে মাটি বা বালির ঘনত্ব বেশী সেখানেও তারা ডিম দেয় না। কারণ বাচ্চাগুলো তা দীর্ণ করে পৃথিবীতে আসতে পারবে না। সমুদ্রের পানি থেকে মাত্র দশ অথবা বিশ ফুট দূরে কচ্ছপ এভাবে ডিম দেয়। অনেক দূর থেকে পানিতে আসার সময় বাচ্চারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

স্থলে কচ্ছপ দ্রুত গতিতে চলতে পারে না। এ জন্য তারা পানির খুব কাছেই ডিম দেয় যেন বাচ্চা বের হয়েই দ্রুত পানির ভেতরে যেতে পারে। সদ্যজাত বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়েই পানির দিকে ছুটতে থাকে। ওদের গতি পানির বিপরীত দিকে কখনোই হয়না। এই সাবধানতা অবলম্বন করে ডিমগুলো রক্ষা করতে হবে, পানির কাছাকাছি ডিম দিতে হবে, বাচ্চাগুলোকে পানির দিকে ছুটতে হবে, কচ্ছপের ভেতরে যিনি এই চেতনা দিয়েছেন, তিনিই হলেন রব।

কচ্ছপ ডিম দিয়ে চলে যায়, ওদের ডিমের অনুসন্ধানে চলে আসে শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী। এরা সন্ধান পেলেই ডিমগুলো খেয়ে নেয়। যেগুলোর সন্ধান পায় না সেগুলোর বাচ্চা ফোটে। এই বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে পানির দিকে যাবার পথে নানা ধরনের প্রাণী এদেরকে খেয়ে ফেলে। পানির ভেতরে বড় বড় মাছ এই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি সমস্ত কচ্ছপের ডিম হেফাজত করে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচতে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীই কচ্ছপে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ-وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ-

আমারই কাছে রয়েছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভান্ডার এবং আমিই তাদের সরবরাহ করি এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে। (সূরা আল হিজর-২১)

কুমিরের ডিমেরও এই একই অবস্থা। কুমির স্থলে ডিম দিয়ে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর পাহারা দিতে থাকে। শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী কুমিরকে প্রহরা দিতে দেখেই বুঝে নেয়, ওখানে ওর ডিম আছে। ওরা কুমিরের গতি-বিধির ওপরে নজর রাখে। ডিমের কাছ থেকে একটু দূরে গেলেই ওরা এসে ডিম খেয়ে নেয়। তারপরেও যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয়, সেগুলোকে ধরে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী খায়। সমস্ত কুমির, সাপ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি যত বাচ্চা দেয়, তা যদি বাঁচতে পারতো, তাহলে এই পৃথিবী আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকতো না। এদের সৃষ্টির ভেতরে রাব্বুল আলামীন ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى-الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى-

তোমার মহান শ্রেষ্ঠ রব-এর নামের তস্‌বীহ করো। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন। (সূরা আ'লা-১-২)

www.pathagar.com

পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদেরও এই অবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা কোন একটি উদ্ভিদকেও মাত্রার অতিরিক্ত বিস্তৃতি ঘটতে দেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ–

আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি পরিমাপ। (সূরা আর রা'দ–৮)

বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার এমন ঋতু পৃথিবীতে আগমন করে, কতকগুলো উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাকে তিনিই প্রতিপালন করেন, বান্দার কল্যাণে এসব ব্যবস্থা তিনিই করেন। অতএব একমাত্র তাঁরই প্রশংসা ও দাসত্ব করতে হবে।

মাটি বা পানির অতল তলদেশে একটি পাথরের গর্তে এমনসব প্রাণী বাস করে, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত মানুষের চোখে পড়বে না। সেই প্রাণী সম্পর্কেও মহান আল্লাহ অমনোযোগী নন। ঐ প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৫)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ–كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ–وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ–

তুমি কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে? প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নূর-৪১)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا–

যমীনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিয্‌ক দানের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। (সূরা হূদ-৬)

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ–وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا–

যা কিছু আমাদের সামনে ও যা কিছু পেছনে এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং তোমার রব ভুলে যান না। (সূরা মারয়াম-৬৪)

www.pathagar.com

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا-وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِه-سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথার কোনো মূল্য দিও না, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। (সূরা আল-আ'রাফ-১৮০)

আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান, এ নামেও তাঁকে ডাকা যায়। মহান আল্লাহ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গুণবাচক নাম প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর এসব গুণবাচক নামও অতীব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّه هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ-وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ-ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ-

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী। (সূরা বুরুজ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এসব গুণের প্রতিও অনুরূপভাবে ঈমান আনতে হবে এবং কথা, চিন্তা-চেতনা ও কাজের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে আর এটাই হলো তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় পর্যায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এসব গুণ মানুষ বা সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে রয়েছে, তা কেউ যদি কথা, চিন্তাধারা এবং কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে, তাহলে তা হবে তওহীদের বিপরীত কাজ বা শিরকমূলক কাজ।

তাওহীদের তৃতীয় পর্যায়

এই মহাবিশ্বে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কিছু না কিছু শক্তি বা ক্ষমতার প্রকাশ ঘটছে। সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেও নানা ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আগুনের মধ্যে দহন ক্ষমতা রয়েছে, পানির মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণ, শীতলতা আনয়ন বা সিক্ত করার গুণ রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বাতাস, পানি, আগুন, মাটি, পাথর, বৃক্ষ তথা প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এসব শক্তি-ক্ষমতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য স্বয়ং ঐ সৃষ্ট বস্তুর অভ্যন্তরীণ- না অন্য কোনো সত্তা এসব শক্তি-ক্ষমতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন?

লৌহ দ্বারা নির্মিত অস্ত্র কোমল বস্তু কেটে ফেলবে এটাই লৌহ নির্মিত ধারালো অস্ত্রের গুণ। কিন্তু এই গুণ তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে কে? পানি উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে ধাবিত হবে, পানিকে ধাবিত হবার ক্ষমতা দিয়েছে কে? শুকনো খড়-কুটো, তৃণ-গুল্ম আগুনের স্পর্শে এলে আগুন তা জ্বালিয়ে দিবে। আগুনের মধ্যে দহন শক্তি দিয়েছে কে?

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এক, একক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সত্তা অবিভাজ্য। তিনি অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে নানা ধরনের শক্তি, ক্ষমতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন– এ কথাটির প্রতিও ঐভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় মহান আল্লাহর সত্তার প্রতি। এটাই মহান আল্লাহর অতুলনীয় গুণ ও ক্ষমতা। তাঁরই ইচ্ছায়, ক্ষমতায় ও তাঁর সিদ্ধান্তের প্রবল প্রভাবে বস্তুর মধ্যে এসব ক্ষমতার প্রকাশ নিরন্তরভাবে ঘটছে। তিনিই একান্ত অনুগ্রহ করে বস্তুর মধ্যে ক্ষমতা ও শক্তি দিয়েছেন এবং এটাও তাঁরই রহমত বিশেষ। খাদ্য বস্তুর মধ্যে তিনিই খাদ্যপ্রাণ দিয়েছেন, নানা ধরনের পুষ্টিকর জিনিস দিয়ে খাদ্যসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

কোনো একটি বস্তুই নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী নয়– বস্তু স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয়, পৃথিবীতে ও উর্ধ্ব জগতে যা কিছুই রয়েছে, তা নিজের ক্ষমতায় ও শক্তিতে যার যার স্থানে প্রতিষ্ঠিত নেই। কার্য ও কারণ– এ দুটোই মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোন্ কাজ করলে তার ফলাফল কি দেখা দেবে, কোন্ কারণে কি ঘটে– এসব কিছুই মহান আল্লাহরই অবদান। পাত্রে পানি আর চাল দিয়ে উনুনে চড়িয়ে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলে তাপ প্রবাহের কারণে পাত্রের পানি ও চাল উত্তপ্ত হবে এবং এক সময় ভাত হবে। ভাত হবার জন্য চারটি জিনিসের প্রয়োজন– পাত্র, চাল, পানি ও আগুন। এই চারটি জিনিসেরই পৃথক পৃথক গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পরস্পর সংযুক্ত হবার কারণেই ভাত হলো।

সুতরাং কার্য ও কারণও মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়টির প্রতিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, কার্য ও কারণের স্রষ্টাও আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেছেন এবং ক্রিয়াও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যাবতীয় সৃষ্টি ও সৃষ্টিসমূহে নিহিত শক্তি ও ক্ষমতা, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তি, ক্ষমতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য তিনিই দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُورًا وَّقَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ-مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ- يُفَصِّلُ الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ-

তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মন্‌যিল সঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এর সাহায্যে বছর ও তারিখসমূহের হিসাব জেনে নাও। আল্লাহ তা'য়ালা এই সব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নির্দশনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন– তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস-৫)

মহাকাশের প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেক মুহূর্তে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে তিনি সজাগ রয়েছেন এবং যা কিছুই ঘটছে, তা তাঁরই নির্দেশে ঘটছে। সৌর ঝড়,

www.pathagar.com

সূর্যের বুকে মহাপ্রলয়, প্রত্যেকটি ছায়াপথের চলমান গতি, একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে যেন কোনো বিশৃংখলা না ঘটে, এসব কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি যেন পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, এসব কিছুই একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সৃষ্টিসমূহের ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও আল্লাহ তা'য়ালার কাছে গোপন নেই, তিনি সমস্ত কিছু জানেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ-

বস্তুত কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই, আকাশেও নয় এবং যমীনেও নয়। তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন। (সূরা ইমরাণ-৫)

যমীনের অতল তলদেশে মৃত্তিকা গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত লাভা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আলোড়িত হচ্ছে, সেই লাভা হঠাৎ উদগিরণ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জীবের জন্য যেন ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়– এ ব্যাপারেও তিনি সজাগ রয়েছেন। আগ্নেয়গিরি থেকে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে যেন মৃত্যু মুখে পতিত না হয়, এ বিষয়টিও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সমস্ত সাগর-মহাসাগরের পানি একই মুহূর্তে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে পৃথিবীর যমীনকে তলিয়ে দিতে না পারে, এসব বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মায়ের গর্ভে– যেখানে কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, সেখানে কার কি আকৃতি হবে, কার হাতের আঙ্গুল দশটির স্থানে বারটি হবে, কার এক পা ছোট আরেক পা বড় হবে, কে কুৎসিত দর্শন হবে আর কে সুশ্রী হবে, কে মূক-বধির হবে আর কে বাক ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে এসব কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। অর্থাৎ সবর্ত্র তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে এভাবে তাঁর কাছে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ-وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ-

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জানো যা আমরা গোপন করি ও প্রকাশ করি। আকাশ ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু রয়েছে, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'য়ালার আয়ত্বে রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ-

তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

www.pathagar.com

অদৃশ্য জগতে কোথায় কি পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ও জীব জগতের কি অবস্থা হবে, এই বিষয় জানার কোনো মাধ্যম মানুষের কাছে নেই, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এসব বিষয় গোপন নেই এবং তিনি তাঁর মহাশক্তিবলে এসব পরিবর্তন ঘটান এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ এসব কিছুর ওপরে তাঁর বিধান কার্যকর রয়েছে।

তাপের কারণে পৃথিবীর ওপরি ভাগের পানি বাষ্পাকারে উত্থিত হয়ে মহাশূন্যে মেঘমালায় পরিণত হয় এবং তা ক্রমশ ভারি হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। বৃষ্টি বর্ষণের এই প্রক্রিয়া মহান আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে থাকে। সূরা নাহ্ল-এর ৬৫ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ-

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে তিনি সহসাই মৃত যমীনে প্রাণ সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন বলেই পৃথিবীতে অগণিত উদ্ভিদ জন্ম নেয় এবং এ থেকে মানুষ যেমন খাদ্য লাভ করে তেমনি পশুও খাদ্য লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ-يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ-اِنَّ فِىْ ذَالِكَ الْاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ-

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যেও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা আন্ নাহ্ল-১০-১১)

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا-وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنّٰتٍ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ-

আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, এর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ জান্মিয়েছেন এবং এর দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা হতে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছেন। খেজুরের মোচা হতে ফলের থোকা থোকা বানিয়েছেন, যা ভারের

www.pathagar.com

চাপে নুয়ে পড়ছে এবং আংগুর, যয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন সেখানে ফলসমূহ পরস্পরের সদৃশ অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। (সূরা আনআম-৯৯)

যাদের অন্তরে ঈমান রয়েছে কেবল তারাই নিখিল সৃষ্টির এসব নিদর্শনাদির ওপর চিন্তা গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে সক্ষম হন। আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টির পরতে পরতে নিদর্শন উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে আছে। অগণিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে এই সুন্দর মানুষের অস্তিত্ব অপরাপর সকল সৃষ্টিকুলকে তার ব্যবহার করার দুর্বার স্পৃহা, দেখে শুনে চিন্তা গবেষণা করে এটা থেকে মূল রহস্য উদঘাটনের অসাধারণ প্রতিভা, এই সুন্দর সুশোভিত সৃষ্টিরাজি, আসমান যমীনের সকল সৃষ্টির কাছে সর্বত্র পরিমিত খাদ্য-খাবার পৌছানোর নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, এই স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য্য, চাঁদের কোমল আলো, সুদৃশ্য তারকাপুঞ্জ, বিশাল সমুদ্র, তরতাজা শ্যামল ক্ষেত-খামার, ফুলে ফলে ভরা- বাগ-বাগিচা, দিনের কোলাহল, রাতের নিস্তব্ধতা, ভোরের ঔজ্জ্বল্য ও রাতের আঁধার সব কিছুই একান্তভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব, অবিভাজ্যতা ও কার্য-কারণের ঘোষণায় সদামুখর। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ-وَمَا اَنْتُمْ لَه بِخٰزِنِيْنَ-

বৃষ্টিহীন বায়ু আমিই প্রেরণ করি। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই। (সূরা আল হিজর-২২)

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُه فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُه كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِه-فَاِذَا اَصَابَ بِه مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ-

আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। পরে তা মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয় যেমন চায় এবং একে টুকরা টুকরা করে দেয়। পরে তুমি দেখতে পাও, বৃষ্টির ফোটা মেঘমালা হতে বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে। তিনি বান্দাদের মধ্য হতে যার ওপর যখন চান বর্ষিয়ে থাকেন। তখন সহসা তারা আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে। (সূরা রুম-৪৮)

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ-وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

আর দেখ, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূ-খণ্ড। আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুরগাছ-কিছু একাধিক কাণ্ড বিশিষ্ট আবার কিছু এককাণ্ড বিশিষ্ট, সবই সিঞ্চিত

www.pathagar.com

একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনোটিকে বেশি ভালো এবং কোনটিকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুমুখী নিদর্শন। (সূরা আর রা'দ-৪)

একই পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন পৃথক ভূ-খণ্ড রয়েছে। কিন্তু এর আকার, রং ও বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। একই পানিতে সবই সিক্ত হয় কিন্তু এক এক ভূ-খণ্ডের ফল ও ফসলের মধ্যে রং, রূপ ও আকারে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি স্বাদে ও গন্ধে রয়েছে বৈচিত্র। একই মূল হতে দুটি কাণ্ড বেরিয়ে আসে কিন্তু উভয়ের গুণাগুণ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যারা বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায় তারা এসব নিদর্শনসমূহের ওপর গবেষণা করলে অবশ্যই এমন এক মহান ক্ষমতাধর সত্তার সন্ধান পাবে যার ইশারা-ইঙ্গিতে ও নিপুণ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কিছু পরিচালিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِه-اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا-ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا-فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا-وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا- وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً-وَّحَدَائِقَ غُلْبًا-وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا-مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ-

মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক। আমি প্রচুর পানি বর্ষিয়েছি। তারপর যমীনকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করেছি। এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর ঘন বাগান, নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারনের সামগ্রী হিসেবে। (সূরা আবাসা-২৪-৩২)

বিভিন্ন রকমের ফসল, রং বেরংয়ের ফল-ফলাদি ভিন্ন রকম তরকারী ও শাক-সবজি এবং এই নিবিড় বাগ-বাগিচা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ গাছপালা ও সবুজ-শ্যামল ক্ষেত-খামার কে তৈরী করেছেন? এসব ফল-ফলাদি ও শাক-সবজি ও ফসলসমূহকে মানুষের খাদ্য ও ব্যবহারোপযোগী করতে কে যমীন, পানি, সূর্য ও বাতাসকে এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ করছেন? সেই মেহেরবান দয়ালু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً-نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِه مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ-

আর তোমাদের জন্য গবাদিপশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর-রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, নির্ভেজাল দুধ যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর। (সূরা আন নাহল-৬৬)

চতুষ্পদ জীব-জন্তুর শক্ত-শুষ্ক খাদ্য-খাবার মানুষের উপাদেয় সুস্বাদু খাবার থেকে কতইনা ব্যতিক্রম, অথচ ঐ ঘাস-ভূষি পশুর পেটে গিয়ে রক্ত ও গোবরের সাথে এমন নির্ভেজাল সুমিষ্ট দুধ প্রস্তুত হয় যা মানুষের জন্য অতীব উপাদেয় ও পুষ্টিকর। পশুর অন্ধকার পেটের মধ্যে

www.pathagar.com

ঘাস-ভুষি থেকে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুধ প্রস্তুত করার শক্তি কে দিয়েছেন? কার ব্যবস্থাপনায় এর রক্ত ও দুধ ঐ নির্দিষ্ট রগ ও নালীতে সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয়? উপরন্তু ঐ দুধ কেবল স্ত্রী লিঙ্গের জন্তুর মধ্যেই বা কেন প্রস্তুত হয়? অথচ নর ও নারী উভয় জন্তু একই খাদ্য আহার করে থাকে। সূরা নাহ্‌ল-এর ৬৮-৬৯ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ-ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً-يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُه فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ-اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

আর দেখ, তোমার রব মৌমাছিদেরকে অহীর মাধ্যমে এ কথা বলে দিয়েছেন, তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও উঁচু চালে নিজেদের গৃহ তথা চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চোষো এবং নিজের রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকো। এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংয়ের পানীয় বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়। অবশ্যই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা নাহ্‌ল)

মুষ্টিভরা দানা যমীনের মাটিতে ছড়িয়ে দেবার পর কৃষক তো নানা সন্দেহ-সংশয়ে দিন কাটায়। কে ঐ নির্জীব বীজ হতে মাটি ফুড়ে অংকুর বের করেন? আর দেখতে দেখতে গোটা মাঠ জুড়ে সুদৃশ্য শ্যামল, তরতাজা ক্ষেত ও ফসলের সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ-ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ-لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ-

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, যে বীজ তোমরা বপন করো তা হতে তোমরা ফসল উৎপাদন করো নাকি আমি উৎপন্নকারী? আমি চাইলে এই ফসলকে ভুষি বানিয়ে দিতে পারি। (সূরা আল ওয়াকেয়া-৬৩-৬৫)

সুমিষ্ট পানি চিত্তাকর্ষক এক নে'মাত! এই পানি ব্যতীত মানুষ কি দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে পারে? আচ্ছা তা যদি লবণাক্ত হয়ে যায়, কিংবা এর নিয়মিত বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানুষসহ দুনিয়ার জীবজন্তুর কি অবস্থা হবে? এমন সুমিষ্ট পানি পানে পরিতৃপ্ত জীবন উপভোগ করে যদি কেউ আপন মালিকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে বরং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে অনুভূতিহীন জড় পদার্থ ছাড়া কি-ই বা বলা যায়! মহান আল্লাহ বলেন-

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ-ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ-لَوْنَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا-

www.pathagar.com

তোমরা কখনো চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখেছ কি? এই যে পানি যা তোমরা পান করো, তা মেঘমালা হতে তোমরা বর্ষণ করাচ্ছো, নাকি বর্ষণকারী আমি আল্লাহ? আমি চাইলে একে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। (সূরা আল ওয়াকেয়া-৬৮-৭০)

গাছ কেটে খড়ি বানালে তাতে আগুন কেনো প্রজ্জলিত হয়? আবার এমন কোনো কোনো গাছ আছে যার তরতাজা শাখা পরস্পরের সাথে আঘাত করলে সহসা আগুন জ্বলে ওঠে। এই শ্যামল-তাজা গাছের মধ্যে দাহ্য শক্তি সম্পন্ন আগুনের অবস্থিতি কে দিয়েছেন?

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ- ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ-

তোমরা কখনো চিন্তা করেছ, এই আগুন, যা তোমরা জ্বালাও এর গাছ (কাষ্ঠ) তোমরা বানিয়েছো না এর সৃষ্টিকারী আমি আল্লাহ। (আল ওয়াকেয়া-৭১-৭২)

নগণ্য নাপাক শুক্রবিন্দু হতে মানুষের মত সৃষ্টি উদ্ভাবন করা কার কাজ? এটা কি মানুষের কোনো নিজস্ব কর্মকাণ্ড? আল্লাহ তা'য়ালা জানাচ্ছেন-

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ-

তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা যে শুক্র নিক্ষেপ করো, তা হতে তোমরা সন্তান সৃষ্টি করো, না আমি আল্লাহ এর সৃষ্টিকর্তা? (সূরা আল ওয়াকেয়া-৫৮-৫৯)

পেটের ভেতর পর পর তিনটি অন্ধকারের মধ্যে নগণ্য শুক্রবিন্দুকে বিভিন্ন আকার আকৃতিতে রূপান্তর করে শেষ পর্যন্ত মানুষের মত সুন্দর গঠন দেন আল্লাহ। তাঁর এসব বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করতে যথেষ্ট। পবিত্র কোরআন বলছে-

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ-ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ-

তিনিই তোমাদের মায়ের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকার আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন। এই আল্লাহ (এটা তারই কাজ), তোমাদের রব। প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। (সূরা আয যুমার-৬)

মাটির দ্বারা মানুষের ন্যায় অসাধারণ জীব সৃষ্টি করা এরপর পানির সাহায্যে এর বংশধারা অব্যাহত রাখা, নির্জীব, পানিতে প্রাণের সঞ্চার করে তাতে দেখা-শুনা ও চিন্তা-গবেষণা করার মত অসাধারণ যোগ্যতা প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো নিঃসন্দেহে মহাশক্তিধর সুকৌশলী আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁরই দেয়া শক্তি-ক্ষমতার প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন-

ذَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ

شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ-ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ-ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ-

তিনিই সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অতীব দয়াবান। তিনি যা কিছু বানিয়েছেন, তা সবই সুন্দর করে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা-মাটি হতে। পরে এর বংশধারা এমন এক বস্তু হতে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। পরে এর নাক-কান ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। (সূরা আস সাজদা-৬-৯)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ-

আর আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য। (সূরা আর রূম-২২)

পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবমণ্ডলী একই মাতা-পিতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। প্রত্যেকের বাকশক্তি ও মন-মস্তিষ্ক এবং মুখের গঠন আকৃতি একই ধরনের অথচ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মুখের ভাষা বিভিন্ন ধরনের। গাত্রবর্ণ ও গঠন প্রকৃতিও নানারূপ। এক এলাকার অধিবাসী অপর এলাকাবাসীর কাছে ভাষার দিক দিয়ে এমন অপরিচিত যেন তারা বাকশক্তিহীন। আবার একই ভাষাভাষি লোকদের মধ্যেও বর্ণনা ও উচ্চারণ ভংগীতে পরস্পরে পার্থক্য রয়েছে। অথচ শব্দ উচ্চারণ, অংগ, মুখ ও জিহ্বা সকলেরই সমান। কিন্তু কেউ হয়ত যুগের বাগ্মী হিসেবে সুপরিচিত; অপর দিকে কেউ আবার নিজের মনের ভাব পর্যন্ত প্রকাশ করতে অপারগ। মানুষ একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করলে এর মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন লক্ষ্য করতে পারে। যিনি মূলতঃ অপরিসীম শক্তির আধার ও সুকৌশলী। তিনি মহান সত্তা, যিনি সকল সৌন্দর্যের উৎস এবং স্বতঃই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُوَالَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ-يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ-وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ-وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

www.pathagar.com

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন। আর সমস্ত তারকাও তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্যে রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নির্দশন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলোর মধ্যেও অবশ্যই তাদের জন্যে নির্দশন রয়েছে, যারা শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনিই তোমাদের জন্যে সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন। যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোস্ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অঙ্গের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্যে, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (সূরা আন-নাহল-১০-১৪)

সৃষ্টিসমূহের মধ্যে আল্লাহ গুণ-বৈশিষ্ট্য একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের কল্যাণের জন্য দান করেছেন। চন্দ্র-সূর্য্য, পানি-মাটি, সমুদ্র, আলো-আঁধার সবই মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ–

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল আনআম-১)

আলো ও আঁধার মহান আল্লাহর নে'মাত। যার কল্যাণে মানুষ দুনিয়ায় বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। যমীনের প্রতিটি পর্যায়ে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়। এসব নে'মাতের যথার্থ দাবী হচ্ছে, বান্দা মনেপ্রাণে এসব নে'মাতের স্বীকৃতি প্রদান করবে। মৌখিক ঘোষণা দেবে এবং কাজের মাধ্যমে এর প্রমান পেশ করে যথার্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। সূরা ক্বাফ-এর ৬ ও ৮ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ– وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ– تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ–

এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে দেখেনি? কিভাবে আমি একে নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি। এতে কোনোরূপ ফাঁক ও ফাটল নেই। আর পৃথিবীকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, এতে পাহাড়সমূহ সংস্থাপিত করেছি এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি। এ সব কিছুই চক্ষু উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য, যে প্রকৃত সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা ক্বাফ)

এ সবকিছু মানুষের জ্ঞানের চক্ষু উন্মোচিত হবার জন্যে এবং একথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ এসবের মধ্যে যে গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন, তাই তারা প্রকাশ করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا-مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ-فَارْجِعِ الْبَصَرَ-هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ-ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا-

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টি কর্মে কোন অসংগতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখ, কোথাও কোন দোষত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত, সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। (সূরা আল মূলক-৩-৫)

এই আকাশ, যার প্রতি সচরাচর তোমাদের দৃষ্টি পড়ে, আরো বার বার লক্ষ্য করে দেখ, এতে কোন দোষত্রুটি দেখতে পাবে না। তোমাদের দৃষ্টি শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। কোনো অসম্পূর্ণতাই দৃষ্টিগোচর হবে না। তারকাপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত ঐ সুদৃশ্য আকাশ দেখে অজ্ঞাতসারে তুমি অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে যে, এসব কিছু মহান আল্লাহ তায়ালারই কর্মকাণ্ড, যিনি সব জিনিসই সুনিপুণ এবং যথার্থভাবে তৈরী করেছেন।

এই শুষ্ক নিষ্প্রাণ যমীনকে বৃষ্টি বর্ষণ করে কে জীবন্ত করেন? যাতে তরতাজা গাছপালা জন্ম হয়ে মুঠি মুঠি ফলফলাদি উৎপন্ন হয়। এসব ফুল-ফসলে ভরা বাগ-বাগিচা কে উৎপন্ন করেন? মানুষের পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা কে প্রবাহিত করেন? আচ্ছা, এসব কিছু আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়ে গেল? সমস্ত কিছু অবশ্যই এক দয়াবান মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার আদেশ, যিনি এসব কিছুর মহান কারিগর। পবিত্র কোরআন বলছে-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا-

বড়ই বরকতসম্পন্ন মহান সে সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলে বুরুজসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকমণ্ডিত চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। (সূরা আল ফুরকান-৬১)

এখানে প্রদীপের দ্বারা উজ্জ্বল সূর্যকে বুঝানো হয়েছে এবং বুরুজ উর্ধ্বলোকের ঐ সব সুদৃঢ় সীমারেখাকে বলা হয় যার দ্বারা একাংশ অপর অংশ থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক অংশই কোনো না কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্র বা গ্রহ দ্বারা সুসজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ-اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ-

রাত ও দিনের আবর্তন আল্লাহই ঘটিয়ে থাকেন। এতে চক্ষুষ্মান লোকের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। (সূরা আন নূর-৪৪)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ-نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ-

www.pathagar.com

এদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমি এর ওপর হতে দিনকে সরিয়ে দেই, তখন এর ওপর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন-৩৭)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا-

তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত্রিকে তোমাদের জন্য পোশাক, নিদ্রাকে মৃত্যুর স্থিতি নিস্তব্ধতা এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান-৪৭)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا-

আল্লাহই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে জ্ঞান লাভ করতে চায় অথবা শোকর আদায়কারী হতে চায়। (সূরা আল ফুরকান-৬২)

আমরা প্রতিদিন প্রখর সূর্যকে পরিমিত তাপ বিকিরণ করতে দেখি। এতে যমীনের আনাচে কানাচে পর্যন্ত সর্বত্র আলো ঝলমল হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ফলে গোটা যমীনে নেমে আসে অন্ধকার। এ অবস্থায় নির্ধারিত কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হলে পুনর্বার সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয়। সারা দুনিয়া এতে আবার আলোকিত হয়ে ওঠে। এভাবে সূর্যের এ উদয় ও নিয়মিতভাবে অস্ত মহাকাল ধরে চলে আসছে। এমন কখনো হয়নি যে, রাতে হঠাৎ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সূর্য উদিত হয়ে দিনে পরিণত হলো, কিংবা দিনের সময়কাল শেষ হবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে রাতের আঁধার নেমে এলো, আর সারা দুনিয়া অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়লো।

রাত-দিনের নিয়মিত আসা-যাওয়ার মধ্যে মানুষের জীবন যাপনের বহুবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান। দিনের আলোকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জীবন উপকরণ উৎপন্ন ও আহরণ করে। ফলে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এরপর রাত এসে তাকে বিশ্রাম, প্রশান্তি ও আরাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এতে সে স্বস্তি বোধ করে। কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে পুনশ্চ দিনের আগমন হতেই সে আবার পূর্ণোদ্দমে কঠোর শ্রম সাধনায় নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়।

মানুষের জ্ঞান চক্ষু খোলা থাকলে সূর্যের এ বিস্ময়কর আবর্তন-বিবর্তনে নিয়মিত রাত ও দিনের আগমনে যে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান, তা দেখে সে অবশ্যই স্বীকার করবে যে, এর এক পরাক্রমশালী ব্যবস্থাপক আছেন, যিনি এসব কিছু নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى-وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

আর আল্লাহর জন্যে তো রয়েছে মহোত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী। (সূরা আন নাহল-৬০)

একমাত্র আল্লাহই যাবতীয় বস্তুর মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনি দান না করলে কোন্ বস্তু স্বয়ং নিজের ক্ষমতায় কোনো গুণ অর্জন করতে পারতো না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সত্তার দিক থেকে যেমন অংশীদারহীন, তাঁর সৃষ্টি কাজেও তিনি

www.pathagar.com

অংশীদারহীন এবং যাবতীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে তিনি গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রদানেও অংশীদারহীন। সৃষ্টিসমূহের যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তা সবই মহান আল্লাহর কুদরতের অধীন। তিনিই যাবতীয় পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছেন, যেমন সৃষ্টি করেছেন ঐসব মূল জিনিসগুলোকে। যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা তিনিই– এসব অন্য কারো অবদান নয় এবং বস্তুর নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যও নয়। যেখানে যা কিছু দান করা প্রয়োজন ছিলো, তিনিই তা দান করেছেন এবং এ ব্যাপারেও তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এই বিষয়টি অস্বীকার করা বা এই বিশ্বাসের প্রতি সামান্য দুর্বলতাও শিরকের শামিল।

তাওহীদের চতুর্থ পর্যায়

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত ও বাইরে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তিনি এসব কিছুর স্রষ্টা, সৃষ্টির ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক ছিলো না এবং কোনো কাজে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর সত্তা এক, একক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। তিনি অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী। সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ তিনিই করেন। সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে তিনিই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দান করেছেন। যাবতীয় সৃষ্টিই কোনো না কোনো গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য কোনো সৃষ্টির নিজস্ব নয়। যেখানে যা কিছু দান করা প্রয়োজন, তা তিনিই দান করেছেন। যাকে যে অলঙ্কারে ভূষিত করা প্রয়োজন, যেখানে যা দিয়ে সাজানো প্রয়োজন, তিনি তাই করেছেন। এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটাতে হবে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার মধ্য দিয়ে।

তাওহীদের চতুর্থ পর্যায় হলো, একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব বা ইবাদাত করা যাবে না। মানুষ দাসত্ব করবে একান্তভাবে মহান আল্লাহর জন্য এবং শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। ইবাদাত লাভের একক প্রাপক হচ্ছেন তিনিই– যিনি, মহাবিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যতীত আর কারো মা'বুদ হওয়ার, মা'বুদ হিসেবে গৃহীত ও উপাসিত হওয়ার যোগ্যতা যেমন নেই, তেমনি এই অধিকারও কারো নেই। পূর্ণত্ব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার উচ্চমার্গে যে-ই আরোহণ করুক না কেনো, তার নিজস্ব বলতে সৃষ্টি জগতে কিছুই নেই। যেসব কারণে কোনো সত্তাকে মা'বুদ বা ইবাদাত লাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব লাভের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে, এসব কারণের মধ্যে দুটো কারণ হলো প্রধান।

প্রথম কারণ হলো, যিনি মা'বুদ হবেন বা ইবাদাত তথা দাসত্ব লাভের অধিকারী হবেন, তাকে সর্বতোভাবে সমস্ত দিক দিয়ে পূর্ণত্বের অধিকারী হতে হবে। তিনি সকল প্রকার দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে এক অবিভাজ্য সত্তা হবেন। সৃষ্টি যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুর্বলতায় আচ্ছন্ন, ইচ্ছা শক্তি ও কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত এসব কিছুর উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করবেন। কোনো ধরনের অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করবে না। সকল সৃষ্টিকে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে, তিনি কারো মুখাপেক্ষী হবেন না। তাকেই প্রথম ও শেষ হতে হবে অর্থাৎ সূচনাতেও তিনি ছিলেন অস্তিত্ব সম্পন্ন এবং সমস্ত কিছু ধ্বংসের পরেও তিনি অস্তিত্ববান

www.pathagar.com

থাকবেন। আদি ও অন্ত তিনিই হবেন। অনস্তিত্বহীনতা থেকে তিনি হবেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি হবেন অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্য কোনো সত্তার মধ্যে থাকবে না। তাঁর জ্ঞান হবে সীমা শেষহীন- যার কোনো প্রান্ত থাকবে না। সামান্যতম অজ্ঞতা, মূর্খতা, ভুল-ভ্রান্তি তার সম্পর্কে কল্পনাও করা যাবে না। তিনি হবেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী, একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁর মুষ্টিতে নিবদ্ধ থাকবে। দুর্বলতা, অক্ষমতা বা অবসন্নতার অস্পষ্ট ছায়াও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তার সত্তার প্রতি সমগ্র সৃষ্টি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করবে, নিজেদেরকে উৎসর্গ করার ভাবধারায় উদ্দিপ্ত হবে। একনিষ্ঠভাবে তারই কাছে মাথানত করতে অনুপ্রাণিত হবে।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, সমগ্র সৃষ্টির সূচনা এবং মহাবিশ্বের যে সকল স্তরে জীবনের স্পন্দন রয়েছে, এসব জীবনের উন্মেষ একমাত্র তারই হাতে নিবদ্ধ থাকতে হবে। সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব ও প্রাণীর প্রাণের মূল উৎস, জীবন-মৃত্যুর বাগডোর এক মাত্র তারই হাতে নিবদ্ধ থাকবে। যিনি সকল সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুকে শুধু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বেই আনবেন না, এসবের দেহ কাঠামো, আকার-আকৃতি, প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করবেন। তিনিই নিত্য-নতুন সৃষ্টির উদ্ভাবক হবেন। সৃষ্টির প্রবৃদ্ধিও তিনিই ঘটাবেন। সৃষ্টিকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করবেন, এর ব্যবস্থাপনাও তিনিই করবেন। সকল সৃষ্টির প্রয়োজন তিনি অনুভব করে প্রয়োজন অনুসারে যাবতীয় দ্রব্য-সামাগ্রী সরবরাহ করবেন। এই সরবরাহের ধারাবাহিকতা ক্ষণিকের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মহাবিশ্বে ব্যাপক শূন্যতা পরিলক্ষিত হবে এবং যাবতীয় সৃষ্টি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। সৃষ্টি সম্পর্কে মুহূর্তকালের জন্যে তিনি অমনোযোগী হবেন না। সৃষ্টি জগতের পরতে পরতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যেসব সৃষ্টি রয়েছে, এসবের প্রয়োজন তার অগচোরে থাকবে না। তার জ্ঞান, ক্ষমতা, কুদরত, মহিমা, দয়া-অনুগ্রহ সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।

মা'বুদ হওয়ার এই যোগ্যতা মানব সভ্যতার সূচনা থেকে বর্তমান বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগ পর্যন্ত যেমন সুস্থচিন্তা, অনুভূতি, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষের দৃষ্টিতে একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোনো সত্তার মধ্যে পাওয়া যায়নি, পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত পাওয়া কখনো সম্ভব নয়। নমরুদ, ফিরাউন, সাদ্দাদ এবং অন্যান্য যুগে যারা নিজেদেরকে দাসত্ব লাভের অধিকারী হিসেবে দাবী করেছে এবং যেসব মানুষ তাদেরকেই মা'বুদ হিসেবে পূজা করেছে, তারা কেউ-ই অমর-অক্ষয় ছিলো না। সবাইকে ধ্বংস হতে হয়েছে। স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেসব শক্তিকে মা'বুদ হিসেবে পূজা করে আসছে, তারা কেউ উদিত হয় আবার অস্তও যায়। কেউ কেউ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ হতে পারে না এবং তাঁরই দাসত্ব ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করাও যেতে পারে না– আর এটাই হলো জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দাবী।

দাসত্ব বা ইবাদাত সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতের তাফসীরে, ৩৯১ পৃষ্ঠা থেকে ৪৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই বিষয়টি অধ্যয়নকালে সূরা ফাতিহার তাফসীরের উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে

www.pathagar.com

ইবাদাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাওহীদের অসংখ্য দিক রয়েছে এবং এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আদেশ দেয়া ও আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক। অর্থাৎ নীতি নির্ধারণ বা কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে কোন্ পর্যায়ে তওহীদের অনুসরণ করতে হবে এবং কোন্ সীমা লংঘন করলে তা শিরকে পরিণত হবে। এ পর্যায়ের মৌলিক কথাগুলো এখানে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো মানুষই তার ইচ্ছাস্বাধীন চলতে পারে না অর্থাৎ যা খুশী তাই করতে পারে না। তাকে কিছু না কিছু নিয়ম-নীতি বা আইন-বিধান অনুসরণ করে চলতে হয়। আবার কোনো মানুষকে এমন নিয়ম-নীতি আইন-বিধান দিয়ে বন্দী করাও যেতে পারে না যে, তার জীবনের পরিধি হয়ে পড়বে সঙ্কীর্ণ, মানুষ হিসেবে মানব প্রকৃতির ন্যূনতম চাহিদাও সে পূরণ করতে পারবে না এবং জীবনের ছোট-বড় প্রয়োজনের দাবীও সে করতে পারবে না।

এ জন্য প্রয়োজন মানব প্রকৃতির প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে মানুষের জীবন বিধান প্রণয়ন- যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এমন আইন-বিধান প্রয়োগ করা ও অনুসরণ করা প্রয়োজন, যে বিধান হবে সকল মানুষের জন্য সকল যুগে প্রযোজ্য। এই বিধান দেয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই এবং তাঁর বিধানই সকল মানুষের জন্যে ও সকল যুগে প্রযোজ্য হতে পারে, এ বিষয়টি প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে হবে। মানুষের জীবনের সকল পর্যায়ে একমাত্র তিনিই নীতি নির্ধারক এবং একমাত্র তাঁর আইনই অনুসরণ করতে হবে। মানুষের ওপরে তিনিই কর্তৃত্ব করবেন এবং মানুষকে অনুসরণ করার আদেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। আইন-বিধান রচনা করার, রচিত আইন অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার অধিকার কারো নেই এবং কেউ যদি তা করে তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে কোনো মানুষ একমাত্র আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কারো আইন অনুসরণ করতে পারে না, কেউ যদি তা করে তাহলে সে-ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হবে।

আইন-বিধান প্রণয়ন ও তাওহীদ

আইন-বিধান প্রণয়ন, কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, নির্দেশ দান, অনুসরণের আদেশ, বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ, নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর- এই বিশ্বাস কাজ-কর্ম, কথা ও চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর অনুকূলের যাবতীয় ভূমিকা যেমন তাওহীদ তেমনি এর ব্যতিক্রম করলে তা অবশ্যই শিরক হবে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রত্যক্ষ নির্দেশ। গোটা সৃষ্টি জগত যেমন একমাত্র তাঁরই আইন-বিধানের অধিনে পরিচালিত হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগও একমাত্র তাঁর দেয়া আইন-বিধান দ্বারাই পরিচালিত হবে। আইন-বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই এককত্ব ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, অধিকার এবং মর্যাদা কেবলমাত্র ঐ আল্লাহরই- যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ পরিচালনা করছেন।

www.pathagar.com

শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বপ্রথম এই বাস্তবতা সমগ্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে, সার্বভৌমত্ব নির্ভেজালভাবে একমাত্র মহান আল্লাহর তা'য়ালার জন্য নির্ধারিত। তাঁর এই সার্বভৌমত্ব শুধু মাত্র প্রাকৃতিক জগৎ তথা এই মহাবিশ্বের প্রত্যেক অনু-পরমাণুতেই সীমাবদ্ধ নয়– মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে তার আন্তর্জাতিক জীবনেও পরিব্যাপ্ত। মানুষের সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক জীবনেও মানুষকে বিধি-বিধান প্রণয়নের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি।

অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রেও মানুষকে সার্বভৌমত্বের কোনো অংশ প্রদান করা হয়নি। মানব জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহই নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। ইসলাম তাওহীদের যে চেতনা বিশ্লেষণ করেছে, তার আলোকে এক, একক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'য়ালা শুধুমাত্র নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের ক্ষেত্রেই মানুষের মা'বুদ নন– বরং রাজনৈতিক এবং আইনগত অর্থের দিক থেকেও তিনি একচ্ছত্র অধিপতি এবং আদেশ-নিষেধের অধিকারী ও আইন প্রদানকারী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-

আল্লাহ ব্যতীত আর কারো শাসন চলবে না, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না, এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা। (সূরা ইউসুফ-৪০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) ক্ষেত্রে এই আকিদা পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং তিনিই আদেশ-নিষেধ দানকারী– এই দুটো মর্যাদা মহান আল্লাহর উলুহিয়াতের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর একটি আরেকটি থেকে পৃথক করার কোনো অবকাশ নেই। এর দুটোর একটিকে অস্বীকার করা বা অমান্য করার অর্থ হলো মহান আল্লাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করা। ইসলাম এই বিষয়টি নিয়েও সন্দেহ-সংশয়ে আবর্তিত হওয়ার কোনো অবকাশ রাখেনি যে, আল্লাহর বিধান বলতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الاَمْرِ مِنْ شَيْئٍ-قُلْ اِنَّ الاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ـ

তারা প্রশ্ন করে, ক্ষমতায় আমাদের কিছু অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর। (সূরা আলে ইমরাণ-১৫৪)

সৃষ্টিসমূহের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধানই কার্যকর থাকবে এবং ইসলামের গোটা আহ্বানের ভিত্তি হলো, মানুষ তার নৈতিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও সেই বিধানই অনুসরণ করবে যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ-

www.pathagar.com

অনুসরণ করো তাই যা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। (সূরা আ'রাফ-৩)

আল্লাহ তা'য়ালা যে আইন-কানুন অবতীর্ণ করেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু অনুসরণ করলে ঈমান থাকবে না এবং অনুসরণকারী স্পষ্ট কুফরীতে নিমজ্জিত হবে। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতসমূহে পর পর তিনবার ঘোষণা করা হয়েছে–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক।

যারা আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা তথা মানুষের জীবনের সার্বিক দিক পরিচালিত করে না, এসব লোকদের সম্পর্কে তিন ধরনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে কাফির, তারপর জালিম এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে তারা ফাসিক। এই তিনটি ঘৃণ্য বিশেষণের স্পষ্ট অর্থ হলো, যেসব কর্তৃত্বশীল লোকজন মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর দেয়া আইন-বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-বিধান বা কোনো দার্শনিক, চিন্তাবিদ বা বিজ্ঞানী কর্তৃক রচিত আইন-বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগ পরিচালিত করে, তারা মূলত তিনটি বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে।

আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিধি-বিধান জারী করার সুস্পষ্ট অর্থ হলো আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা আর এ পথে যারা অগ্রসর হয়, তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা মানব মন্ডলীর জন্য যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ, ইনসাফভিত্তিক এবং ভারসাম্যমূলক। এর বিপরীতে যত বিধি-বিধান রয়েছে তা ন্যায় ও ইনসাফের বিপরীত। সুতরাং আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান অনুযায়ী যারা মানুষকে পরিচালিত করে, তারা স্পষ্টই মানুষকে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করে তথা মানুষের প্রতি জুলুম করে।

আল্লাহ তা'য়ালা হলেন মা'বুদ এবং মানুষ হলো তাঁর দাস বা গোলাম। গোলাম যখন মনিবের আইন-বিধান অমান্য করে নিজের বা অন্য কারো আইন-বিধান জারী করে, তখন সে দাসত্ব, গোলামী বা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে। আর আনুগত্যের সীমা লংঘন করাই হলো ফাসিকী।

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে মানুষের বানানো বিধি-বিধান অনুযায়ী নিজে চলে এবং গোটা জাতিকেও পরিচালিত করতে চায়, তাদের বাস্তব কাজের অনিবার্য ফল হলো কুফরী, জুলুম ও ফিস্‌ক। যেখানেই যে ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা জাতি আল্লাহর বিধান অমান্য, অস্বীকার বা লংঘন করবে, সেখানেই উক্ত তিনটি বিষয় একের সাথে অপরটি জড়িত থাকবে। অবশ্য আইনের মাত্রা ও পর্যায় এবং ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য রয়েছে, উক্ত তিনটি বিষয়েও অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে।

যে ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা জাতি মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের পরিবর্তে অন্য কোনো বিধান অনুসরণ করে, বা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই বিধান অনুসারে পরিচালিত করতে চায়, সেই ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা জাতির দৃষ্টিতে সেই বিধানই সত্য, অভ্রান্ত, নির্ভুল ও কল্যাণকর। আর আল্লাহর বিধান অচল, অকল্যাণকর ও অনুসরণের অযোগ্য। এ কারণেই তো তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায় না এবং যারা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করে, তাদের সাথে বিরোধিতা করে। এসব লোক সুস্পষ্ট কাফির, ফাসিক ও জালিম। নিজেদেরকে এরা মুসলিম হিসেবে দাবী করলেও কোরআনের দৃষ্টিতে এরা মুসলিম নয় এবং এরা যদি মুখে আল্লাহ-রাসূলের নাম উচ্চারণ করে ও নামাযও আদায় করে, তাহলে বুঝতে হবে, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধোকা দিয়ে নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার জন্যই এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

আর যে ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায় মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সত্য বলে মুখে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু তারা নিজে অথবা নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত করে, তারা মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না, কিন্তু নিজের দ্বীন-ঈমানকে কুফর, জুলুম ফাসিকীর সাথে একাকার করে ফেলে। একইভাবে যারা জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগে মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ ও মত অনুসরণ করে, তারাও উক্ত তিনটি বিশেষণে বিশেষিত হবে।

আর যারা জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর বিধানও অনুসরণ করে আবার মানুষের বানানো বিধানও অনুসরণ করে, তাদের ঈমান কুফরের গন্ধমুক্ত নয়। অর্থাৎ এদের জীবনধারা ঈমান ও কুফরের সংমিশ্রণে পরিচালিত হয় এবং এরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেকে সোপর্দ করেনি।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো মানুষকে আইন-বিধান রচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়নি। এ ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং কাউকে শরীক করেননি। কারো আইন-বিধান অনুসরণ করার অর্থই হলো, আইন-বিধান রচয়িতার দাসত্ব বা ইবাদাত করা। কিন্তু মানুষকে দাসত্ব বা ইবাদাত করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর আর এর বিপরীত পন্থাই হলো শির্ক।

হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকারও আল্লাহ তা'য়ালা কারো হাতে সোপর্দ করেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি যতই সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হন না কেনো, তিনি যেমন পারেন

www.pathagar.com

না নিজের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতে, অনুরূপভাবে বৈষয়িক দৃষ্টিতে পৃথিবীর কোনো মানুষ যতোই ক্ষমতাশালী, বিখ্যাত চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক বা সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হন না কোনো, তারও সে ক্ষমতা নেই।

হালাল-হারাম ঘোষণা করার কর্তৃত্ব শুধুমাত্র মহান আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো কিছুকে হারাম করার বা হালাল বলে ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তাহলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সে আল্লাহর বিধান লংঘন করে শির্ক করছে। নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী যারা আইন-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে আর যারা তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে, তাদেরকে সমর্থন দিবে এবং অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক করার মতো মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হবে। আর এই অপরাধ সচেতনভাবে যারা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। সূরা আশ্ শূরার ২১ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ-

এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোনো শরীকে বিশ্বাস করে যে, এদের জন্য জীবন ব্যবস্থার মতো এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে, আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি?

উল্লেখিত আয়াতে নিশ্চিতভাবে সেইসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে সাধারণ মানুষ বিশাল কিছু মনে করে তাদের চিন্তাধারা বা আদেশ-নিষেধকে অনুসরণ করে থাকে আর এভাবেই তারা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে এদেরকে অংশীদার বানিয়ে থাকে। যাদের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত বা গবেষণালব্ধ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ, আকীদা, বিশ্বাস, বিভিন্ন ধরনের নিয়ম নীতি, হতে পারে তা সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবার-সমাজ, শিক্ষা, অর্থ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেসব দর্শন দিয়েছে আর এসবের প্রতি যারা বিশ্বাস পোষণ করে, এসব মূল্যবোধ যারা অনুসরণ করে, তাদের দেয়া নীতিমালা সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বা সামরিক বিভাগে অনুসরণ করে তারাও শির্ক করে।

এক কথায় কোনো মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রসূত বা চিন্তা-গবেষণালব্ধ কোনো বিধান অনুসরণ করা যাবে না, যদি কেউ তা করে তাহলে সে স্পষ্টই মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার দাঁড় করানোর অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এই অপরাধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে আলোচনা করেছেন।

আইন-বিধান রচনার ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব যেমন মহান আল্লাহর তেমনি হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকারও একমাত্র মহান আল্লাহর। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মদ্য পানের জন্য পানশালা, অবৈধ যৌন সম্ভোগের জন্য পতিতালয়ের অনুমোদন আর অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রচলন করলেই তা হালাল হয়ে যাবে না এবং রাষ্ট্রের এই অধিকারও ইসলাম স্বীকার করে না। সূরা নাহল-এর ১১৬ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

www.pathagar.com

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ-

নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্তভাবে এ কথা বলো না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জীবনের জন্য মহান আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি, তার মূল প্রাণশক্তি এবং সার-নির্যাসই হচ্ছে তাওহীদ। ইসলামের মূলনীতিই হচ্ছে. আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে এবং সামষ্টিকভাবে সকল মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য এ অধিকার স্বীকার করা হবে না যে, সে নির্দেশ জারী করবে এবং অন্যেরা তার অনুসরণ বা আনুগত্য করবে। এই অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নেই।

পৃথিবীতে এমন কোনো চিন্তাবিদ বা দার্শনিক অথবা মতবাদ-মতাদর্শের উদ্ভাবক ছিলেন না, যাদের চরিত্রে দুর্বলতা ছিলো না। একমাত্র নবী-রাসূলগণই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ। এসব সর্বোত্তম মানুষকেও স্বতন্ত্রভাবে আদেশ দেয়ার, নিষেধ করার বা আইন-বিধান রচনা করার অধিকার দেয়া হয়নি। সূরা আনআ'ম-এর ৫০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলেছেন, আপনি বলে দিন-

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ-

আমি তো শুধু সেই ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়। (আনআ'ম-৫০)

আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ

সাধারণ মানুষকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ শুধু এই জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে আদেশ দেন না, বরং মহান আল্লাহর নির্দেশ জারী করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ-

আমি যাকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে- এ জন্যই প্রেরণ করেছি। (সূরা আন্ নিসা-৬৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন সাধারণ মানুষকে মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে আর এ লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের আনুগত্য করতে বলেছেন। তাঁরা নিজেরা কোনো আইন প্রণয়ন করেন না, বরং মহান আল্লাহর নির্দেশেই করেন। সুতরাং কোনে ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠী এমন দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়েও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। মানুষ শুধুমাত্র প্রজার মর্যাদা রাখে, আইন প্রণয়নের মর্যাদা রাখে না। সকল মানুষ মিলিত হয়েও যেমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না,

www.pathagar.com

তেমনি তারা আল্লাহর আইন সংশোধন করতেও পারে না। যেসব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁরই নির্দেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে তা অস্বীকার বা অমান্য করার অধিকার মানুষকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا-

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর নিজের সে ব্যাপারে ভিন্নরূপ ফায়সালা করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো। (সূরা আহ্যাব-৩৬)

আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন-বিধান বা আইন প্রণেতা মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই আইন-বিধান মানব মন্ডলী দুইভাবে লাভ করেছে। একটি মহাগ্রন্থ আল কোরআন– যা কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীতই মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ও হিদায়াতের সমষ্টি। অপরটি হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা বা তাঁর সর্বোত্তম আদর্শ অর্থাৎ তাঁর সুন্নাহ্– যা পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। কোরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি শুধু মাত্র আল্লাহর বাণীর ধারকই ছিলেন না, তাঁর দায়িত্ব শুধু এটাই ছিলো না যে, তিনি কেবল কোরআন পৌঁছে দিবেন।

তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা এবং মানবতার মহান শিক্ষক। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো, তিনি নিজের কথা, চিন্তা-চেতনা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করবেন, কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা মানব মন্ডলীকে অবহিত করবেন এবং সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মানব মন্ডলীকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিবেন। এরপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সম্মিলনে একটি শক্তিশালী সুসংগঠিত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সেই সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করবেন। এরপর সেই সংশোধিত সমাজকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করে মানব মন্ডলীকে শিক্ষা দিবেন যে, আল্লাহর বিধানের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা কোন্ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কাজ যা তিনি তাঁর নবুওয়্যাতের তেইশ বছরের জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁর পবিত্র কার্যাবলী যা সুন্নাহ্ নামে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই সুন্নাহই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সাথে মিলিত হয়ে মহান বাদশাহ্ আল্লাহ তা'য়ালার উচ্চতর আইনকে বাস্তবে রূপদান ও পরিপূর্ণ করেছে এবং ইসলামী পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনকেই শরীয়া বলা হয়েছে। এর মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন,

www.pathagar.com

বিয়োজন করার বিন্দুমাত্র অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। কেউ যদি তা করে, তাহলে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। আল্লাহর নবী ঘোষণা করেছেন, আমাদের এই জীবন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো জিনিস যদি কেউ এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নতুন করে উদ্ভাবন করে তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা হবে। (বোখারী, মুসলিম)

আইন-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো, মানব সভ্যতার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এমন কতক ক্ষেত্র ও দিক সম্মুখে আসতে পারে, যার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ পাওয়া না-ও যেতে পারে। এসব ক্ষেত্র সম্মুখে এলে কোরআন-সুন্নাহ্কে মূলনীতি বা ভিত্তি হিসেবে সম্মুখে এনে এরই ভিত্তিতে ব্যবহারিক ও প্রয়োগের বিধি-বিধান প্রস্তুত করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইসলাম মানুষের আইন প্রণয়নকে চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ করে দেয়না বরং তাকে আল্লাহর আইনের প্রাধান্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেয়। মহান আল্লাহর আইন হলো সর্বোচ্চ এবং এই আইনের অধীনে ও তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে আইন, বিধি, বিধান প্রণয়ন মানুষ করতে পারে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের কাজও এমনভাবে হতে হবে যে, তা ইসলামের প্রাণশক্তি, তার সাধারণ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তার স্বভাব-প্রকৃতি ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত না হয় এবং সর্বোপরি তা যেনো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংস্থাপিত হতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলামী আইন শাস্ত্র বা ফিকাহ্ বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছে।

আনুগত্যের ক্ষেত্রেও তাওহীদী চেতনা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। কোরআনের বিধানে মানুষের আনুগত্য লাভের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা- অন্য কেউ নয়। যা করলে আল্লাহর আনুগত্য হয় বান্দা শুধুমাত্র তাই করতে বাধ্য। মানুষের ওপর সার্বভৌমত্ব চলবে যেমন একমাত্র আল্লাহর, অনুরূপ মানুষ আনুগত্যও মৌলিকভাবে স্বীকার করবে কেবলমাত্র সেই আল্লাহরই। মানুষ মৌলিকভাবে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই মানতে বাধ্য নয় এবং আর কারো একবিন্দু আনুগত্য- তা যে কোনো দিক দিয়ে, যে কোনো ব্যাপারে বা ক্ষেত্রেই হোক না কোনো, লাভের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আছে বলে কোনোক্রমেই স্বীকার করাও যাবে না। আনুগত্যের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ অংশীদারহীন। তবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করার নির্দেশ যা এসেছে তা এ জন্য নয় যে, সেই আনুগত্য লাভের তার মৌলিক বা নিজস্ব অধিকার রয়েছে। অথবা মানুষ মূলতঃ তাকে মেনে চলতে বা তার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য।

পবিত্র কোরআনে অন্যের আনুগত্য করার নির্দেশ এ জন্য এসেছে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-

www.pathagar.com

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট। (সূরা আন্ নিসা-৫৯)

এই নির্দেশ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হলো, সে মহান আল্লাহর গোলাম এবং আল্লাহর গোলামীর অধীনে সে অন্য কিছু হতে পারে। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁরই নির্দেশ অনুসরণ করা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি শুধুমাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবে না, বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। রাসূলের আনুগত্য করতে হবে এবং এই আনুগত্য স্বতন্ত্র ও স্বয়সম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রাসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ মানুষের কাছে পৌছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও প্রমাণীত মাধ্যম। মানুষ কেবলমাত্র রাসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সনদ ও প্রমাণপত্র ব্যতীত আল্লাহর কোনো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

এ পর্যায়ে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানী করলো।'

এরপরের আনুগত্য হলো, মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের আনুগত্য। মুসলমানদের সাংগঠনিক, সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি– যারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকারী ওলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকগণ, আদালতের বিচারপতিগণ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। এ ক্ষেত্রেও আনুগত্য শর্তহীন নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্রষ্টার আনুগত্য পরিহার করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর নির্দেশ শোনা ও মানা ওয়াজিব, সে নির্দেশ তার অনুকূলে হোক বা না হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ না দেয়া হয়। যখনই আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ দেয়া হবে তখন তা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না। (বোখারী, মুসলিম)

মনে রাখতে হবে, যে আনুগত্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি প্রাপ্ত নয় বা যে আনুগত্য করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী

www.pathagar.com

করা হয়, তা করা যাবে না এবং করলে শিরক করা হবে। যে আনুগত্য করলে তা আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়, বান্দা কেবলমাত্র সেই আনুগত্য করবে। একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত প্রশ্নাতীতভাবে কারো আনুগত্য করা যাবে না। পরিবার প্রধানের, সমাজের নেতৃবৃন্দের, অফিস প্রধানের, সরকারী কোনো কর্মকর্তার বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শর্তহীন আনুগত্য করা যাবে না। তারা যে নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত হলে সেই নির্দেশ পালন করা সম্পূর্ণ শিরক।

শরীক বা অংশীদারিত্বের প্রয়োজন নেই

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত কোনো ব্যাপারে পার্টনারসিপ বা অংশীদারিত্বে যায় তিনটি অবস্থার কারণে। ব্যবসার কথাই ধরা যাক, মানুষ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে তিনটি কারণে। প্রথম কারণ হলো, স্বল্প পূঁজির বা পূঁজির অভাবের কারণে। দ্বিতীয় কারণ হলো, ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞান, কলা-কৌশল বা বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার কারণে। অর্থাৎ শুধু পূঁজি দ্বারা ব্যবসা হয় না। যে ব্যবসা করা হবে, তা সম্পর্কে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাজারজাতকরণের কলা-কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তৃতীয় কারণ হলো, শক্তি-সামর্থ। দৈহিক শক্তি-সামর্থ না থাকলে কেউ ব্যবসা করতে পারে না। ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হয়, বুদ্ধি মত্তা ও শ্রম প্রয়োগ করতে হয়। দৈহিক শক্তিহীন, রোগী, বৃদ্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অথর্ব মানুষের পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সফল ব্যবসা করতে হলে পূঁজি, বুদ্ধিমত্তা ও দৈহিক শক্তি থাকতে হবে।

উল্লেখিত এই তিনটি জিনিসের অভাব হলেই মানুষ তখন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে। পূঁজি আছে কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞান নেই, পূঁজি ও ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞানও আছে কিন্তু দৈহিক শক্তি নেই। যাঁর পূঁজি আছে, অপর দুটো উপকরণ নেই এ জন্য সে অপর দুটো উপকরণ যার আছে, তার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে। এটা একটি সাধারণ বিষয় এবং এই ব্যাপারটি মানুষের সম্মুখে প্রতি নিয়তই ঘটে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানুষ চোখের সামনে বা নিজের জীবনে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে চায় না। এই বিষয়টি নিয়েই যদি মানুষ চিন্তা করতো, তাহলে স্পষ্টই সে অনুভব করতো, মহান আল্লাহর কোনো শরীক থাকতে পারে না এবং কোনো শরীকের তাঁর প্রয়োজন হয় না।

ঐ তিনটি জিনিসের কোনো একটি জিনিসের অভাব হলেই না আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে শরীক করবেন– কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি বা মানুষের নিজের দেহও সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার কোনো অভাব নেই সুতরাং শরীকেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এ পর্যন্ত আমরা তাওহীদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালার ঐ তিনটি জিনিসের একটিরও অভাব নেই, তিনি অভাবমুক্ত, অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁর শক্তি-ক্ষমতা অবিনশ্বর, তিনি কল্পনাতীত শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ভান্ডার প্রত্যেক মুহূর্তে পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

থাকে। তাঁর দান মানুষের সেই অজানা-অজ্ঞাত সময় থেকে প্রত্যেক মুহূর্তে স্রোতের মতই প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর ভান্ডার সামান্যতমও হ্রাস পায় না। তিনি অমর-অক্ষয়, চিরঞ্জীব, যা খুশী তাই করতে পারেন, কোনো কিছু করতে ইচ্ছা হলে তিনি শুধু বলেন, হও- আর অমনি তা হয়ে যায়। এই বিষয়টি অনুভব করার পরও যারা শির্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নির্বোধ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।

যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মারাত্মক তিনটি মিথ্যে অপবাদ আরোপ করে। এর প্রথমটি হলো, আল্লাহ তা'য়ালা অভাবমুক্ত নন- তিনি অভাবী। অভাবের দুর্বলতা তাঁর রয়েছে এবং তাঁর ভান্ডার অপূর্ণ-অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মহাবিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন না, এ জন্য তাঁকে ভিন্ন শক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয় বা কোনো মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়। তৃতীয়টি হলো, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে অন্যের শক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয়।

যারা শির্ক করে, তারা এই তিনটি মারাত্মক মিথ্যে অপবাদ মহান আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, শির্ক হলো, সবথেকে বড় জুলুম।

শির্ক হলো ধারণা, কল্পনা ও অনুমান নির্ভর, এর কোনো বুনিয়াদ বা ভিত্তি নেই। শির্কের পক্ষে কোনো সনদ-প্রমাণ বা দলীল নেই। কল্পিত যেসব বস্তু বা শক্তিকে মহান আল্লাহর অংশীদার মনে করা হয়, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব কিছুই একজন অদ্বিতীয় স্রষ্টার সৃষ্টি আর এরা হলো সেই মহান স্রষ্টার দাস। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ-

তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আর যাদেরকে আহ্বান করো, তারা তো তোমাদের মতই দাসানুদাস মাত্র। (সূরা আ'রাফ-১৯৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মানুষ আমাকে ত্যাগ করে, আমাকে বাদ দিয়ে যেসব শক্তির সামনে মাথানত করছে, মানুষ কি চিন্তা করে দেখছে না, এসব শক্তির স্রষ্টা আমি এবং সেগুলো আমারই দাসত্ব করছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন, জড় পদার্থের সামনে তোমরা মাথানত করো, মূর্তির সামনে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করো, তাদের কাছে তোমরা প্রার্থনা করো, সন্তান কামনা করো, ধন-দৌলত কামনা করো, বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাও, রোগ থেকে মুক্তি চাও, তারা কি তোমাদের ডাক শোনে? তাদের সামনে তোমরা নানা ধরনের মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজিয়ে রেখেছো, সেসব খাবার তারা খেতে পারে না, সেসব খাবারে যদি একটা মাছি বসে, সে মাছিকেও তারা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়, তাহলে তোমরা কেনো এমন অথর্ব, অক্ষম মূর্তিকে ডাকো?

তোমাদের কি চোখ নেই? তোমাদের কি কান নেই? তোমাদের কি চিন্তা করার মত মগজ নেই? তোমরা কি চিন্তা করে দেখো না? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.pathagar.com

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সব শক্তিকে ডাকে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে, যারা তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্তও উত্তর দিতে সক্ষম নয় আর তারা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর লোকজনদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? (সূরা আহ্কাফ-৫)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব শক্তির পূজা-অর্চনা করে, তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, এসব মূর্তি তাদের প্রার্থনা শোনে না, শোনার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রার্থনাকারী কি প্রার্থনা করছে, সে সম্পর্কে এসবের কোনো চেতনা নেই। এরা মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো শক্তিকে ডাকবে না, যারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তোমার কোনো ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। তুমি যদি তাদেরকে ডাকো, তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে, যিনি প্রার্থনা শোনেন, যিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। যিনি মানুষের প্রতিপালক। যিনি কখনও ধ্বংস হন না। যিনি চিরঞ্জীব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা ডাক কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। (সূরা মু'মিন-৬৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যাদেরকে ডাকছো, যাদের কাছে দোয়া করছো, তারা কোনো জিনিসের মালিক নয়–নয় কোনো বস্তুর স্রষ্টা। তারা স্বয়ং আমারই সৃষ্টি। তারা তোমার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। সূরা ফাতির-এর ১৩-১৪ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ-اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের কাছে দোয়া করো, তাদের কেউই একবিন্দু তুচ্ছ জিনিসের মালিক নয়। তারপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছে দোয়া করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, আফালা তা'কিলুন–আফালা তুবছিরুন, তোমরা কি বোঝো না? তোমরা কি চিন্তা করো না? তোমাদের কি জ্ঞান নেই? আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছি, চোখে যে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি, তা ব্যবহার করো, প্রয়োগ করো তোমার চিন্তাশক্তি। তাহলেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা যাদের মা'বুদ মনে করছো তাদের বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। মাছির মতো ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর পাখাও নির্মাণ করার শক্তি তাদের নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সমস্ত শক্তির অধিকারী। তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا–

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ হলেন, সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ 'আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার উৎস' এটা স্বীকার করতে চায় না। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র একটি মুখরোচক শ্লোগান আবিষ্কার করেছে, 'সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।' এই কথাটি আসলে প্রতারণামূলক। এই শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়। জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবর্গ নিজের স্বার্থে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের শ্লোগান দেয়া বা এ কথা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথা যারা বিশ্বাস করবে এবং প্রচার করবে, তারা অবশ্যই শিরক্ করবে। আর শিরক্ হলো সবচেয়ে বড় গোনাহ্ এবং আল্লাহর সাথে কৃত এক জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং তাঁরই সৃষ্টি মানুষ সম্পর্কে তিনি বলছেন–

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا–

মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আন্ নিসা-২৮)

মানুষের দুর্বলতা স্বয়ং মানুষের চোখেই স্পষ্ট, এই দুর্বল মানুষ কিভাবে সকল ক্ষমতার উৎস হতে পারে? এ ধরনের কথা যারা বলে আর যারা বিশ্বাস করে, উভয়েই শিরক্ করে- সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে সব ধরনের গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

আল্লাহর সাথে শিরক্ করা হলে তিনি তা ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য গোনাহ্ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসা–১১৬)

www.pathagar.com

'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথাটি বিশ্বাস করা শির্‌ক তথা কুফ্‌রী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ–

যারা শিরক্ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করেছেন।

এ জন্যই জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে শিরকমুক্ত রাখার লক্ষ্যেই হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তান, আল্লাহর সাথে কাউকে শির্‌ক করো না, শির্‌ক অবশ্যই সবথেকে বড় জুলুম।' এ জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে তাওহীদের চেতনাভিত্তিক জীবন-যাপন করতে হবে।

শির্‌ক সবথেকে বড় জুলুম হবার কারণ

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে মহান আল্লাহর সাথে শির্‌ক স্থাপন করতে নিষেধ করে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর সাথে শির্‌ক করা হলো সবথেকে বড় জুলুম। সম্মানিত মুফাস্‌সিরীনে কেরামদের মতে এই কথাটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুটো কারণে উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন নিজের প্রিয় সন্তানকে। এই পৃথিবীতে একজন পিতা নিজের ব্যতীত অন্য কারো স্বার্থে যখন লাভজনক কোনো কাজ করে, তখন সর্বপ্রথম সে তার নিজের সন্তানের জন্যই সেই লাভজনক কাজটি করে থাকে। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, সচেতনভাবে হোক আ অসচেতনভাবে হোক, মানুষ অকল্যাণ, ব্যর্থতা আর মারাত্মক ক্ষতির দিকেই দ্রুত বেগে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সময় এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে নিজেকে হেফাজত করার মতো কোনো উপায় যদি পিতার জানা থাকে, তাহলে পিতা সর্বপ্রথম সেই উপায়টি নিজের প্রিয় সন্তানকেই জানিয়ে দেয়।

আরেকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে অনেকের সন্তান লেখাপড়া করে। ঘটনাক্রমে যদি সেই বিদ্যালয়ে অগ্নিকান্ড ঘটে, তাহলে প্রত্যেক সন্তানের পিতা নিজের সন্তানের ব্যাপারেই সবথেকে বেশী উদ্বিগ্ন থাকে এবং নিজের সন্তানকেই বাঁচানোর চেষ্টা করে। মহান আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার বিষয়টিকে যদি সর্বগ্রাসী আগুনের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে বলা যায় যে, এই শির্‌ক মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়- ধ্বংসের শেষ স্তরে পৌঁছে দেয়। জ্ঞানী পিতা যখন অনুভব করেন, আমার সন্তান নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল তলদেশে পৌঁছে যেতে পারে, তার জীবনের সবটুকু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এই ভয় আর আশঙ্কা একজন প্রতারক ব্যক্তিকেও চরমভাবে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। সে প্রতারক হলেও নিজের সন্তানের সাথে এই অবস্থায় কোনোক্রমেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সে জানে, এখন যদি সে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তার প্রিয় সন্তান মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। এ জন্যই পিতা তার সন্তানকে মহাক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্য তার জ্ঞান অনুযায়ী সন্তানকে সত্য-সঠিক পথে অগ্রসর হবারই পরামর্শ দেয়।

www.pathagar.com

শির্‌ক-কে ব্যাপক বিধ্বংসী বর্তমান যুগের আণবিক বোমার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি নগর, একটি সভ্যতা অগণিত অর্থ ব্যয় ও দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাশক্তি আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিলো। এই শহর দুটো ধ্বংসের পূর্বে সেখানে বিশাল আকারের অট্টালিকা, কলকারখানা ও অন্যান্য উপকরণ গড়তে অগণিত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের মেধাশক্তি ও শ্রম ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু আণবিক বোমা মুহূর্তেই তা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিলো। অর্থাৎ ঐ শহর দুটো গড়তে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস করতে সময়ের প্রয়োজন হয়নি। অনুরূপভাবে একজন মানুষ তার জীবনকাল ব্যাপী নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করেছে, কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বা সমর্থন ব্যক্ত করে যে শির্‌ক সে করেছে, এই শির্‌ক তার সমস্ত ভালো কাজ বিনষ্ট করে দিয়েছে।

জীবনব্যাপী অর্জিত ভালো কাজগুলো ধ্বংস করার জন্য একটি মাত্র শির্‌ক নামক গোনাহ্‌ই যথেষ্ট। যে ব্যক্তির আমলনামায় শির্‌কের গন্ধ থাকবে, মহান আল্লাহ্ আখিরাতের ময়দানে তার দিকে দৃষ্টিও দিবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا–

এবং তাদের সমস্ত কৃত কর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো। (সূরা ফুরকান-২৩)

আদালতে আখিরাতে মহান মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের আমলনামা দেখবেন। আমলনামার দিকে তিনি মনোনিবেশ করবেন এবং যার আমলনামায় শির্‌ক দেখতে পাবেন, মুহূর্তকালের মধ্যে সেই আমলনামায় উল্লেখকৃত ভালো কাজসমূহ বিক্ষিপ্ত ধুলোয় পরিণত করবেন। শির্‌ক মিশ্রিত আমলের কোনোই মূল্য নেই। পৃথিবীতে যে যতো বিখ্যাতই হোক না কোনো, মানুষের জীবন যাত্রা উন্নয়নে এবং দেশ ও জাতিকে সুন্দর করে সাজাতে যিনি যতো বড় অবদানই রাখুক না কোনো, তার আমলনামায় যদি শির্‌ক থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই, তার সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, লূকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞান দেয়া হয়েছিলো এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি জানতেন যে, মহান আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার পরিণতি হলো, জীবনের যাবতীয় অর্জন শেষ হয়ে যাওয়া এবং নিজেকে ধ্বংসের অতল তলে নিক্ষেপ করা। হযরত লূকমান সর্বপ্রথমে নিজের সন্তানকে সেই মহাক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্যে প্রিয় সন্তানকে বলেছিলেন– হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যে লোকগুলোর সম্মুখে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলেন, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করেছিলো। এরপরেও মহাসত্যের অদম্য আকর্ষণে যারা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করছিলো, তাঁদেরকে মুশরিক পিতামাতা

www.pathagar.com

তাওহীদ পরিত্যাগ করার জন্য নানাভাবে বাধ্য করছিলো। যেমন হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। নবীজীর হিজরতের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সময়কালে হযরত সায়াদ ছিলেন সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ১৭ অথবা ১৯ বছরের তরুণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব ও প্রকৃতি দান করেছিলেন। তিনি যখনই শুনলেন মহাসত্যের আলো হেরা পর্বত থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, দেরী করলেন না। দ্রুত ছুটে গেলেন দরবারে নববীতে।

সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী উচ্ছল তরুণ সায়াদ আল্লাহর নবীর হাতে হাত রাখলেন। প্রথম দিকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাদেরকে সাবিকুনাল আওয়ালীন বলা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন ইসলাম গ্রহণকারীদের ক্রমিক অনুসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। আবার কেউ বলেছেন তাঁর পূর্বে আরো ছয় বা সাতজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সে সময় ইসলাম কবুল করার অর্থই ছিল গোটা পৃথিবীকে নিজের শত্রুতে পরিণত করা। যে কোনো বিপদ-মুসিবতকে নিজের ওপরে চাপিয়ে নেয়া। উন্মুক্ত তীক্ষ্ণধার যুক্ত তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেয়া। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন সেই সাহসী যুবক-যিনি কোনো ধরনের বিরোধিতার পরোওয়া না করে নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করে মহাসত্য ইসলামের পতাকা উড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর বড় ভাইয়ের নাম ছিল উতবা। সেছিল কাফির, এই জাহান্নামের কীটই ওহূদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারকে পাথর নিক্ষেপ করে চেহারা মোবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজীবন তাঁর কাফির ভাইয়ের ওপরে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ। আমি উৎবার রক্তের চেয়ে বেশী অন্য কারোর রক্ত পিপাসু ছিলাম না।

ওহূদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যখন বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত হয়েছিল তখন হযরত সায়াদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পাশে থেকে হেফাজত করছিলেন। বোখারী হাদীসে এসেছে, যুদ্ধের ময়দানে চরম নাজুক অবস্থায় আল্লাহর নবী নিজের তুনির থেকে তীর বের করে হযরত সায়াদের হাতে দিতেন আর বলতেন, 'হে সায়াদ। আমার মাতা-পিতা তোমার ওপরে কোরবান হোক তুমি তীর চালাও।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমি সায়াদ ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এমন ধরনের বাক্য আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখ থেকে আর শুনিনি।'

হযরত সায়াদ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবা, যিনি ইসলামের জন্য শত্রু পক্ষের দিকে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। স্বয়ং তিনি বলেছেন, 'আমিই প্রথম আরব যে আল্লাহর পথে তীর চালিয়েছিল।'

হযরত সায়াদের পিতার নাম ছিল ওয়াক্কাস আর মায়ের নাম ছিল হামনা। হামনা তার নিজের বাপ-দাদার আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তার সন্তান

সায়াদ তাওহীদের দাওয়াত কবুল করেছে তখন তিনি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লেন যে, খাদ্য ও পানি পান ত্যাগ করলেন এমনকি কথা বলাও বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরবের সেই মরুপ্রান্তরে প্রচন্ড রোদের মধ্যে বসে থাকলেন। শর্ত দিলেন যতক্ষণ সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ তিনি এই রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না। কারো সাথে কথা বলবেন না। কোন খাদ্য বা পানিয় গ্রহণ করবেন না। সায়াদ ইসলাম ত্যাগ না করলে তিনি এভাবেই আত্মহত্যা করবেন।

হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর মা'কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর জীবনে সবথেকে বড় পরীক্ষায় নিপতিত হলেন। একদিকে মায়ের জীবন রক্ষা অন্যদিকে ঈমান রক্ষা। কিন্তু বাতিলের সাথে তিনি আপোষ করলেন না। তিনি তাঁর মা'কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'মা তুমি আমার কাছে অসম্ভব প্রিয়। কিন্তু তোমার শরীরে যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকে আর আমার সামনে তোমার প্রতিটি প্রাণ এক এক করে বের হয়ে যায় তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না।'

তাঁর মা তাকে বার বার চাপ দিতে থাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য আর তিনি সেই একই জবাব দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁর মায়ের মিথ্যার প্রদীপ সত্যের মশালের সামনে নির্বাপিত হতে বাধ্য হলো। মহাপরীক্ষায় হযরত সায়াদ এমনভাবে উত্তীর্ণ হলেন যে, স্বয়ং আরশে আজিমের অধিপতি খুশী হয়ে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ-فَلَا تُطِعْهُمَا-

কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্যে–যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জনো না–তোমার ওপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। (সূরা লূকমান-১৫)

এ কারণে উল্লেখিত আয়াতে সেই অজ্ঞদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমরা যে ব্যক্তির নাম এখন পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত করে থাকো, কথাবার্তায় যাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করো এবং কবিতায়ও যার নাম উল্লেখ না করলে তোমাদের কবিতাও যেনো অপূর্ণ রয়ে যায়, সেই লূকমানও নিজের সন্তানকে মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং সন্তানকে কল্যাণ ও সফলতার পথে পরিচালিত করার জন্যে বলেছিলেন, হে আমার সন্তান! ঐ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করো না, যিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁর বিধান অনুসরণ করবে, তাঁরই আনুগত্য করবে এবং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে।

লূকমান যে ব্যাপারে নিজের সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই একই কথা তো তোমাদের সামনে আমার নবী পেশ করছেন, তাহলে আমার নবীর কথা তোমরা অস্বীকার করছো কেনো? লূকমান যে কথা বলে সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলেন এবং তোমরাও তাকে শ্রদ্ধা করো, সেই একই কথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সামনে বলে কেনো তোমাদের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলেন? তোমাদের সকলের শ্রদ্ধার লূকমান নিজের

www.pathagar.com

সন্তানকে শির্‌ক থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিলেন, আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শির্‌কের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে বাধ্য করছো, এটা তোমাদের কি ধরনের আচরণ?

হযরত লূকমান তাঁর নিজের সন্তানকে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শির্‌ক না করার উপদেশ দিয়ে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। জুলুম আরবী শব্দ, এই শব্দটি ইনসাফ বিরোধী কাজ করার ক্ষেত্রে, কারো অধিকার হরণ করার ক্ষেত্রে, অবিচার, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যে জিনিস যে স্থানে থাকার যোগ্য, তাকে সে স্থানে না রেখে অন্যত্র রাখার অর্থ হলো, সেই জিনিসের সাথে জুলুম করা। স্বর্ণ শিল্পীরা অলঙ্কার নির্মাণ করে এবং অলঙ্কারের ধরন অনুসারে তা বক্সে বা রত্নাধারে রাখে। আংটি ও কণ্ঠহারের জন্য পৃথক বক্স রয়েছে। কণ্ঠাহার আংটির বক্সে রাখা হয়না এবং আংটিও কণ্ঠাহারের বক্সে রাখা হয় না। যদি আংটি কণ্ঠাহারের বক্সে রাখা হয়, তাহলে আংটির প্রতি জুলুম করা হয়। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝা গেলো, যেখানে যা রাখা উচিত, যার জন্য যেটি প্রযোজ্য এবং যার যে হক, তা যথার্থভাবে না করাই হলো জুলুম।

শির্‌ক এজন্যই সবথেকে বড় জুলুম যে, মহান আল্লাহর জন্য যা প্রযোজ্য নয় এবং যা প্রযোজ্য– শির্‌কারীরা এর বিপরীত কাজই করে থাকে। যে গুণ-বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কারো নেই, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সৃষ্ট কোনো বস্তু বা প্রাণীর প্রতি আরোপ করা। যে ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর, সেই ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যে অধিকার একমাত্র আল্লাহর, অন্য কাউকে সেই অধিকার প্রদান করা বা তাকে সেই অধিকারের অধিকারী বলে মনে করা। এসবই হলো সুস্পষ্ট জুলুম।

একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যে গুণ-বৈশিষ্ট্য, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ধারিত, তা যখন মানুষ অন্য কারো প্রতি আরোপ করে, তখন সে মানুষ যা কিছুই ব্যবহার করে, তা-ও মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। মানুষকে দেহ, মন, দেখা, শোনা, চিন্তা করার ক্ষমতা, দৈহিক ও কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা। এসব কিছু এবং মহান আল্লাহর সৃষ্ট নানা জিনিসও ব্যবহার করে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব কিছু তাকে দান করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার জন্য– অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করার জন্য নয়।

কিন্তু শির্‌ককারী এর বিপরীত কাজই করে আর এটাই হলো জুলুম। মানুষকে সৃষ্টিসহ যাবতীয় ব্যাপারে যিনি প্রতিপালন করছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করলে মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের অবস্থানও যথাস্থানে থাকে। আর এর বিপরীত করলে মানুষ নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায় এবং মানুষ হিসেবে তার অবস্থান যথাস্থানে থাকে না। সুতরাং যারা শির্‌ক করে, তারা নিজেদের সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করে নিজেদেরকে অসম্মান ও ঘৃণা-লাঞ্ছনার অবস্থানে নিক্ষেপ করে– আর এটাও সুস্পষ্ট জুলুম। কারণ কোনো মানুষকে এই অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে অসম্মানিত করবে।

তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার

হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, সূরা লূকমানের দ্বিতীয় রুকুতে তা উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, পরিবারই হলো মানব সন্তানের শিক্ষার সূতিকাগার এবং মানব সন্তানের শিক্ষার সূচনা পরিবার থেকেই করতে হবে। পারিবারিক আচার-আচরণ, ব্যবহার সন্তানের চরিত্রে সবথেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব হয় স্থায়ী। প্রত্যেক পরিবারে যখন নতুন অতিথি তথা শিশু আগমন করে, তখন শিশুর জীবনের প্রথম দিনগুলোয় বাকশক্তি থাকে না। শিশু তার নিজের প্রয়োজন ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশু অনুভূতি শক্তিহীন। শিশুর অনুভূতি ক্ষমতা রয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক শব্দাবলীর মাধ্যমে সে প্রভাবিত হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আচার-আচরণ দ্বারা শিশু সর্বাধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে।

শুধু মানব শিশুই নয়– বাকশক্তিহীন বন্য বা গৃহপালিত প্রাণীরও অনুভূতি শক্তি প্রবল। গৃহস্থের বাড়িতে যে পশু-প্রাণী রয়েছে, এদের সেবক বা মনিবকে এরা ঠিকই চিনতে পারে এবং খাদ্যের প্রয়োজনে বা আদর নেয়ার জন্য সেবক বা মনিবের কাছেই এরা আসে। যে গরুটির বড় বড় শিং, মারকুটে স্বভাবের– সেটি কিন্তু তার সেবক বা মনিবকে সহজে আঘাত করে না। পোষা ময়না বা কাকাতুয়া পাখি অপরিচিত কাউকে বাড়িতে দেখলে সতর্ক সংকেত দেয়। এ থেকে বুঝা গেলো, অনুভূতি শক্তি শুধুমাত্র মানব শিশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– পশু-প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, আমি আমার সকল সৃষ্টিকে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী অনুভূতি শক্তি দান করেছি।

সুতরাং শিশু বাকশক্তিহীন হলেও তার অনুভূতি শক্তি থাকে প্রবল এবং সে হয় অনুকরণ প্রিয়। শিশু যখন পারিবারিক পরিমন্ডলে বড় হতে থাকে তখন থেকেই তাকে তাওহীদের জ্ঞান দিতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথমে তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার গঠন করতে হবে। শিশু যেন পারিবারিক পরিমন্ডলেই তাওহীদের শিক্ষা লাভ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, একটি রাষ্ট্রের প্রথম স্তর হলো পরিবার। মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি হলো পরিবার আর পরিবারের সামগ্রিক তথা বিকশিত রূপই হলো রাষ্ট্র। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তথা অনেকগুলো মানব সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার। অনেকগুলো পরিবারের সামষ্টিক রূপই হলো সমাজ। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায়, সুসংগঠিত পদ্ধতিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে, এসব সমাজের সমন্বিত রূপই হলো রাষ্ট্র।

সুতরাং রাষ্ট্রের ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবার না থাকলে সমাজ থাকে না, আর সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি আর সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত সমাজের বাস্তব ফলশ্রুতি হলো রাষ্ট্র। প্রত্যেক পরিবার থেকে আদর্শ মানুষ সরবরাহ করা হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরিবার থেকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোক সংখ্যা গরিষ্ঠ হলে তাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রভাবিত হতে বাধ্য। মুসলিম দেশের প্রত্যেক পরিবার যদি তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার হয় এবং সেই পরিবারে যে শিশু আগমন করবে, সেই শিশুও স্বাভাবিকভাবেই তওহীদের শিক্ষায় প্রভাবিত হবে।

www.pathagar.com

বর্তমান সমাজের প্রত্যেক পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, পরিবারে যা কিছুর চর্চা হয়, সেই পরিবারে যে শিশু বড় হতে থাকে, সেই শিশুও পারিবারিক প্রভাব মুক্ত থাকে না। পিতামাতা যদি গান-বাজনা, কবিতা-সাহিত্য চর্চা করে, সেই পরিবারের শিশুর ঝোঁক-প্রবণতাও পিতামাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। পিতা বা মাতা যদি চিকিৎসক হয়, তাদের শিশুও বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, খেলার ছলে নিজেকে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। পিতামাতা বা পরিবারের কোনো সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য হলে, সেই পরিবারের শিশুও সেই সদস্যকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যদেরকে নামায আদায় করতে দেখলে শিশু বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, পিতামাতার পাশে গিয়ে নামায আদায় করতে থাকে। যে পরিবারে পিতামাতা বিপদের সময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযর্গদের ডাকে, মাজারে গিয়ে মানত দেয়, সেই পরিবারের শিশুও এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। শিশু যখন দেখে তার পিতামাতা জড়পদার্থের সম্মুখে গড় হয়ে প্রণাম করছে, শিশুও তা অনুকরণ করে।

এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–প্রত্যেকটি শিশুই প্রকৃতপক্ষে মানবিক প্রকৃতির ওপরই মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতাই তাকে পরবর্তীকালে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।

মুসলিম বাহিনী কোনো এক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের শিশুদের হত্যা করলে এ সংবাদ আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছলে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন– লোকদের হলো কি, তারা সীমা অতিক্রম করেছে এবং শিশুদেরও হত্যা করেছে?' একজন বললো, ওসব শিশু কি মুশরিকদের সন্তান ছিলো না?' নবীজী বললেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম লোকজন তো মুশরিকদেরই সন্তান। প্রত্যেক প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি যখন কথা বলতে শিখে তখন তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী খৃষ্টানে পরিণত করে। (আহ্মাদ, নাসায়ী)

পরিবারে যে শিশু আগমন করে, পিতা থাকলে পিতার অথবা পিতার অবর্তমানে শিশুর যিনি অভিভাবক– তার এটা দায়িত্ব যে, তিনি ঐ সত্তার সাথে শিশুকে পরিচয় করে দিবেন, যে সত্তা শিশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ সর্বপ্রথম শিশুকে সেই সত্তার হক বা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যে সত্তার নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের কোনো শিশু যখন কথা বলতে শিখতো, তখন তিনি সেই শিশুকে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন–

اَلَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا–

যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান-২)

www.pathagar.com

আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে শিক্ষা দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' শিশুকে শুধু কালিমা মুখস্থ করার কথা বলা হয়নি, এই কালিমা তৈয়্যেবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ শিশুকে সর্বপ্রথম তাওহীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু কথা বলা শিখলেই পবিত্র কোরআনের যে আয়াত শিখিয়ে দিতেন, সেই আয়াতের মধ্যে তাওহীদের সমগ্র শিক্ষা পরিপূর্ণ রয়েছে। শিশুর মন-মানসে তাওহীদের পরিপূর্ণ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের শিশুর মুখে কথা ফুটলে বা শৈশবে যখন বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে তখনই শিশুর মন-মস্তিষ্কে সূচনাতেই তাওহীদের ঐ ছবি অঙ্কন করে দিতে হবে, যে ছবি উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্কন করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারকেই এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং পরিবারকে শিক্ষার সূতিকাগারে পরিণত করতে হবে। পরিবারকে তাওহীদের রঙে এমনভাবে রঙিন করতে হবে, শিশুর মন-মানস যেনো স্বাভাবিকভাবেই তাওহীদের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

অধিকার সচেতন করা আল্লাহর নিয়ম

সূরা লূকমানের ১৩ নম্বর আয়াত থেকে হযরত লূকমানের উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছেন– তা শেষ হয়েছে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা হযরত লূকমানের উপদেশের কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ না করে ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ১৬ নম্বর আয়াত থেকে পুনরায় হযরত লূকমানের উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত লূকমানের উপদেশের সমগ্র কথাগুলো একের পর এক উল্লেখ না করে, প্রথম উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করেই পিতামাতার প্রসঙ্গ কেনো উল্লেখ করলেন?

হযরত লূকমানের প্রথম উপদেশের কথাগুলোর মধ্যেই উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে–'হে আমার প্রিয় সন্তান, আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করো না, শির্ক অবশ্যই সবথেকে বড় জুলুম।'

একজন সচেতন পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি হযরত লূকমানের যে দায়িত্ব-কর্তব্য ছিলো, তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। সন্তানের প্রতি তাঁর প্রথম দায়িত্বই ছিলো, তিনি সন্তানকে সেই সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন, যে সত্তা একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর এককত্ব, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট, অসীম ক্ষমতা, সীমাহীন জ্ঞান এবং অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করতে হবে। মানুষের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে হক বা অধিকার রয়েছে, পিতা সেই হক বা

www.pathagar.com

অধিকার সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তুলবেন। হযরত লুকমান নিজ সন্তানের প্রতি সেই দায়িত্ব এমন সুন্দর ভাষা ও পদ্ধতিতে পালন করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা খুবই পছন্দ হয়েছে এবং এ জন্যই তিনি তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে সমগ্র মানব মন্ডলীর শিক্ষার জন্য পেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে হযরত লুকমান যখন এই গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালাও খুশী হয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে সন্তানকে সজাগ-সচেতন করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা যেনো হযরত লুকমানকে এ কথাই জানিয়ে দিলেন, তুমি যেমন আমার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে তোমার সন্তানকে সজাগ-সচেতন করলে, আমিও তোমাদের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে তোমার সন্তানকে সতর্ক করে দিলাম। পিতামাতা হিসেবে সন্তানের কাছে তোমাদের কি মর্যাদা এবং তোমাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, তা জানিয়ে দিলাম।

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন অনেকগুলো অধিকার আর কর্তব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার ও কর্তব্যকে দুই অংশে বিভক্ত করে এক অংশের নাম দেয়া হয়েছে আল্লাহর হক বা অধিকার এবং অপর অংশের নাম দেয়া হয়েছে বান্দার হক বা অধিকার। যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, একান্ত অনুগ্রহ করে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তার জন্যে এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, অগণিত নে'মাত দিয়ে ধন্য করেছেন, তাকে প্রতিপালন করছেন, সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য জীবন বিধান দিয়েছেন, সেই আল্লাহর প্রতি মানুষের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব হলো, মানুষ তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে।

অলৌকিক পন্থায় এই পৃথিবীতে আসার কোনো পদ্ধতি মানুষের নেই, মানুষকে পিতামাতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে আসতে হয় এবং তাদের আপত্য স্নেহ-ভালোবাসায় সে বেড়ে ওঠে। এখানে মানুষকে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকজনের সাহায্য-সহযোগিতায় জীবন-যাপন করতে হয়। এসব লোকজনের অধিকার রয়েছে একের প্রতি অন্যের। শুধু তাই নয়, মানুষ যে পৃথিবীতে বসবাস করছে, এই পৃথিবীতে মানুষ জীব হিসেবে শুধু একাই বসবাস করে না। আরো অসংখ্য জীব রয়েছে যারা এই পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল এবং এসব জীব মানুষেরই প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। শুধু জীবই নয়– অগণিত বস্তু সম্ভারে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীর প্রত্যেক স্তর। এসব বস্তু সম্ভারও কোনো না কোনোভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত এবং এসব বস্তু মানুষের কল্যাণেই দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ–

তিনি তোমাদের উপকারার্থে আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে তোমরা জানোই না। (সূরা আন্ নাহ্ল-৮)

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রত্যেক স্তরে এমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, এসব সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ এখন পর্যন্ত কিছুই জানে না। অথচ এসব সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কল্যাণে

www.pathagar.com

নিয়োজিত রয়েছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে মানুষের এসব প্রত্যেক বস্তু ও জীবের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষ কিভাবে পালন করবে, সে দিকনির্দেশনাও মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন অবতীর্ণ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছে কি দাবী করেন এবং সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহর প্রতি মানুষের কি অধিকার রয়েছে, এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি এক কথায় এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, অন্য কারো দাসত্ব করবে না এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

বিষয়টি বোখারী ও মুসলিম হাদীসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মানুষ যদি এই অধিকার আদায় করে তখন আল্লাহ তা'য়ালার ওপর মানুষের যে অধিকার সৃষ্টি হয়, তাহলো আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন না।

হযরত লুকমান তাঁর নিজের সন্তানকে মহান আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করে পৃথিবীর সমস্ত পিতামাতা ও অভিভাবকদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন, নিজের সন্তান ও অধীনস্থদের প্রতি সর্বপ্রথম কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষের সাথে মহান আল্লাহর কোন্ ধরনের সম্পর্ক এবং আল্লাহর প্রতি মানুষকে কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, এ ব্যাপারে সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, তেমনি প্রত্যেক নবী-রাসূলদের মাধ্যমেও মানুষকে মানুষের ভুলে যাওয়া সেই পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রুহের জগতে সমস্ত রুহ্‌কে একত্রিত করে আল্লাহ নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' প্রত্যেক রুহ্ এক বাক্যে স্বীকার করেছিলো, 'অবশ্যই আপনি আমাদের রব।' এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি মানুষের কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের দিকনির্দেশনা তোমার কাছে যেতে থাকবে।' এরপরও প্রত্যেক নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এবং সর্বশেষে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো যে–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৯)

মানুষকে সত্য ও মিথ্যা এবং অধিকার সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের ওপরে একান্ত অনুগ্রহ করে নিয়েছেন। এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে না জানিয়ে

www.pathagar.com

মানুষের ভুলের জন্য গ্রেফতার করা মহান আল্লাহর নীতি নয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফের বিপরীত কোনো কাজ করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً-

আর আমি হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৫)

পূর্বেই নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সম্পর্কে যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে না জানিয়ে মানুষকে গ্রেফতার করা আল্লাহর নিয়ম নয়। অধিকার সচেতন না হবার কারণে অধিকার আদায় করতে পারলো না এ জন্য তাকে গ্রেফতার করা হবে, এটা কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى-

আমি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করার পূর্বেই যদি কোনো শাস্তি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে এই লোকেরাই বলতে পারতো যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালে না কেনো? তাহলে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলা শুরু করে দিতাম। (সূরা ত্বাহা-১৩৪)

এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের উদ্যোগে তাঁর বান্দাদেরকে অধিকার সচেতন করেছেন। ন্যায়-অন্যায়বোধ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দান করেছেন। এরপর নবী-রাসূল প্রেরণ করে এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করে মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সজাগ-সচেতন করেছেন। হযরত লূকমান যখন আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সম্পর্কে নিজের সন্তানকে সতর্ক করলেন, আল্লাহ তা'য়ালাও সন্তুষ্ট হয়ে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে সন্তানকে সতর্ক করলেন।

রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করার পর মানুষের নিজের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শাস্তি দেয়া হলে মানুষের কোনো ওজর-আপত্তি থাকে না। কারণ এই শাস্তির জন্য সে স্বয়ং দায়ী- অন্য কাউকে দায়ী করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করে মানুষকে কোনো কাজের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত না করা এবং সেজন্য তাকে কোনো শাস্তি না দেয়া আল্লাহর ওপর মানুষের হক। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের এই হক বা অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পিতা-মাতার অধিকার

সূরা লুকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে জেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কারণ তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছরে উপনীত হয়ে সে দুধ পান করা ছেড়েছে। (এ কারণেই আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতামাতার প্রতিও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং সব শেষে তোমাদের সবাইকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।'

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, মানুষ পৃথিবীতে যাদের মাধ্যমে আগমন করেছে এবং যাদের আপত্য স্নেহ-বাৎসল্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে জেনে নিতে বলা হয়েছে। কোনো বিষয়ে যখন কোনো ব্যক্তিকে জেনে নিতে বলা হয়, তখন এটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যক্তিকে যে বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে বলা হচ্ছে, ইতোপূর্বে সে তা জানতো না। সন্তানের নিকট পিতামাতার প্রকৃত কি অধিকার রয়েছে, এ কথা পৃথিবীর কোনো সন্তানই জানে না বা জানার কোনো মাধ্যমই তার কাছে নেই। মানুষকে যতটুকু জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, এর সবটুকু প্রয়োগ করেও পিতামাতার প্রকৃত অধিকার সন্তানের পক্ষে আদায় করা সম্ভব ছিলো না বিধায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত দয়া করে মানব সন্তানকে তার পিতামাতার প্রকৃত অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান নবী-রাসূল প্রেরণ ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

এই নির্দেশ পবিত্র কোরআনে যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকারের প্রত্যেক দিক সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সজাগ-সচেতন করেছেন। তিনি নিজের পিতা ও গর্ভধারিণী মা'কে শৈশবেই হারিয়ে ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁর দুধ মা এবং শৈশবে তিনি যাঁদের আপত্য স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-মমতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিতামাতার অধিকার আদায় করতে হবে, এই নির্দেশ কোনো নতুন নির্দেশ নয়– প্রত্যেক নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমকালীন জনগোষ্ঠীকে পিতামাতার অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ–وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا–

স্মরণ করো, বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে আমি ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। পিতামাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে। (সূরা বাকারা-৮৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে পিতা ব্যতীতই মাতৃগর্ভে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকেও তাঁর মায়ের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তিনি নিজের জবানীতেই বলেছেন–

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ-وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا-

আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। (সূরা মার্‌য়াম-৩২)

মানুষের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সর্বপ্রথম এর পরেই মানুষের নিজের ওপর নিজের অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সর্বপ্রথম এই জন্য যে, তিনিই এই মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষই তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই নিখিল বিশ্ব, পৃথিবী ও মানুষকে একান্ত অনুগ্রহ করে তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব হতো না এবং কারো হক আদায়েরও কোনো প্রশ্ন উঠতো না। মানুষের নিজের ওপরে নিজের যে অধিকার রয়েছে, তা যদি আদায় না করে, তাহলে সেই মানুষের পক্ষে অন্যের হক সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা আদায় করাও সম্ভব নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বান্দার ওপরে আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করার পরই সর্বপ্রথমে মানুষের নিজের পিতামাতার অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এই জীবন লাভ করা সম্ভব হতো না, এটা যেমন অকাট্য সত্য– তেমনি একথাও পরম সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পিতামাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন। পিতামাতা ব্যতীত এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতার সূচনা করেছেন, এর সূচনায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে একজন পুরুষ মানুষকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একজন নারী সৃষ্টি করে উভয়কেই দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক পবিত্র বন্ধনে বেঁধেছেন এবং পবিত্রতার মাধ্যমেই মানব বংশের ধারা শুরু করেছেন। মানব বংশ যাদের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করছে, সেই পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এখানে এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, পিতামাতার প্রতি সন্তানকে কৃতজ্ঞশীল হওয়ার পূর্বে মানব সন্তানকে ঐ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞশীল তথা আল্লাহর হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا-

এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩-২৪)

যে কোনো বিচার বিশ্লেষণে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতা ও মাতা। পিতামাতাই হলেন একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ্‌র পরেই পিতামাতার স্থান। ব্যক্তির কাছে সকল বিবেচনায় যে কোনো বিষয়ে প্রথম হকদার হলো তার পিতা ও মমতাময়ী মাতা, যাদের ত্যাগ-তীতিক্ষার সামান্য একবিন্দুর মূল্য সন্তানের পক্ষে পরিশোধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এ জন্য সন্তানকে পিতামাতার প্রতি অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সকল স্তরের নৈতিক মূল্যবোধ এমন পর্যায়ে উপনীত করতে হবে যেনো, সন্তান পিতামাতার মুখাপেক্ষীহীন হয়ে না পড়ে– বর্তমানে যা পশ্চিমা দেশগুলোয় হয়েছে। বরং সন্তান নিজেদেরকে পিতামাতার অনুগৃহীত মনে করবে এবং তাদের বৃদ্ধ বয়সে ঠিক অনুরূপভাবে সেবা-যত্ন করার প্রশিক্ষণ দিবে, যেভাবে শৈশবে পিতামাতা তাদের পরিচর্যা, লালন-পালন করেছেন এবং নানা ধরনের ব্যবহার-মান-অভিমান সহ্য করেছেন।

ঠিক এই কারণেই ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচার-আচরণ, আনুগত্য ও তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পিতামাতার অধিকারের বিষয়টি চিরকালের জন্য এক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র আইন-কানুন, প্রথা-পদ্ধতি, নিয়ম-বিধি, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনামূলক বিধি-বিধান এবং শিক্ষানীতির মাধ্যমে পারিবারিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সংরক্ষণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করবে।

www.pathagar.com

পিতামাতার সম্মুখে সন্তানের বিনীত আচরণ

সূরা বনী ইসরাঈলের উল্লেখিত আয়াতে পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথমে মানব সন্তানকে তাওহীদের দাবী আদায় অর্থাৎ মহান আল্লাহর হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন– একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে, তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে, তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কারো বিধি-বিধান অনুসরণ করা বা দাসত্ব করা যাবে না। এক কথায় মহান আল্লাহর সাথে কারো শরীক করা যাবে না। এরপরই পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দুটো নির্দেশ একই আয়াতে পরপর দেয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেন, মানুষকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও পিতামাতার বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে একান্তভাবে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। মানুষের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং বান্দা সর্বপ্রথম তাঁরই হক আদায় করবে। কিন্তু মানব শিশুকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যক্ষভাবে নিজে প্রতিপালন করেন না, করেন পিতামাতার মাধ্যমে। এ কারণেই বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি বর্ণনা করার পরপরই পিতামাতার অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিতামাতার মাধ্যমে মানব সন্তানকে কিভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন তা সন্তানের প্রতি পিতামাতার অকৃত্রিম আচরণের প্রতি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ, মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এ কারণে সারা পৃথিবীর সমগ্র ধনরাশির বিনিময়েও পিতামাতা স্বয়ং সন্তানের সামান্যতম অমঙ্গল করতে পারে না। সন্তানের জন্য যাবতীয় বিপদ-আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো হিম্মত পিতামাতার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সন্তানকে নিরাপদ রাখার মতো মমতা পিতামাতার হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-যৌবন, সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশ কোরবানী দেয়ার মতো মানসিকতা পিতামাতাকে আল্লাহই দিয়েছেন। সন্তানের কান্না তীরের মতোই পিতামাতার কলিজায় বিদ্ধ হয়, কান্না শোনার সাথে সাথে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে পিতামাতা সন্তানের কাছে ছুটে আসেন, এ ব্যাবস্থাও আল্লাহই করেছেন।

সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য রৌদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, নিজের শারীরিক অসুস্থতা বা যে কোনো বিরূপ পরিবেশ উপেক্ষা করে অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে পরিশ্রম করার সাহস আল্লাহই পিতার হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন। পিতামাতাই প্রয়োজনে ক্ষুধার্ত থেকে সন্তানকে পেট ভরে খেতে দেন। রোগে আক্রান্ত সন্তানের মাথার কাছে পিতামাতাই নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করেন, পরম মমতায় বারবার সন্তানের শরীরে স্নেহমাখা হাত রাখেন। রোগে আক্রান্ত সন্তান মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলে পিতামাতাই অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়ে মহান আল্লাহকে বলতে থাকেন, 'হে আমার আল্লাহ! আমাকে নিয়ে যাও আর আমার নয়নের মণিকে ভিক্ষা দাও!' পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য এই যে, মায়া-মমতা কে সৃষ্টি করেছেন? ঐ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন– যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে প্রতিপালন করছেন। সুতরাং পিতামাতাকে আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানের প্রতিপালনের মাধ্যম করেছেন।

www.pathagar.com

এই জন্যই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে বার বার সচেতন করে দিয়েছেন। তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার ও অন্তর দিয়ে খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতেও পারে না। বিরক্তিকর কর্মকাণ্ড করতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা যখন ছোট ছিল, সে সময়ে কত ভাবেই না মা-বাপকে যন্ত্রণা দিয়েছে। চোখের সামনে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, কষ্ট করে মা-বাপ খাওয়াচ্ছেন সেই খাবার বমি করে দিয়েছে। মা-বাপ আবার কষ্ট স্বীকার করে খাওয়ায়েছেন। প্রসাব-পায়খানা করে মা-বাপের শরীর মাখিয়ে দিয়েছে। মা- বাপ বিরক্ত হননি।

ঠিক এই অবস্থা যখন বৃদ্ধ পিতামাতার হয়-তখন সন্তানও নিজের শিশুকালের কথা স্মরণ করে মা-বাপের খেদমত করবে। মা-বাপ যেমন মানুষকে দেখানোর জন্যে বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সন্তানের খেদমত করেনি, খেদমত করেছেন অন্তর দিয়ে গভীর মমতার সাথে। তেমনি সন্তানকেও মা-বাপের খেদমত করতে হবে পরম মমতা ভরে।

বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা এখানে-সেখানে থুথু বা কফ্, সর্দি ফেলতে পারেন। প্রসাব-পায়খানা করে দিতে পারেন। গভীর মমতায় সন্তানকে এসব পরিষ্কার করতে হবে। মা-বাপ বয়সের ভারে না বুঝে বিরক্তিকর কথাবার্তা বলতে পারেন, ক্ষতিকর কর্মকান্ড করতে পারেন, রুক্ষ মেজাজ দেখাতে পারেন, অকারণে অভিমান করতে পারেন। এসব ব্যাপারে সন্তান যদি চোখ বড় করে মা-বাপের দিকে তাকায়, বিরক্ত হয়ে উহ্ আহ্ শব্দ প্রকাশ করে তাহলে জান্নাতের বদলে জাহান্নামেই যেতে হবে।

কঠিন স্বরে, ধমকের ভাষায়, বাপ-মায়ের সামনে বেআদবের ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে কোনোক্রমেই কথা বলা যাবে না। বাপ-মায়ের সাথে কথা বলার সময় ভাষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কোনো শব্দও ব্যবহার করা যাবে না, যে শব্দ বাপ-মায়ের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ পিতামাতার দিকে দৃষ্টি দিয়েই সন্তানকে বারবার নিজের শিশুকাল, নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করতে হবে। তার প্রতি তারই বৃদ্ধ পিতামাতা কি অসীম ধৈর্যসহকারে দায়িত্ব পালন করেছেন– একথা স্মরণে রেখে পিতামাতার প্রতি যত্ন নিতে হবে।

পিতামাতার খেদমত করার সময় সন্তানকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পিতামাতার খেদমত করে পিতামাতার প্রতি কোনো দয়া, অনুগ্রহ করছে না, বরং সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছে। শুধু তাই নয়– মহান আল্লাহ পিতামাতার খেদমত করার সুযোগ দিয়ে তার প্রতিই অসীম অনুগ্রহ করেছেন। এই চেতনা প্রত্যেক সন্তানের মনে জাগ্রত রেখে মা-বাপের সেবা-যত্ন করতে হবে।

সন্তানকে মহান আল্লাহর দরবারে বারবার সিজদা দিতে হবে এজন্যে যে, ঐ আল্লাহ তাকে পিতামাতার খেদমত করার মতো এক মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার তওফিক দিচ্ছেন। এই মহান কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সবার ভাগ্যে হয়না। পরিবারের সকলের প্রয়োজন পূরণের

www.pathagar.com

পূর্বে পিতামাতার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে প্রথমে নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি।

পিতামাতার সেবা-যত্ন করার সময় পিতামাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানস পটে ভাসিয়ে তুলতে হবে সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সেই দিনগুলোর স্মৃতি, যখন সে ছিলো এক অসহায় শিশু। আজকের অথর্ব বৃদ্ধ পিতামাতা সেদিন ছিলেন তারই মতো এক প্রাণোচ্ছল তরুণ-যুবক। মা ছিলেন লাবণ্যময়ী এক যুবতী। মাথায় ছিলো ভ্রমর কৃষ্ণ কুন্তল রাশি।

কালের আবর্তনে সব হারিয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহর অমোঘ বিধানে সেই প্রাণোচ্ছল যুবক পিতা আর লাবণ্যময়ী যুবতী মাতা বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছে। মাথার চুলগুলোয় রূপালী শুভ্রতার নির্মম ছোঁয়া, দেহে লাবণ্যের স্থলে কুচকানো চামড়ায় নিষ্ঠুর বার্ধক্যের রেখা সুস্পষ্ট। তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি নেই, চোখ দুটো কোঠরাগত, ক্ষীণ দৃষ্টি, পা দুটোয় চলার শক্তি নেই, হাত দুটোও দুর্বলতার কারণে থির থির করে কাঁপে। এই পিতামাতার সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়েই সে আজ পূর্ণ এক যুবক। একদিন ছিলো সে অসহায় আর এই পিতামাতাই ছিলো তার একমাত্র মমতার আশ্রয়স্থল। এই পিতামাতাও তো এক দিন তার মতো ছিলো এবং তাকেও একদিন এমনই হতে হবে। সন্তানকে এসব কথা স্মরণ করতে হবে এবং গভীর মমতায় পিতামাতার সেবা-যত্ন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا-

আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আনকাবুত-৮)

সর্বপ্রথমে আল্লাহর হক কেনো আদায় করতে হবে

সূরা লুকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে সন্তান গর্ভে ধারণ, গর্ভকালীন কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা, প্রতিপালনের কষ্ট এবং নিজের দেহের রক্তে প্রস্তুত দুধ পান করানোর বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়ার পরেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ তাদের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্তানের ব্যাপারে কষ্টের বর্ণনা দেয়া হলো মায়ের, সুতরাং প্রথমে গর্ভধারিণী মায়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ না দিয়ে প্রথমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ কেনো দেয়া হলো?

এর কারণ হলো, মা ইচ্ছে করলেই সন্তান গর্ভে ধারণ, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গর্ভাধারে বয়ে বেড়ানো, প্রসব করা, দুধ পান করানো ও প্রতিপালন করতে পারতেন না। যে নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করে মাতৃত্ব অর্জন করলো, আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে সেই নারীকে বন্ধ্যা করতে পারতেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

www.pathagar.com

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ-يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ-اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ-اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا-وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا-

যমীন ও আকাশের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ– তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। (সূরা আশ্ শূরা-৪৯-৫০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির চির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কার্যকর করেছেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছাকাছি এলেই স্ত্রী গর্ভে সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকবে, বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'য়ালা এক জটিল ও অকল্পনীয় পদ্ধতির মাধ্যমে মাতৃগর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন। পুরুষের সহযোগিতা ব্যতীত স্ত্রী গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে না। পুরুষের দেহ অভ্যন্তরের নিম্ন অংশ থেকে নির্গত বিশেষ এক পদার্থ যে ক্যানালে জমা হয় এই ক্যানালকে এপিডিডাইমিস বলে। এরপর তা স্পারম্যাটিক কর্ডের মাধ্যমে ইউরেথ্রা-এর ওপর অংশে চলে যায় এবং সেমিন্যাল ভেসিকেল, প্রোসটেট এবং কুপারস গ্রন্থির নিঃসৃত রস স্পারমের সাথে যোগ দেয়। যে স্পার্ম থেকে সন্তান জন্ম নেবে, সেগুলোকে সিমেন নামক রস সতেজ-সুস্থ রাখে। পুরুষের দেহে আল্লাহ তা'য়ালা যদি এই সিমেন রস না দিতেন, তাহলে সেই পুরুষের সান্নিধ্যে এসেও নারীর পক্ষে গর্ভ ধারণ করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ এই পুরুষও হতো বন্ধ্যা পুরুষ– সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যেক মিলনে শত-সহস্র মিলিয়ন শুক্রবিন্দু বিশেষ সময়ে দুটো শুক্র স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে লেগে সন্তান উৎপাদন ক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছার পূর্বেই পথে অগণিত শুক্রকীট মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছানোর পথে এদের মৃত্যু না দিতেন, তাহলে নারীর গর্ভে একত্রে মিলিয়ন মিলিয়ন সন্তান জন্ম নিতো। অবস্থা যদি এই হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোনো নারী কি জীবিত থাকতো? সাবালিকা নারীর প্রত্যেক মাসে একটি মাত্র ডিম্বাণু পরিপক্কতা লাভ করে এবং কোনো নারীর সারা জীবনে চারশত ডিম্বাণুর অধিক পরিপক্কতা লাভ করে না। এসব ডিম্বাণু আল্লাহ তা'য়ালা যদি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম করে দিতেন, তাহলে নারীর পক্ষে গর্ভধারণ করা সম্ভব হতো না।

মাতৃগর্ভে কোন্ জটিল প্রক্রিয়ায় সন্তান পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ধারণ করে, তা আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের ১৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই জটিল প্রক্রিয়ার কোনো একটি স্তরে আল্লাহ তা'য়ালা যদি সামান্যতম পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতেন, তাহলে নারীর পক্ষে গর্ভধারণ করা সম্ভব হবে না। ভ্রূণ গর্ভাশয়ে আশ্রয় নেয়ার সময় গর্ভাশয়ের যে ওজন থাকে, তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গর্ভকালীন সময়ে ওজন মাত্রারিক্ত বৃদ্ধি পেলে তা ফেটে গিয়ে গর্ভের সন্তানের মৃত্যু ঘটতে পারে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যেসব জটিল পর্যায় অতিক্রম করে, সেখানে পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন এলে মা ও সন্তান উভয়েই মৃত্যুবরণ করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি মায়ের গর্ভাধার দুর্বল করে

www.pathagar.com

দিতেন, তাহলেও নারীর পক্ষে মাতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব হতো না। ভ্রূণ গর্ভে আশ্রয় নেয়া থেকে শুরু করে মানব সন্তান আকারে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করেন বিধায় নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান জন্ম দিতে পারে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশুর এমন অবস্থা থাকে যে, তার পক্ষে পৃথিবীর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে জন্মদাত্রী মায়ের বক্ষে এমন খাদ্য সন্তানের জন্য অনেক পূর্বেই মওজুদ করে রেখেছেন, সেই খাদ্য এবং এর পুষ্টিগত উপাদান পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সেই খাদ্য এমন গরম বা ঠান্ডা নয়, যা সন্তানের অসুবিধা ঘটাবে। অথবা এমন বিস্বাদ নয় যে, সন্তান খেয়ে তৃপ্তি পাবে না বা খাবে না।

অর্থাৎ মানব সন্তান পৃথিবীতে আসার ও প্রতিপালনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ভূমিকাই প্রধান, ঠিক এই কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানকে সূরা লূকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে আদেশ দিয়েছেন, সর্বপ্রথম মায়ের নয়– সর্বপ্রথমে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে শরীক করো না, তোমার ওপরে আমার যে হক বা অধিকার রয়েছে, এটা আদায় করো এবং সেই সাথে পিতামাতার অধিকার আদায় করো।

সূরা লূকমানের এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'দুই বছরে উপনীত হয়ে সে দুধ পান করা ছেড়েছে।' গবেষক ও পন্ডিতগণ আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার অর্থ করেছেন, মা তার শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবেন এবং এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো শিশু যদি সেই নারীর দুধ পান করে তাহলে সে শিশুর জন্যে ঐ নারী দুধ মা হয়ে যাবে, ঐ নারীর সন্তান-সন্তুতি দুধ পানকারী শিশুর দুধ ভাই-বোন হয়ে যাবে এবং তাদের সাথে তার বিয়েও হারাম হয়ে যাবে। দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে কেউ যদি ঐ নারীর দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যদি দুই বছর বা এর থেকে কম সময়েও শিশুকে মায়ের দুধ পান থেকে বিরত করা যায় বা শিশু পান না করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে সেই নারীর দুধ অন্য কোনো শিশু পান করলেও সে তার দুধ মা হবে না। শিশু মায়ের দুধও পান করে এবং অন্যান্য খাদ্যও গ্রহণ করে, এই অবস্থায় অন্য শিশু যদি সেই নারীর দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হয়ে যাবে।

শিশুকে পূর্ণ দুই বছরই দুধ পান করাতে হবে বিষয়টি এমন নয়। কোনো কারণ বশতঃ শিশু স্বয়ং দুই বছরের পূর্বেই দুধ পান ছেড়ে দিতে পারে। অথবা শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যগত কারণেও চিকিৎসকের নির্দেশে দুধ পান নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বন্ধ করা যেতে পারে। সন্তান কত দিন বা মাস পর্যন্ত গর্ভে থাকে– এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত হলো, ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ দিন। যেদিন ভ্রূণ মায়ের গর্ভাধারে প্রবেশ করে, সেদিন থেকে মোট ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ বা ৩০ দিনে মাস ধরা হলে ৯ মাস ১০ দিনে ভ্রূণ পূর্ণ মানব শিশুর আকৃতি ধারণ করে ভূমিষ্ঠ

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু সকল নারীর ক্ষেত্রে এই অভিমত প্রযোজ্য নয়। ভ্রূণের দুর্বলতার কারণে, মায়ের কোনো দুর্বলতার কারণে অথবা ভিন্ন কোনো কারণে ভ্রূণ পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকৃতি ধারণ করার পূর্বেও ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি-মজ্জা, মাথার চুল, দেহের পশম সৃষ্টি হয় না অথবা দৃষ্টিও মেলতে পারে না। হাসপাতালে এসব শিশুকে সাধারণত ব্রুডারে রেখে শিশুকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়।

অর্থাৎ মানব শিশু ৬ মাস থেকে শুরু করে ৯ মাস ১০ দিন বা ২৮০ দিনের পূর্বেও যে কোনো সময় ভূমিষ্ঠ হতে পারে। আধুনিক মেডিকেল সাইন্স একটি ভ্রূণ মায়ের গর্ভে পরিপূর্ণ মানব আকৃতি ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ধরেছে ২৮ সপ্তাহ বা ১৯৬ দিন যা সাড়ে ৬ মাসের কিছু বেশী। এ সময়ের মধ্যে পরিপুষ্ট শিশুও জন্মগ্রহণ করতে পারে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَحَمْلُه وَ فِصلُه ثَلثُوْنَ شَهْرًا–

তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে। (সূরা আল আহকাফ-১৫)

এ কারণেই নারী-পুরুষের বিয়ের দিন থেকে ৬ মাস পূর্ণ হবার পর স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে, সেই সন্তানের পিতা হিসেবে ঐ ব্যক্তিকেই সাব্যস্ত করা হবে, যে পুরুষের সাথে ঐ নারীর বিয়ে হয়েছিলো। ইসলামের সোনালী যুগে এ ধরনের একটি ঘটনার জন্ম হয়েছিলো। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও আহকামুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলের ঘটনা। একজন পুরুষ লোক জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করার ৬ মাস পূর্ণ হবার পর তার স্ত্রী পরিপূর্ণ দেহধারী একটি সুস্থ মানব শিশু প্রসব করে। পুরুষ লোকটি হযরত উসমানকে বিষয়টি জানায়। তিনি ঘটনা শুনে ধারণা করলেন, মেয়েটি বিয়ের পূর্বেই গর্ভধারণ করেছে, সুতরাং সে ব্যভিচারিণী এবং তাকে ব্যভিচারের শাস্তি পেতে হবে। সেভাবেই তিনি রায় ঘোষণা করলেন।

বিষয়টি হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম শোনার পরে খলীফার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি এটা কেমন ধরনের রায় ঘোষণা করলেন?

খলীফা জানালেন, বিয়ের মাত্র ৬ মাস পরেই ঐ নারী পরিপূর্ণ সুস্থ মানব শিশু প্রসব করেছে, এটা কি তার ব্যভিচারিণী হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ নয়? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানালেন–না, এটা ঐ নারীর ব্যভিচারিণী হওয়ার প্রমাণ নয়।

এরপর তিনি পবিত্র কোরআন থেকে সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াত, সূরা লূকমানের ১৪ নম্বর আয়াত ও সূরা আহ্কাফের ১৫ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, 'মহান আল্লাহর বলা এসব কথা থেকে জানা যায় যে, গর্ভধারণের সবথেকে কম সময় হলো ৬ মাস এবং বিয়ের পরে কোনো নারী ৬ মাস পূর্ণ হবার পর সন্তান প্রসব করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে নারীকে ব্যভিচারিণী বলা যাবে না এবং যে পুরুষের সাথে তার বিয়ে হয়েছে, সেই পুরুষই হবে উক্ত সন্তানের পিতা।'

www.pathagar.com

হযরত আলীর বক্তব্য শুনে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর রায় পরিবর্তন করে বলেছিলেন– বিষয়টি নিয়ে আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।

পক্ষান্তরে গর্ভে সন্তান রয়েছে, এ কথা জেনে বুঝে কেউ যদি কোনো নারীকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ৬ মাস পরে বা তার কম সময়ে অথবা বেশী সময় পর সন্তান প্রসব করে, তাহলে সে সন্তান অবশ্যই অবৈধ সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর বিষয়টি যদি কারো জানা না থাকে, তাহলে বিয়ের পরে ৬ মাস পূর্ণ হলে কোনো স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে তাহলে সে সন্তান ঐ ব্যক্তির পরিচয়েই পরিচিতি লাভ করবে, যার সাথে উক্ত নারীর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে, এ অবস্থায় অনেক নারীই সন্তান প্রসব করতে পারে আর এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটানো বা সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা জঘন্যতম অপরাধ। প্রকৃত সত্য না জেনে শুধু মাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কারো প্রতি কোনো অপবাদ আরোপ করা যাবে না।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হোক বা তার কম সময়েই হোক, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগী মা ব্যতীত আর কেউ অনুভব করতে পারে না। পিতামাতা নিজ সন্তানের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করে, এই কষ্টের মূল্য কোনো সন্তানই কখনো দিতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা সেই পিতামাতার হক আদায়ের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا–

আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেনো পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে। (সূরা আল আহ্কাফ-১৫)

হযরত আবু বকর বায্যার (রাহঃ) তাঁর মাসনাদে বায্যার-এ উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার সময় তাঁর বৃদ্ধা মা'কে নিজের কাঁধে উঠিয়ে তাওয়াফ করছিলো। তাঁকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তুমি কি তোমার মায়ের অধিকার বুঝিয়ে দিতে পেরেছো? ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের বিন্দুমাত্র অধিকারও আদায় করতে পারিনি। এমনকি আমার মায়ের যন্ত্রণা-কাতর নিশ্বাস গ্রহণের হকও আদায় করতে পারিনি। আমার মা আমাকে গর্ভে বহন করার সময় যে কষ্ট পেয়েছেন, প্রসবের সময় যে কষ্ট অনুভব করেছেন, আমি তার কণা মাত্রও আদায় করতে পারিনি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, ইয়েমেনের একজন লোক তাঁর মা'কে নিজের পিঠে বসিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। বিষয়টি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন। মা'কে নিজের পিঠে করে তাওয়াফকারী লোকটি ইবনে ওমরের কাছে জানতে চাইলেন– আচ্ছা বলুন তো, আমি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, মায়ের হক আদায়! তুমি যখন গর্ভে ছিলে, সে সময় তোমার মা যন্ত্রণা কাতর যে আহ্ শব্দ করেছে, সেই একটি শব্দের হকও আদায় করতে পারোনি।

www.pathagar.com

গর্ভধারিণী মাতার অধিকার

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না, এ জন্যই ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। কারণ সন্তানের জন্যে মা যে কষ্ট স্বীকার করে-এমন কষ্টের কোটি ভাগের এক ভাগও পিতাকে সহ্য করতে হয় না।

সন্তান পেটে ধারণ করা, বয়ে বেড়ানো এবং প্রসব করা যে কি কষ্টের ব্যাপার সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মায়ের এসমস্ত কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম বোধহয় পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে পিতামাতা সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়– সন্তানের জন্য মা যে ত্যাগ-তীতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করে এ কষ্টের বিনিময় দেয়া সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো-হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। নবীজী বললেন, তোমার মা যখন তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, অব্যাহতভাবে যন্ত্রণা সহ্য করেছে, তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি তাঁর মেজাজ খুবই কঠোর।

আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমারই জন্য সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো, সে সময়তো তার কঠিন মেজাজ ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি আমার মায়ের সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়েছি।

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিতে পেরেছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ্ব করিয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছে?

প্রসব যন্ত্রণা যে কি ধরণের যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী মা ব্যতীত আর কেউ বলতে পারবে না। যন্ত্রণার এক একটি আঘাত যখন আসে মা তখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যান। মা! একটি মাত্র শব্দ অথচ সারা পৃথিবীর সবটুকু মধু যেনো এই শব্দটির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন। মা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার সময় মৃত্যুকে কবুল করলেন। এরপর যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকের মতো মা রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। সেই মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে বেশী তো হবেই।

মা তার নিজের শরীরের রক্ত পানি করেন সন্তানের জন্য। সেই সন্তানের তো প্রথম দায়িত্ব মায়ের প্রয়োজন পূরণ করা। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনকালে খেজুরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। একদিন অনেকে দেখলো যে হযরত উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খেজুরের গাছ কেটে মাথি বের করছেন।

www.pathagar.com

এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ অভাবের বাজারে আপনি এভাবে খেজুরের গাছটি নষ্ট করছেন। বর্তমানে খেজুরের গাছ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি বলবো। আমার মা খেজুরের মাথি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মায়ের ইচ্ছা কি কখনো অবজ্ঞা করা যায়?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صُحْبَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ-وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبُوْكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার খেদমত ও সদ্ব্যবহার পাবার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি কে? আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। তারপর তোমার পিতা, তারপর যথাক্রমে তোমার নিকটতম আত্মীয়।

মা সন্তান পেটে ধারণ করেন, অকল্পনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এর কোনোটিই পিতার পক্ষে সম্ভব নয়-বিধায় ইসলাম পিতার তুলনায় মাতার অধিকার তিন গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

عن معاوية ابن جاهمة رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ قَدْ جِئْتَ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. (نسائى)

হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাবার সংকল্প করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললেন, জি হ্যাঁ আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নিকট তোমার জান্নাত। (নাসায়ী)

হযরত জাহিমার পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ

ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। নবীজী তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নীচেই তোমার জান্নাত। (নাছায়ী)

মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মা জীবিত না থাকলে খালার খেদমত করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتَ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اَمٌ قَالَ لاَ قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا. (ترمذى)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন মানুষ নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গোনাহ করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তওবার পথ কি খোলা আছে? নবীজী বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বললো, আমার মা জীবিত নেই। আল্লাহর রাসূল বললেন, আচ্ছা তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো-জ্বী, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো। (তিরমিযী)

পৃথিবীতে এমন কোনো আমল নেই, যে আমল করলে অত্যন্ত দ্রুত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কিন্তু মা! একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি একস্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অপর এক ব্যক্তি তার কাছে পয়গাম প্রেরণ করলে সে তা গ্রহণ করে। এটা মর্যাদা হানিকর ব্যাপার মনে করে এবং আবেগ তাড়িত হয়ে আমি সেই মেয়েকে হত্যা করি। আপনি বলুন, এখনো কি আমার জন্য তওবার কোনো পথ আছে? তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তোমার মা কি জীবিত আছেন! সে বললো, মা তো ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন– যাও, খালেস অন্তরে তওবা করো এবং এমন কাজ করো যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো।

হযরত যায়েদ বিন আসলাম হযরত আবদুল্লাহর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই ব্যক্তির কাছে তার মা জীবিত আছে কি না এ কথা কেন জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণের চেয়ে বড় আমল আমার জানা নেই।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন (রাহঃ)-কে ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মা ছিলেন হিজাজের অধিবাসী। তিনি মায়ের সম্মান-মর্যাদা ও ইচ্ছার প্রতি অত্যন্ত সজাগ

www.pathagar.com

ছিলেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনতেন তখন কাপড়টি নরম কিনা ভালো করে দেখতেন। কাপড় শক্ত হলে মা যদি কষ্ট পায় এই ভয়ে তিনি শঙ্কিত থাকতেন। ঈদের সময় নিজের হাতে মায়ের কাপড় রং করতেন। মায়ের প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের সামনে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেনো কোনো গোপন কথা বলছেন।

মায়ের নেক দোয়া ও অসন্তুষ্টি

মায়ের দোয়ার বরকতে মানুষের সম্মান-মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে বৃদ্ধি করে দেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ) বয়সে তখন কিশোর। মায়ের পাশেই বিছানায় শুয়ে আছেন। আধো ঘুমের মধ্যেই মা অস্ফুটে বললেন, বাবা বায়েজীদ, আমি পানি পান করবো! কিশোর বালক বায়েজীদের কানে মায়ের কথা পৌঁছা মাত্র শয্যা ছেড়ে উঠে পানির পাত্রের কাছে গেলেন। পাত্রে পানি নেই-শূন্য পাত্র। বালক বায়েজীদ মা'কে সে কথা না জানিয়ে পাত্র হাতে বেরিয়ে পড়লেন পানির সন্ধানে।

গভীর রাত, চারদিকে সুনসান নরীবতা। সবাই গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। পথে জনমানবের চিহ্ন নেই। চারদিকেই রাতের নিকষ কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার থমথম করছে। বালক বায়েজীদ অন্ধকার ভেদ করে মায়ের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে চলেছেন। রাতের অন্ধকার বায়েজীদের মনে একাকীত্বের কোনো ভয় জাগাতে পারেনি। কারণ তার মনে একটিই চিন্তা, মায়ের তৃষ্ণা মিটাতে হবে। পাত্রে পানি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন মায়ের শয্যাপাশে। মা পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বালক বায়েজীদ মায়ের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে শয্যা পাশে পানির পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। মায়ের যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন মা পানি পান করবে। মাকে ডেকে তার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন না কিশোর সন্তান বায়েজীদ।

এভাবে রাত শেষের দিকে পৌঁছে গেলো। কিশোর সন্তান না ঘুমিয়ে পানির পাত্র হাতে মায়ের শয্যা পাশে ঘুমন্ত মায়ের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন-কখন মায়ের ঘুম ভাঙ্গবে আর তিনি পানি পান করবেন। পূর্বাকাশে পূর্বাশার ইশারা দেখা দিলো। ফজরের আজান কানে যেতেই মায়ের ঘুম ভাঙ্গলো। মা নামায আদায়ের জন্য উঠলেন। চোখ পড়লো সন্তানের প্রতি। তার কলিজার টুকরা পানির পাত্র হাতে তারই শয্যা পাশে ঘুমহীন চোখে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের মনে পড়লো, রাতের প্রথম প্রহরে তিনি পানি পান করতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। আর তার কলিজার টুকরা তারই তৃষ্ণা মিটানোর জন্য পানির পাত্র হাতে সারা রাত না ঘুমিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে! মায়ের অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। ফজরের নামায আদায় করে মা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আমার আল্লাহ! আমার বায়েজীদকে তুমি সুলতানুল আরেফীন বানিয়ে দিও!

মা দোয়া করলেন তার সন্তান যেনো আওলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আওলিয়া হয়। ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া কবুল করে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)-কে সুলতানুল আরেফীন বানিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী

www.pathagar.com

(রাহঃ)-এর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মায়ের নেক দোয়ার বরকতে তিনি পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। মায়ের দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ) কে নিজের প্রিয় পাত্রে পরিণত করেছেন।

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। একজন নবীজীকে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন যুবক মৃত্যুপথযাত্রী। অনেকে ঐ যুবককে কালেমা শাহাদাত পড়ার কথা বলছে। কিন্তু যুবকের মুখ দিয়ে কালেমা বের হচ্ছে না। নবীজী উপস্থিত লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, ঐ যুবক কি নামায আদায় করতো? উপস্থিত লোকজন জানালো, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যুবক নামায আদায় করতো।

এ কথা জানার পরে আল্লাহর নবী কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঐ যুবকের কাছে গেলেন। যুবকের তখন মুমূর্ষ অবস্থা। নবীজী তাকে কালেমা পড়তে বললেন। বেশ কষ্টের সাথে যুবক জানালো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুখে কালেমা আসছে না, আমি পারছি না।

আল্লাহর রাসূল এর কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, এই যুবক তার মায়ের সাথে নাফরমানী করতো। তিনি লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, এই যুবকের মা কি জীবিত আছে? লোকজন জানালো, তার মা এখন পর্যন্ত জীবিত আছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের মা'কে নিয়ে আসার আদেশ দিলে লোকজন তার মা'কে নিয়ে এলো। তিনি উক্ত যুবকের মা'কে প্রশ্ন করলেন, এই যুবক কি তোমার সন্তান? বৃদ্ধা সম্মতি জানালে তিনি তাকে বললেন, ভয়ঙ্কর আগুনের কুণ্ড বানিয়ে সে আগুনের মধ্যে তোমার সন্তানকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি সুপারিশ করলেই তোমার সন্তান রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তুমি কি সন্তানের জন্য সুপারিশ করবে?

বৃদ্ধা জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমি আমার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ করবো। আল্লাহর নবী বৃদ্ধাকে বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহকে এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তোমার সন্তানকে ক্ষমা করে দিয়েছো। তুমি তোমার সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট।

বৃদ্ধা বললো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো আমি তোমার রাসূলের উপস্থিতিতে বলছি, আমি আমার সন্তানকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি আমার সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট।

এরপর নবীজী যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন– পড়ো, আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। মৃত্যু পথযাত্রী যুবক নবীজীর সাথে সাথে কালেমা পাঠ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি এই যুবককে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে হেফাজত করেছেন। (আহমাদ-তিবরানী)

www.pathagar.com

পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যার সাথে সম্পর্ক রাখলে মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পায়, উপার্জনে বরকত হয়, মানুষ ধনী হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবলমাত্র পিতামাতা। হযরত আনাছ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের দীর্ঘ হায়াত এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

একজন মুসলমান যতো বেশী হায়াত লাভ করে, সে ততবেশী সওয়াব অর্জনের সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন তার পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে। হযরত মুয়াজ বিন আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।

পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা, মনমাতানো ব্যবহার করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর এই প্রিয় কাজটি মহান আল্লাহর যে বান্দাহ্ করে, তার ওপরে আল্লাহ কতই না খুশী হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, যে নামায সময় মতো আদায় করা হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, পিতামাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

পিতামাতাও মানুষ, তারাও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন। তাদের কোনো ভুলের কারণে সন্তান তাদের সাথে অশোভন আচরণ করবে, এই অধিকার সন্তানের নেই। পিতামাতার প্রতি সন্তানকে যে দায়িত্ব পালন করতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন সন্তানকে পূরণ করতে হবে। তারা যদি সন্তানের কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আন্তরিক পরিবেশে তাদের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَه بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَصْبَحَ عَاصِيًا لِلّٰهِ فِى وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَه بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ . (شعب الايمان)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ এবং

www.pathagar.com

হিদায়াত মানা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হিদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি পিতামাতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। (শুআ'বুল ঈমান)

বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও গোনাহ্ মাফের আশায় মাজারে ধর্ণা দেয়, পীরের দরবারে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেয়। পীর সাহেবের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা উপার্জন করেছে, সেই টাকা তথাকথিত পীরের পায়ে ঢেলে দেয়। হতভাগা আর কাকে বলে! পৃথিবীর যত বড় আলিম হোক, পীর হোক, তাদের খেদমত করলে জান্নাত লাভ করা যাবে, গোনাহ মাফ হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনি। এমন দাবীও যদি কেউ করে তাহলে সে নিশ্চয়ই বড় শয়তান। আর মা-বাপের খেদমত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে- এ নিশ্চয়তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ . (شعب الايمان)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার বাধ্য এবং অনুগত সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য একটি সহীহ কবুল হজ্জ লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন যদি সে প্রতিদিন ১০০ বার দৃষ্টিপাত করে? আল্লাহর রাসূল বললেন- হাঁ, আল্লাহ তা'য়ালা মহান ও মহাপবিত্র।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ .

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের প্রতি পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন, তারাই তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। (মুসলিম)

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ . (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, (তিনবার বললেন)। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে এরপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না। (মুসলিম)

হযরত তাইলাহ বিন মিয়াছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি গোনাহ্ করি, যা আমার দৃষ্টিতে কবিরা গোনাহ্ ছিলো। আমি অত্যন্ত অস্থির হলাম এবং সুযোগ বুঝে তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বলতো কি হয়েছে? যা ঘটেছে আমি তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তো কবিরা গোনাহ্ নয়। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা রাখো? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ আমি তা-ই চাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মাতার সাথে নরম ও সম্মানের সাথে কথা বলো, তাঁর প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

সুতরাং পীরের দরবারে বা মৃত মানুষের কবর-মাজারে অর্থ বিলিয়ে ক্ষতি ব্যতীত লাভ হবে না, নিজের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা পিতামাতার সেবা-যত্নে ব্যয় করতে হবে। প্রাণভরে পিতামাতার খেদমত করতে হবে। এর মধ্যেই সন্তানের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। পিতামাতার খেদমত করার কারণে পথের ফকির হয়েও সৎ পথে প্রভূত অর্থ বিত্ত, বাড়ী গাড়ীর অধিকারী হয়েছেন এমন ঘটনার অভাব নেই। অন্য কারো দোয়া কবুল হবে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুরীদের জন্য পীর সাহেব দোয়া করলেন। তার সে দোয়া যে কবুল হবেই-এমন নিশ্চয়তা কোনো পীর সাহেবই দিতে পারেন না। কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবেই হবে, এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহর নবী। পৃথিবীতে এমন পীর বা আলেম ছিলেন না এখনো নেই, কিয়ামত পর্যন্তও আসবেন না, যার দিকে একবার মমতাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু পিতামাতা সম্পর্কে নবীজী ঘোষণা করেছেন, যে সুসন্তানই পিতামাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ

www.pathagar.com

তাকে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দান করেন। পিতামাতার সেবা যত্ন করা, তাদের প্রাণভরে খেদমত করা জিহাদ এবং হিজরাতের মতো অধিক সওয়াবের কাজের চেয়েও বেশী সওয়াবের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাই। নবীজী বললেন, তাহলে পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেন, পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

একজন মানুষ প্রাণের তাগিদে মাইলের পর মাইল দূরত্ব অত্যন্ত কষ্টের সাথে পাড়ি দিয়ে এসেছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। মনে আশা ছিল প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে থাকবেন, প্রাণভরে ঐ চেহারা দেখবেন, যে চেহারা ঈমানের সাথে একবার দেখলে আল্লাহ খুশী হয়ে যান। মনে বড় আশা, রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। কিন্তু নবীজী তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এসবের চেয়ে পিতামাতার খেদমত করলে আল্লাহ বেশী খুশি হবেন। ইয়েমেন থেকে একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, আমার পিতামাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের কাছ থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নতুবা তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে সুন্দর আরচণ করতে থাকো। (আবু দাউদ)

পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে তাদের বন্ধুদের সম্মান-মর্যাদাও আল্লাহ তা'য়ালা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّيَ . (مسلم)

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতার অনুপস্থিতির সময় অথবা পিতার মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়জন বা বন্ধুদের প্রতি সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার। (মুসলিম)

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ . (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতার প্রতি গালি দান বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকজন (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ কি নিজের পিতামাতাকে গালিও দেয়? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ! মানুষ অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়। তাহলে (ফিরে) তার পিতামাতাকে গালি দিয়ে দেয়। সে অন্যের মা'কে খারাপ নামে স্মরণ করে। তাহলে সে তার মা'কে গাল-মন্দ করে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

অন্য কারো পিতামাতা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য বা তাদের নামের পূর্বে কোনো খারাপ বিশেষণ ব্যবহার করা কোনো ক্রমেই জায়েজ নয়-এটা স্পষ্ট হারাম। সন্তানের কারণে পিতামাতাকে যদি অপদস্ত হতে হয়, অপমানিত হতে হয় এবং তাহলে সে জন্যে দায়ী হবে সন্তান। মহান আল্লাহর দরবারেও ঐ সন্তান অবশ্যই পাকড়াও হবে।

একবার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'জন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কে হন? সে বললো, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোনো মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না।'

সুতরাং পিতামাতার খেদমত করার গুরুত্ব কতটুকু তা এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো। শ্বশুর-শাশুরী বা স্ত্রীর কথায় যে সন্তান নিজের পিতামাতাকে কষ্ট দেবে, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তা'য়ালা এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

www.pathagar.com

সন্তানের অর্থ-সম্পদ ও পিতামাতা

এই পৃথিবীতে মানুষ নানা পথে ধন-সম্পদ উপার্জন করে নিজের পরিবার-পরিজন বিশেষ করে সন্তান-সন্ততির সুখের আশায় এবং তারা কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ সন্তানের সুখ-শান্তি, আরাম আয়েশ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় করে থাকেন। এরপর সন্তান পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই পিতামাতার জন্য ব্যয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-قُلْ مَاأَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

হে রাসূল! লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা করবে পিতামাতার জন্য নিকটাত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্য। (সূরা বাকারা-২১৫)

এই পৃথিবীতে সন্তান আগমনের একমাত্র মাধ্যম হলো পিতামাতা এবং তারাই অসীম ত্যাগ তীতিক্ষা ও কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। এই সন্তান যখন উপার্জনশীল হয় এবং তারা যে অর্থ-সম্পদের মালিক হন, এর মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার হলো সন্তানের পিতামাতার। তাদের হক আদায় করে তারপর সন্তান অন্যত্র অর্থ ব্যয় করবে। সন্তানের অর্থ-সম্পদে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيْئًا-

সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার করো। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অর্থ-সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। এই অবস্থায় আমার পিতা এসে আমার কাছে অর্থ-সম্পদ দাবী করছে। এ সম্পর্কে আপনি মতামত দিন। আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন– তুমি এবং তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ এ সব কিছুর অধিকারী তোমার পিতা। (ইবনে মাজাহ্‌)

এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গবেষক ও চিন্তাবিদগণ বলেছেন, পিতা তার সন্তানের অর্থ সম্পদের অংশীদার এবং সন্তান অনুমতি দিক আর না-ই দিক, পিতা তার সন্তানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। সন্তানের সম্পদ পিতা নিজের সম্পদের মতোই ব্যবহার করতে পারে। তবে ক্ষতিকর পথে কোনো অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না এবং অপব্যয়ও করতে পারবে না। সন্তান অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাবে, আর তারই পিতামাতা অর্থ কষ্টে থাকবেন-ইসলাম এ অধিকার সন্তানকে দেয়নি। সন্তানের সম্পদের প্রথম অধিকারী হলো তার পিতামাতা।

www.pathagar.com

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, ইচ্ছা হলেই তিনি আমার সম্পদ নিয়ে নেন। আল্লাহর রাসূল সেই ব্যক্তির পিতাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। এরপর লাঠির ওপর ভর দিয়ে এক অথর্ব-দুর্বল বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলো। তিনি বৃদ্ধকে তার সন্তানের অভিযোগ জানালেন।

বৃদ্ধ করুণ কণ্ঠে বলতে থাকলো– হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার সন্তান অসহায় আর দুর্বল ছিলো। তখন আমি ছিলাম শক্তিশালী। প্রচুর অর্থ-বিত্তও আমার ছিলো। আমার সন্তান ছিলো কপর্দকশূন্য। সে ইচ্ছে অনুসারে আমার অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করেছে, আমি কখনো বাধা দিইনি। আজ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার দেহে উপার্জন করার শক্তি নেই। আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি আর আমার সন্তান সুঠাম দেহের অধিকারী এবং শক্তিমান। সে আজ সম্পদশালী আর আমি কপর্দকশূন্য। সে তার অর্থ-সম্পদ আমাকে দেয় না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধের কথা শুনছেন, তাঁর পবিত্র চোখ থেকে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি অভিযোগকারী সন্তানকে আদেশ দিয়ে বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিতা প্রচুর অর্থ-সম্পদ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার জীবিতকালেও তাদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিলেন। পিতার ইন্তেকালের পরে অন্যান্য হকদাররা নিজেদের অংশের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তিনি নিজের অংশ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না উঠিয়ে অন্যান্য অংশীদারকে জানিয়ে দিলেন, পিতা কোনো ঋণ রেখে গিয়েছেন কিনা এটা সর্বপ্রথম দেখতে হবে। যদি তিনি ঋণ রেখে যান তাহলে তার ঋণ পরিশোধের পরেই পিতার রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ বন্টন হবে। তিনি ঋণী আছেন কিনা তা জানার জন্য প্রত্যেক হজ্জ মৌসুমে হজ্জে আগত লোকদের সম্মুখে ঘোষণা দিবেন।

এভাবে তিনি পরপর চার বছর হজ্জ মৌসুমে লোকদের সম্মুখে নিজের পিতার ঋণের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ঋণের ব্যাপারে কিছু জানা না গেলেও নগদ লাভ যেটা হলো, তাহলো হজ্জে আগত লোকজন তাঁর পিতার ইন্তেকাল সংবাদ শুনে মাগফিরাতের দোয়া করলো। এভাবে করে তিনি নিজের পিতার মাগফিরাতের দোয়া আল্লাহর ঘরে আগত মেহমানদের মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। পিতামাতা কোথাও কোন ঋণ করে গেছেন কিনা-সন্তানদেরকে এব্যাপারে অবশ্যই পিতামাতার ঘনিষ্ট মহলে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোথাও কোন ঋণ থাকলে তা তারা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

www.pathagar.com

পিতামাতার অবাধ্যতা ঘৃণ্য অপরাধ

হযরত আবু বাকারাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি বড় এবং জঘন্যতম গোনাহ সম্পর্কে কেনো সর্তক করবো না? উপস্থিত আমরা সকলেই বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কেনো নয়, অবশ্যই আপনি তা করবেন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা এবং পিতামাতার হক আদায় না করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, খুব ভালো করে শুনে নাও, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা। তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকলেন। আমরা বলতে থাকলাম, আহা! তিনি যদি নীরব হয়ে যেতেন। (বোখারী)

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُاللّٰه تَعَالٰى مِنْهَا مَاشَاءَ الاَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَانَّه يُعَجِّلُ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ- (شعب الايمان)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা শিরক ছাড়া অন্য যাবতীয় গোনাহ্ যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি তাকে মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন, অথবা পিতামাতার জীবদ্দশাতেই তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। (শুয়াবুল ঈমান)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনবাসীদের জন্য হযরত আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাধ্যমে একটি স্মরণীয়পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সেই পত্রে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে- দেখ, আখিরাতের দিন মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে বড় গোনাহ্ হবে (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) অন্যায়ভাবে মু'মিনকে হত্যা করা, (৩) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে পালিয়ে আসা, (৪) পিতামাতার হক আদায় না করা, (৫) সতী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, (৬) জাদু-মন্ত্র শেখা, (৭) সুদ খাওয়া এবং (৮) ইয়াতিমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা।

হযরত মায়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছেন, আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়েও দেয়া হয় এবং কখনো পিতামাতার নাফরমানী করবে না। যদি তারা নিজের সম্পদ এবং পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয় তবুও।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, পিতামাতাকে কাঁদানোর অর্থ হলো তাদের নাফরমানী করা এবং এই আচরণ মারাত্মক গোনাহের কাজ।

www.pathagar.com

হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তিনটি গোনাহ্ এমন যে, তার সাথে কোনো নেকী কাজ দেয় না। (অর্থাৎ সমস্ত নেকী ধ্বংস করে দেয়) প্রথম শিরক, দ্বিতীয় পিতামাতার অবাধ্যতা এবং জিহাদ থেকে পালিয়ে আসা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করি, রামাযানের রোযা পালন করি। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বললেন, যে এ কথা বলে শেষ করলো সে আখিরাতের ময়দানে নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথী হবে (তিনি দু'আঙ্গুল উঠালেন), শর্ত হলো সে যেন পিতামাতার অবাধ্য বা নাফরমান না হয়।

মৃত পিতামাতার অধিকার

সন্তান পিতামাতার হক আদায় করবে এবং হৃদয়-মন ঢেলে দিয়ে তাদের সেবা-যত্ন করবে। সেবা-যত্নের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলো কিনা, এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করবে। কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পড়লে তা দূর করার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে সন্তান দোয়া করবে, আল্লাহ এবং তার রাসূল যেভাবে পিতামাতার হক আদায় করতে বলেছেন, সেভাবে সে যেন হক আদায় করতে পারে। পৃথিবী থেকে যখন পিতামাতা বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখনও সন্তান পিতামাতা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না। সন্তান প্রত্যেক নামাযের শেষে অশ্রুধারায় নিজেকে সিক্ত করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এভাবে দোয়া করতে থাকবে–

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيْرًا–

হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (বনী ইসরাঈল-২৪)

হযরত আবু উসাউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো-হে আল্লাহর রাসূল! পিতামাতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবীজী বললেন, হ্যাঁ। তুমি মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার করবে, তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পুরণ করবে, পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের সম্মান-মর্যাদা দেবে, তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে ও সুন্দর আচরণ করবে, যারা পিতামাতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন। (আ-আদুবুল মাফরুজ)

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে– এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রাহ আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন- যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বস্তু এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন (রাহঃ) বলেছেন, একরাতে আমরা হযরত আবু হুরায়রার খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে ক্ষমা করো, আমার মা'কে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আমার ও আমার আম্মার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন বলেন, আমরা আবু হুরায়রাহ্ এবং তাঁর মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরায়রার দোয়ায় সামিল থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকা করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? আল্লাহর নবী বললেন, অবশ্যই উপকারে আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? নবীজী বললেন, কেনো নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। সে সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক গ্রামবাসীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গ্রামের লোকটি হযরত ইবনে ওমরকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন-জ্বী হ্যাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের বাহনের উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে ইবনে উমরকে বললাম- সে তো একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু' দেরহাম দিয়ে দিতেন সেটাই তাকে সন্তুষ্ট

www.pathagar.com

করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, ভাই তাঁর পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং নবীজী বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো এবং এই সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। যদি করো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি যখন মদিনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ! তোমার কাছে কেনো এসেছি তা কি তুমি জানো? আবু বুরদাহ বললেন, আমি তো তা জানি না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা হযরত ওমর এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন পিতামাতার নাফরমানী করে এবং তার পিতামাতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে পিতামাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।

হযরত আবু উসাইদ সা'ঈদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম, এমন সময় সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত আমার পক্ষে করণীয় কিছু আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের অসীয়ত পালন করা ও তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করতে থাকা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতার অবাধ্য থাকা অবস্থায় যদি কারও পিতামাতার মৃত্যু ঘটে এবং সেই ব্যক্তি সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে পিতামাতার বাধ্য অনুগত সন্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। (শুআ'বুল ঈমান)

পিতামাতা জীবিত থাকতে যেসব সন্তান তাদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাদের হক আদায় করেনি, তাদের সাথে নাফরমানী করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। পিতামাতার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্যানুযায়ী পিতামাতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান-সাদকা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

www.pathagar.com

তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সদকা করি তাহলে আমার মরহুম পিতা কি উপকৃত হবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার একটি বাগান আছে। আমি উক্ত বাগান আমার পিতামাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে সাদকা করে দিলাম।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মৃত পিতামাতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানালেন, তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁরা যে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তা আদায় করো এবং পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত-ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলো।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে, মৃত ব্যক্তিও সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে। তারা কবরে তথা আলমে বারযাখে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কেউ তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করে কিনা। যখন কেউ কিছু তাদের জন্য পাঠায়, তখন তারা এমন খুশী হয় যে, গোটা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও যদি তাদের হস্তগত হতো, তবুও তারা এত খুশী হতো না।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনায় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া, রাস্তা-পথ, পানির ব্যবস্থা করা, কোরআন, কোরআনের তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য কোথাও দান করা, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া উচিত। এসব থেকে যতদিন মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি কবরে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এ ছাড়া নফল নামায-রোজা, হজ্জ, কোরবানী, দান-সদকা, কোরআন তিলাওয়াত করে এর সওয়াব রিসানী করা উচিত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই করা উচিত। কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে ভাড়া করে এনে কোরআন খতম দেয়া উচিত নয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য নিজেই আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

ইসলাম বিরোধী পিতামাতার অধিকার

সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চিরন্তন। একদল মানুষ ধন-সম্পদ ও প্রাণ কোরবানী দিয়ে হলেও মহাসত্য ইসলামী জীবনাদর্শের গর্বিত পতাকা উড্ডিন রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আরেকদল মানুষ মহাসত্যের এ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরাম। একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা মহাসত্য অনুধাবন না করার কারণে অথবা পিতৃ-পুরুষের নিয়ম, প্রথা ও আদর্শ আঁকড়ে থাকার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ইসলামী আদর্শ নিজেরাও গ্রহণ করেনি, অন্যকেও গ্রহণ করার পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে বিরোধিতা করে আসছে। ইতিহাসে দেখা যায়, পিতামাতা ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করেছে কিন্তু সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করেনি। আবার সন্তান-সন্ততি মহাসত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, পিতামাত সাড়া দেননি।

www.pathagar.com

ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, পিতামাতা ইসলামী আদর্শ নিজেরা অনুসরণ করেন এবং এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন। অপরদিকে সেই পিতামাতার সন্তানই ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে চেষ্টা করছে তথাকথিত পশ্চিমা ভোগবাদী গণতন্ত্র বা পূজিবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আবার হয়ত সন্তান সংগ্রাম করছে-আন্দোলন করছে পৃথিবীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোর জন্য বা পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী মতবাদ হিসেবে কায়েম করার জন্য। কিন্তু পিতামাতা এর বিপরীত পথেই অগ্রসর হচ্ছেন।

সন্তান অথবা তাদের পিতামাতা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবীও করেন, হয়ত নামায-রোযা ও হজ্জও আদায় করেন কিন্তু তারা ইসলামী আন্দোলন পছন্দ করেন না। ইসলামের বিপরীত আদর্শে পরিচালিত অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো দলকে পছন্দ করেন। তাহলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যে সন্তান, সে সন্তান এই ধরনের পিতামাতার সাথে কেমন আচরণ করবে। অথবা সন্তান ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়েছে, পিতামাতা অসুমলিমই রয়ে গেছে, এ অবস্থায় পিতামাতার সাথেই বা মুসলিম সন্তান কেমন আচরণ করবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে করে মুসলিম নামে পরিচিত পরিবারেও এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সারা পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের বিপরতী মতবাদ-মতাদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নিয়ম-প্রথাই মানুষের ওপরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। মুসলিম বিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয় এবং মুসলিম দেশসমূহেও সরকারী পর্যায়ে ইসলামী আদর্শের মূলভাবধারা মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে যে স্বভাব-প্রকৃতির মুসলমান গড়ে ছিলেন, সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোথাও বাস্তবায়ন নেই। ফলে ইসলামের নামে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ স্বভাব-প্রকৃতির মুসলিম বের হচ্ছে না, যেমনটি গড়ে ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই কারণেই মুসলিম পরিবারের পিতামাতা হয়ত নিজের উদ্যেগে অথবা কোরআনের অনুসারী প্রকৃত ইসলামী সংগঠনের স্পর্শে এসে কোরআন বুঝার চেষ্টা করে নিজেকে সেই কোরআনের বিধান অনুসারে গড়ার চেষ্টা করছেন এবং কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান বা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শে প্রভাবিত সন্তান পিতামাতার এই উদ্যোগ মেনে নিতে পারছে না। আবার বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীতও হচ্ছে। সন্তান এ ধরনের কোনো সংগঠনের স্পর্শে এসে বা ইসলামী কোনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নিজের উদ্যেগে কোরআন বুঝার চেষ্টা করছে, ইসলামী বিধান পালন করার চেষ্টা করছে এবং সমাজ ও দেশে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছে। পিতামাতা এই সন্তানের কার্যক্রমের সাথে বিরোধিতা করে যাচ্ছে। এই অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত সন্তান ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী পিতামাতার সাথে কেমন ব্যবহার করবে।

www.pathagar.com

এই সমস্যা পৃথিবীতে নতুন নয়। অধিকাংশ নবী-রাসূলকে নিজেদের পরিবারে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের পরিবারের সদস্যরা ইসলামী আদর্শ মেনে নিতে পারেনি। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের পরিবারের কোনো কোনো সদস্যও আল্লাহর দ্বীন কবুল করেনি। ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী তাঁর সন্তান যখন মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছিলো, তখন তিনি সেই সন্তানকে নৌকায় আরোহণ করে আত্মরক্ষার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেননি এবং কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ-وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ-قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ-اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ-فَلاَ تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ-اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ-وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ-

নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললো, হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার অঙ্গিকারও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক। জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক। সুতরাং তুমি সেই ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসিহত করি, নিজেকে জাহিলদের মত বানিও না। নূহ সাথে সাথে আবেদন করলো, হে আমার রব! যে বিষয় আমার জানা নেই, সেই বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, ৪৫-৪৭)

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও নিজের পিতাকে মহাসত্য গ্রণ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاۤءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا-يٰاَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ-اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا-يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا-قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ-لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا-

আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করবো। আব্বাজান!

www.pathagar.com

আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার শংকা হচ্ছে যে, আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন, আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন। পিতা বললো, ইবরাহীম! তুই কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ হয়ে গেছিস? তুই যদি বিরত না হস, তাহলে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। তুই চিরদিনের জন্য আমার কাছে থেকে দূরে সরে যা। (সূরা মরিয়ম-৪৩-৪৬)

সুতরাং সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব শুধু বর্তমানের নয়– সুদূর অতীতের এবং আগামী দিনেরও। পিতামাতা যদি অমুসলিম বা ইসলামী আদর্শের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী হন, অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী হন তবুও তাদের হক আদায় করতে হবে এবং তাদের সাথে সামান্যতম অশোভন আচরণ করা যাবে না।

অমুসলিম পিতামাতা বা ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী-বিশ্বাসী পিতামাতার সাথে মুসলিম সন্তান অথবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত সন্তান কেমন ব্যবহার করবে– এই বিষয়টিই সূরা লুকমানের ১৫ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, '(পিতামাতার অধিকার আদায় করতে গিয়ে মনে রাখবে) যদি তারা তোমাকে এই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। তবে পৃথিবীর জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে, আর (নির্দেশ মানার ব্যাপারে) তুমি শুধু তার কথাই মেনে চলবে যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে এসেছে (আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করছে।) এরপর (পরিশেষে) তোমাদের সকলকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো (পৃথিবীর জীবনে) তোমরা কেমন কাজ করছিলে।'

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, অমুসলিম পিতামাতা, মুসলিম নামধারী দ্বীনি আন্দোলন অপছন্দকারী পিতামাতা সন্তানকে যদি এমন কোনো আদেশ দেন-যে আদেশ ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিধানের পরিপন্থী, তাহলে সে আদেশ কোনোক্রমেই পালন করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, 'স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

পিতামাতা হোক আর যে-ই হোক না কেনো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না, করলে মারাত্মক গোনাহ্‌গার হতে হবে। ইসলামের বিপরীত আদেশ আমান্য করতে যেয়েও পিতামাতার সাথে কঠিন ভাষা বা অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মিষ্টি ভাষায় পিতামাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনাদের কথা বা আদেশ মহান ইসলামের বিপরীত। এ আদেশ পালন করলে আমার রব-আমার আল্লাহ, আমার প্রিয় রাসূল অসন্তুষ্ট হবেন। পরিণামে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অমুসলিম পিতামাতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। মুশরিক পিতামাতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে

www.pathagar.com

হবে যেমন মুসলিম মাতাপিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন ঈমানদার হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতাপিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শুভাকাংখা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং সেবা-যত্নের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হিদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। ইতোপূর্বে আমরা হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর অমুসলিম মা'কে কিভাবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

সূরা লুকমানের এই আয়াতে সন্তানকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তুমি শুধু তার কথাই মেনে চলবে যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে এসেছে।' অর্থাৎ যেসব লোক মহাসত্য গ্রহণ করেছে এবং সেই আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করছে ও অন্যদেরকেও এই পথে আহ্বান করছে, শুধুমাত্র তাদের কথাই মেনে নিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, 'সর্বপ্রথমে আমি একজন মুসলমান, মহান আল্লাহর গোলাম।' এই পরিচয় সর্বত্র প্রাধান্য দিতে হবে এবং অন্য কারো কথা বা নির্দেশ তখনই অনুসরণ করা যাবে, যে নির্দেশ বা কথা হবে মহান আল্লাহর গোলামীর অধীনে।

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মেয়ে হযরত আছমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন, একদিন আমার মা আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জানালাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম পছন্দ করেন না। আমার মায়ের সাথে আমি কি আপনজন বা আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারি? আল্লাহর নবী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন- অবশ্যই, তুমি নিজের মায়ের সাথে আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারো। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরার সাথে তাঁর মায়ের সম্পর্ক ছিলো বড়ই মধুর। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় আল্লাহর নবীর কাছে এলেন। এ সময় সেখানে আরো বেশ কয়েকজন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। নবীজী তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে কখন এলে? ক্ষুধার্ত কণ্ঠে হযরত আবু হুরাইরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রচন্ড ক্ষুধা আমাকে এখানে টেনে এনেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছড়া খেজুর আনালেন এবং উপস্থিত সকলের হাতে দুটো করে দিয়ে বললেন, এই খেজুর দুটো খেয়ে পানি পান করো, এই দুটো খেজুরই আজকে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি রেখে দিলেন। বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি জানতে চাইলেন, আবু হুরাইরা! খেজুর রেখে দিলে যে!

তিনি লাজনম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের জন্য রেখে দিয়েছি।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর কণ্ঠে বললেন, আবু হুরাইরা! তুমি ওটাও খেয়ে নাও, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুটো খেজুর দিচ্ছি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গর্ভধারিণী মাতা তখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করেননি এমনকি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করতেন। আল্লাহর রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে গর্ভধারিণী মায়ের মন্তব্য তাঁর কলিজায় তীরের মতোই বিদ্ধ হতো। তিনি কখনো মায়ের সাথে অশোভন আচরণ করতেন না, শুধু নীরবে অশ্রুই বিসর্জন দিতেন আর মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন, তাঁর মায়ের হৃদয়-মনকে যেনো আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের প্রতি অনুগত করে দেন। একদিন তাঁর গর্ভধারিণী মা আল্লাহর রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করলেন। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বিষন্ন মনে অশ্রু সজল চোখে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে অশ্রু দেখে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন।

তিনি তাঁর মায়ের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলকে জানিয়ে বললেন, আপনি আমার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমার মায়ের মন যেনো হিদায়াতের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে হযরত আবু হুরাইরার মায়ের হিদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। হযরত আবু হুরাইরা এই অবস্থায় নিজের বাড়ির দিকে ছুটলেন। দরজার কাছে এসে তিনি মা'কে ডাকলেন। সেদিন মা যে ভাষায় জবাব দিলেন, সেই জবাব শুনেই তিনি অনুভব করলেন, মায়ের কণ্ঠ মমতার সুষমা মন্ডিত– পূর্বের সেই কর্কশতা আর নেই। মায়ের মমতাভরা কণ্ঠে তাওহীদের ছোঁয়া, শিরকের পূতি গন্ধ আর নেই। মা দরজা খুলে দিলেন, মায়ের গোটা অবয়ব তাওহীদের আলোয় উদ্ভাসিত। মুখে অপূর্ব হাসি টেনে বললেন– বাবা আমি গোছল করেছি। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। আমি তাওহীদের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই।

মুমিনের সম্মুখে একজন মুশরিক আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে অশোভন উক্তি করলে মুমিনের পক্ষে তা সহ্য করা মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। কিন্তু মায়ের সম্মান-মর্যাদার কারণে হযরত আবু হুরাইরা তা সহ্য করে নিজের মুশরিক মায়ের সেবা-যত্ন ও অন্যান্য যাবতীয় হক আদায় করতেন। কখনো মায়ের সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা পর্যন্ত বলেননি। নিজের উত্তম আচরণ দিয়ে মায়ের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছেন। এভাবেই মুসলিম সন্তান অমুসলিম পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং তাদের পার্থিব অধিকার আদায় করবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে ভোট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলে। সুতরাং ভোট ব্যবস্থাও এক ধরনের যুদ্ধ। এই ভোট যুদ্ধ মুসলমানদেরকে সুযোগ এনে দেয় ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার। যাদের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে তারা সবাই ভোট যুদ্ধের সৈনিক। যাকে ভোট প্রদান করবেন সেই ব্যক্তি যদি ইসলামপন্থী না হন, তাহলে তাকে ভোট দেয়া পরিষ্কার হারাম। সে ব্যক্তি যে-ই হোক না কেনো, নিজের পিতামাতা, ভাই বা অন্য যে কোনো আত্মীয়-স্বজন,

www.pathagar.com

তারা নামাযী, হাজী যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যদি তারা চেষ্টা-সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাদেরকে কোনোক্রমেই ভোট দেয়া জায়েজ হবে না। যদি কেউ দেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ-وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে কেউ এই ধরনের লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে। (সূরা তওবা-২৩)

সূরা লুকমানের ১৪ ও ১৫ নম্বর উভয় আয়াতের শেষেই বলা হয়েছে, 'তোমাদের সকলকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।' ১৫ আয়াতে অতিরিক্ত যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, 'তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো পৃথিবীর জীবনে তোমরা কেমন কাজ করছিলে।'

অর্থাৎ আদর্শগত এই যে বিরোধ, এই বিরোধে তোমাদের মধ্যে কে মহাসত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলে আর কে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে ছিলে, তা সেদিন তোমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তোমরা যারা শিরকে নিমজ্জিত ছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের হাতে প্রস্তুত মাটির মূর্তি, বৃক্ষ-তরুলতা, পাথর, নদী-সাগর, আকাশের তারকাপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য ও পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে নিজেদের মা'বুদ মনে করতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তোমাদের পৃথিবীর জীবনের অবসান ঘটবে এবং আখিরাতের ময়দানে আমার সম্মুখে যখন তোমাদের উপস্থিত করা হবে, তখন দেখতে পাবে মহান আল্লাহর সাথে শিরক করতে যারা নিষেধ করতো, তারাই প্রকৃত সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

তোমরা যারা এক শ্রেণীর পীরকে বা মাজারে শায়িত মৃত লোকদেরকে আশা-আকাঙ্খা পূরণকারী মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে যারা পৃথিবীর চিন্তা নায়কদের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করতে, তারাও সেদিন নিজের চোখে দেখতে পাবে, কিভাবে তোমরা শিরকের পংকে নিমজ্জিত ছিলে।

পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আয়াতের শেষে 'তোমাদের সকলকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো পৃথিবীর জীবনে তোমরা কেমন কাজ করছিলে।' এই কথাটি বলে মানুষকে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান সেদিকে সন্তানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এ কথাই সন্তানকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পিতামাতার প্রতি জন্মগত প্রবল আকর্ষণ ও রক্ত সম্পর্কের খাতিরেও তাদের কোনো অবৈধ আদেশ পালন করা যাবে না। আল্লাহর আদেশের বিপরীতে তাদের আদেশকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

সেই সাথে পিতামাতা ও সন্তানের মনে সেদিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেদিন সব কিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। পিতামাতার হক সে যথারীতি আদায় করছে কিনা অথবা

www.pathagar.com

তাদের হক আদায় করতে গিয়ে সীমালংঘন করছে কিনা, পিতামাতাও সন্তানকে আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ দিচ্ছে কিনা- এই বিষয়টি পিতামাতা ও সন্তান যেনো সবসময় স্মরণে রাখে এ জন্যই বলা হয়েছে, পৃথিবীর জীবন শেষে আমারই কাছে তোমাদেরকে আসতে হবে। অতএব যার যা ভূমিকা তা সীমার মধ্য অবস্থান করেই পালন করো। সীমালংঘন করলে পরিশেষে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং গ্রেফতার হয়ে শাস্তির আবাসস্থল জাহান্নামে যেতে হবে।

মুসলিম পিতামাতা ও সন্তান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধুমাত্র সন্তানকে তার পিতামাতার অধিকার আদায় করতে বলেননি, পিতামাতার প্রতিও আদেশ দিয়েছেন সন্তানের অধিকার আদায় করার জন্য। সন্তান মহান আল্লাহর নে'মাত, এই নে'মাত বড়ই অমূল্য। সবাই এই নে'মাতের অধিকারী হয় না। এমন পিতামাতা বোধহয় বিরল, যারা সন্তান কামনা করেন না। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীই কামনা করেন, তাদের জীবন সন্তানের মধুর কলকাকলীতে ভরে উঠুক। স্বামী এবং স্ত্রীর মন অধীর হয়ে থাকে শিশুর কচিকণ্ঠে মধুর স্বরে আব্বু-আম্মু ডাক শোনার আশা ও কামনায়।

প্রকৃত অর্থে সন্তানের কারণেই একটি বাড়ি ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। বাড়ির শোভা বৃদ্ধি করে সন্তান। শোভা-সৌন্দর্যহীন বাড়ি ঐটি, যে বাড়িতে ফুলের মতো পবিত্র শিশু কণ্ঠের কলকাকলী নেই, যে বাড়িতে অনুপস্থিত সন্তানের মমতা জড়ানো আবেগময় কণ্ঠ, যে বাড়িতে শিশুর কল-গুঞ্জন নেই, সে বাড়ি সমাধী ক্ষেত্রের মতো। জন্মগতভাবেই নারী মাতৃত্বের আকাঙ্খা হৃদয়ের নিভৃত কোণে পোষণ করে। নারীর সে আকাঙ্খা দুর্বিনীত হয়ে ওঠে বিয়ের পরে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে। পারিবারিক জীবনে একজন নারী সন্তানের আকাঙ্খায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। নারী অধীর হয়ে ওঠে কোন্ শুভলগ্নে তার কোল আলোকিত করে আসবে পূর্ণিমার ন্যায় সুন্দর শিশু। যে তাকে পূর্ণতা দান করবে। বস্তুত নারীর পূর্ণতাই মাতৃত্বে।

একটি শিশুর সে সেবা-যত্ন করছে হৃদয় দিয়ে, শিশুকে সে ভালোবাসছে তার সমস্ত মাতৃত্বের সত্ত্বা আর চেতনা দিয়ে, শিশু তার নধরকান্তি কচি হাত-পা ছুঁড়ে বিছানায় খেলছে, এ সবকিছুই, পারিবারিক জীবনে একজন মমতাময়ী নারী হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে থাকে। মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবেই একজন নারীর প্রকৃতি এমন করেছেন যে, সন্তানের সুখের জন্য সে নিজের জীবনের সমস্ত সুখ-সৌন্দর্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সন্তানের জন্যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করে নারী পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

সন্তানের কারণে মায়ের ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী যখন মা হওয়ার আশায় প্রহর অতিবাহিত করতে থাকে, তখন গর্ভ ধারণের সবটুকু সময় সে প্রতিদান ও সওয়াব লাভ করতে থাকে, যেমন প্রতিদান রোযা পালনকারী ও ইবাদাতের কারণে রাত জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত বান্দা পেয়ে থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মা যে কষ্ট পায়, এর বিনিময়ে যে প্রতিদান ও সওয়াব

www.pathagar.com

সে পায়, এ সম্পর্কে কোনো সৃষ্টিজীব অনুমানও করতে পারে না। মায়ের যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদের পরে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় এবং মা যখন নিজের দুধ পান করায়, তখন দুধের প্রত্যেক ঢোকে সে সওয়াব ও প্রতিদান পেতে থাকে, যেমন প্রতিদান পায় জীবনদানের জন্য। নির্দিষ্ট সময় পরে যখন দুধপান ছাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন আল্লাহর ফেরেশ্তা সেই নারীর কাঁধে হাত রেখে বলতে থাকে, হে আল্লাহর দাসী! এখন দ্বিতীয়বার গর্ভ ধারণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (কানযুল উম্মাল)

নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে, জীবনীশক্তিকে তিল তিল করে ক্ষয় করে দিয়ে, সাধ-আহলাদ, কামনা-বাসনা, জীবন ও যৌবন ম্লান করে দিয়ে, যন্ত্রণার অসীম সাগর পাড়ি দিয়ে যে মা সন্তান জন্ম দেয় এবং লালন-পালন করে, সে মা অবশ্যই সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখবে এটাই স্বাভাবিক। সন্তান তারই আদেশের অনুগত হবে, মনের মতো হবে, তার আশা-আকাঙ্খা অনুসারে সন্তান বেড়ে উঠবে, সন্তানের সুনাম-চারদিকে ফুলের সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়বে, সৌভাগ্য তার সন্তানের পদ চুম্বন করবে, সবার কাছে তার সন্তানের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে, সন্তান সবার কাছে অনুসরণীয় হবে, খ্যাতনামা হবে, প্রশংসীত হবে, সাফল্য লাভ করবে এ সবই থাকে সন্তানকে কেন্দ্র করে মায়ের স্বপ্ন।

পক্ষান্তরে একজন মুসলিম মা তার সন্তানকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও সব চেয়ে যে বড় স্বপ্ন দেখে তা হলো, তার সন্তান হবে আল্লাহর পথের একজন শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। দ্বীনদার ঈমানদার ইসলামী সভ্যতার ধারক-বাহক ও সংরক্ষক হবে তার কলিজার টুকরা সন্তান। সন্তানের কারণে মহান আল্লাহর কাছে মা হিসেবে সে হবে সম্মানীত-এটাই থাকে একজন মুসলিম মায়ের স্বপ্ন। সন্তান যখন তার স্বপ্ন পূরণের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে দৃপ্ত কদমে এগিয়ে যায় তখন গর্বে মায়ের বুক ভরে যায়। আল্লাহর দরবারে মা বারবার শোকর আদায় করতে থাকে।

যে সন্তানের কারণে পিতামাতার অসীম ত্যাগ, যাকে কেন্দ্র করে এত স্বপ্ন, যার সম্পর্কে পিতামাতার এত সুখ কল্পনা, সে সন্তান যদি পিতামাতার অবাধ্য হয়, আনুগত্য না করে, পিতামাতার স্বপ্নের বিপরীত পথে পা বাড়ায়, প্রত্যেক মুহূর্তে পিতামাতা যদি সন্তানের কারণে হৃদয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে, তখন পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যে কোন পর্যায়ে নেমে যায়-তা বুঝি কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে এমন পরিবার বোধহয় অত্যন্ত বিরল, যে পরিবারের পিতামাতার মধ্যে সন্তানকে কেন্দ্র করে হতাশা আর নিরাশার জন্ম হয়নি। এমন পিতামাতা খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, যাদের চোখে সন্তানের কারণে পানি ঝরে না।

সন্তান পিতামাতার তোয়াক্কা করে না, তাদের সম্পর্কে উদাসীন, নম্র ভাষায় কথা বলে না, পরামর্শ গ্রহণ করে না, আদেশ মানে না- এসব অভিযোগ প্রায় প্রত্যেক পিতামাতার কণ্ঠেই ক্ষোভ বেদনা আর মর্ম যন্ত্রণার সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। সন্তান একটু বড় হলেই পিতামাতার কণ্ঠ চীরে শুধুই আক্ষেপ বের হয়ে আসছে। পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ, তাদের সম্মান-সম্ভ্রমের সংরক্ষণ, সেবা-যত্ন, আদেশ-নিষেধ পালন, তাদের সাথে স্বহাস্য বিনয়াবনত আচরণ ও

তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূল্যায়ন ইত্যাদি কোনো কথাই যেন একশ্রেণীর সন্তানদের অভিধানে অনুপস্থিত। সন্তানদের এই অবনতি দেখে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী একশ্রেণীর পিতামাতা 'বর্তমানে ছেলেমেয়েদের ব্যবহারই এমন' একথা উচ্চারণ করেই নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি আড়াল করতে চায় এবং নিজেদের কোন্ ভুলের কারণে কলিজার টুকরা সন্তান এমন জঘন্য বেয়াদব হলো-সে ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে না।

সন্তান একটু বড় হলেই সে সন্তানের উপরে পিতামাতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পিতামাতাকে গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করে দেখতে হবে, নিজেদের কোনো ক্রটিযুক্ত ভুমিকার কারণে তাদের আদরের সন্তান এমন জঘন্য বেয়াদব হয়নি তো! মহান আল্লাহ পিতামাতার উপরে সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে যে দায়িত্ব অপর্ণ করেছেন, সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে অধিকার রয়েছে, সে অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে সন্তানকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা। এসব বিষয় আত্মসমালোচনা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, তেঁতুল বৃক্ষ রোপণ করে সে বৃক্ষ থেকে মিষ্টি আম খাওয়ার আশা পোষণ করা চরম বোকামী। আপনার সন্তানকে আপনি যা শিক্ষা দিবেন তাই সে শিখবে এবং তদানুযায়ী আচরণ করবে। আপনার প্রিয় সন্তানের প্রতি আপনি যথাযথভাবে যখন দায়িত্ব পালন করবেন, তখনই আপনার সন্তান আপনার মনের মতো হবে। আপনি পিতামাতা হিসেবে আপনার আত্মজ সন্তানের কাছ থেকে যে সদাচরণ দাবী করেন, অনুরূপ আচরণ আপনি সন্তানের সাথে করুন এবং তাকে যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী দেখতে চান, প্রথমে আপনি স্বয়ং সে উত্তম চরিত্রের নমুনা সন্তানের সম্মুখে পেশ করুন।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার আছে-বিষয়টি সন্তানকে না জানালে সন্তানের মধ্যে এ অনুভুতি-কিভাবে সৃষ্টি হবে যে, সন্তানের প্রতিও পিতামাতার সীমাহীন অধিকার রয়েছে? সন্তান কিভাবে পিতামাতার আদেশ পালন করবে, সেবা যত্ন করবে, যদি সন্তানকে শিক্ষা না দেয়া হয় যে, আল্লাহর পরেই পিতামাতার স্থান এবং তাদের সেবা-যত্ন করা ফরজ। তাদের সাথে নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে। পিতামাতাই সন্তানের জান্নাত-জাহান্নাম, তাদের সেবাযত্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সন্তানের যাবতীয় মঙ্গল। কোরআন-হাদীসের আলোকে সন্তানকে এই শিক্ষা না দিলে সন্তান কিভাবে পিতামাতার অধিকার আদায় করবে!

পিতামাতা যদি সন্তানের অধিকারের প্রতি সচেতন হয় তাহলে তাদের অধিকারের প্রতিও সন্তান সচেতন হবে। সন্তানকে খেতে পরতে দেয়া, লেখাপড়ার খরচ দেয়া- এটাই শুধু সন্তানের অধিকার নয়। পিতামাতা সন্তানকে একজন আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলবে, সর্বোত্তম শিক্ষা দিবে এ ধরনের অনেক কিছুই সন্তানের অধিকার। সন্তানের আবেগ অনুভূতির প্রতি যদি পিতামাতা দৃষ্টি না দেয়, তাহলে পিতামাতার আবেগ-অনুভূতির প্রতি সজাগ থাকতে হবে, এই শিক্ষা সন্তান কোথায় পাবে! পিতামাতার বিরূপ আচরণের কারণে সন্তান যদি ভাবতে বাধ্য হয় যে, 'আমরা পিতামাতার জন্য এক ঝামেলা বিশেষ, তাদের জন্য বোঝা এবং

www.pathagar.com

তাদের ভোগ-বিলাসের পথে বড় বাধা।' তাহলে সেই সন্তান কিভাবে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করবে? তারা নিজেদেরকে অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্খিত ও হতভাগা বলেই মনে করবে এবং এ কারণে তাদের মন-মানসিকতায় যে অশুভ প্রভাব বিস্তার করবে, এই প্রভাব এসব সন্তানকে আদর্শ মানুষ হবার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ইন্তেকাল করে, এরা আখিরাতের দিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এ সব নিষ্পাপ শিশু জবাব দেবে যে, যতক্ষণ আমাদের পিতামাতা জান্নাতে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দিবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের পিতামাতা সকলেই জান্নাতে যাও। (তিবরানী)।

সুতরাং সন্তানকে সেই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। পিতামাতা সন্তানকে কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা দিতে পারে তাহলে সে সন্তান তাদের জন্য পৃথিবী ও আখিরাতে গৌরবের কারণ হতে পারে। আবার শিশু বয়সে সন্তান ইন্তেকাল করলে, তার ইন্তেকালে যদি পিতামাতা ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতিতে শোক প্রকাশ ও ধৈর্য ধারণ করে তাহলে সে সন্তানও তাদের জন্যে জান্নাত লাভের কারণ হবে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন কোনো বান্দার সন্তান ইন্তেকাল করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রুহ্ কবজ করে নিয়েছো? ফেরেশ্তারা জবাব দেন, আপনার আদেশে কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার কলিজার টুকরার রুহ্ কবজ করেছো? ফেরেশ্তারা জবাব দেন, আপনার আদেশে রুহ কবজ করেছি। আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এ সময় আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশ্তারা জবাব দেন, হে আমাদের রব! তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে এবং এই মুসিবতে সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্দেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল প্রস্তুতের এবং সে মহলের নাম 'শোকর-এর মহল' রাখার নির্দেশ দেন।

সন্তানের ইন্তেকালে পিতামাতা ধৈর্য ধারণ করে যদি আল্লাহর শোকর আদায় করে, তাহলে তাদের জন্য জান্নাতে যে মহল নির্মাণ করা হবে, সে মহলের নামই রাখা হবে শোকর গুজারীর মহল। সন্তানের কত বড় মর্যাদা! সন্তান পিতামাতার জন্য জান্নাতে যাওয়ার সিঁড়ি, আখিরাতে মর্যাদার কারণ। আল্লাহর কাছে সন্তানের কারণে পিতামাতা হবে সম্মানের পাত্র।

www.pathagar.com

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার

পিতামাতার কাছে সন্তানের সর্বপ্রথম অধিকার হলো, সন্তানকে পিতামাতা নিজেদের জন্য বোঝা এবং আরাম-আয়েশ, সুখ-সম্ভোগের পথে অন্তরায় মনে করবে না। বরং সন্তান যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া অমূল্য নে'মাত একথা তারা স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আম্মু-আব্বু ডাক শোনার সৌভাগ্য সবার হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা অসীম অনুগ্রহ করে সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবেই আসে। সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা পিতামাতাকে অনুধাবন করতে হবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সন্তানের অন্যান্য অধিকার যথারীতি আদায় করতে পারবে না।

সন্তানের পিতামাতা যদি সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করাও সম্ভব নয়। সন্তান পারিবারিক জীবনের আকর্ষণীয় সুগন্ধি। পিতামাতার কর্মের অনুপ্রেরণা হলো সন্তান এবং পৃথিবী ও আখিরাতের কল্যাণের মাধ্যমও তারাই। সুসন্তান পৃথিবী ও আখিরাতে পিতামাতার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের জীবনের সাহায্যকারী। সন্তান পিতামাতার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি ও আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। তাদের সুন্দর আশা-আকাংখা বাস্তবায়নে সন্তান হয় সহায়তাকারী।

বর্তমানে পুজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণে মানুষের আয়ের উৎস হয়েছে সংকীর্ণ। ফলে শুধু স্বামীর রোজগারে সংসার যথারীতি চলে না। বাধ্য হয়ে স্ত্রীকেও অর্থ উপার্জনে নামতে হয়। ফলে একশ্রেণীর মানুষের হাতে গড়া নিষ্ঠুর সভ্যতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করে দিচ্ছে যে, এক বা দুয়ের অধিক সন্তান দারিদ্রতা বয়ে আনবে। সন্তান সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। সুতরাং সন্তানকে পৃথিবীতে আসতে দেয়া যাবে না। সন্তান যাতে গর্ভেই প্রবেশ করতে না পারে, প্রবেশ করলেও গর্ভপাত ঘটানো অথবা গর্ভেই সন্তানকে হত্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

অতীতকালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ঘৃণ্য ব্যবস্থা না থাকায় সন্তান জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই হত্যা করা হতো। ইসলাম এই জঘন্য পাপ থেকে মানুষকে শুধু বিরতই করেনি, পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের জীবনের মূল্য ও মর্যাদার প্রবল অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে বলতে বলেছেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ-نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ-

(হে নবী) তাদেরকে বলুন যে, এসো আমি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে সন্দুর আচরণ করবে। দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদের রিয্ক দেই তাদেরও দেবো। (সূরা আনআ'ম-১৫১)

www.pathagar.com

অতীতকালে সন্তান হত্যা করা একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ইসলাম সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে বস্তুবাদের পূজারীরা সন্তান হত্যা করে ভিন্ন কৌশলে। প্রাচীন রোমে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রকাশ্যে সন্তান হত্যা করা হতো। গোটা আরবে সন্তান হত্যার নিষ্ঠুর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেছে। ভারতে সেই প্রাচীন কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্তও সন্তানকে হত্যা করার অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা চালু রয়েছে। নানা কারণে সন্তানকে হত্যা করা হতো। বিবেক বর্জিত এক শ্রেণীর নারী পুরুষ সন্তানকে ধর্মের নামে হত্যা করতো। তাদের পূজনীয় দেবদেবী নাকি নররক্ত না পেলে সন্তুষ্ট হতো না। এ কারণে জড়বাদী মুর্খের দল পাষাণ দেব-দেবীর পদতলে নিজের কলিজার টুকরাকে নিষ্ঠুরভাবে বলী দিত। আবার কেউ কেউ পূজনীয় দেব দেবীর উদ্দেশ্যে মানত হিসেবেই সন্তানকে হত্যা করতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন নারী এসে জানালো, আমি মানত করেছিলাম যে, আমার নিজের শিশু সন্তানকে আমি কোরবানী দেবো। তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করে ঐ নারীকে জানালেন– সাবধান! এমন করবে না। মানত করেছিলে এ কারণে কাফফারা দিয়ে দিও।

পৃথিবীতে জড়বাদী মূর্তিপূজক সম্প্রদায় মূর্তির পদপ্রান্তে নরবলী দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করে নরবলী বন্ধ করার চেষ্টা করেও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থ হয়েছে। এখনো তারা গোপনে অপরের সন্তান চুরি করে অথবা নিজেদের সন্তানকে মূর্তির সামনে বলী দেয়। এই মুশরিকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ–

এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। (আনয়াম-১৩৭)

সন্তান থাকলে তার পেছনে অর্থ ব্যয় হবে, এ আশঙ্কায় বর্তমানে অনেকেই সন্তানকে আপদ মনে করে সন্তান গ্রহণ করতেই চায় না। তেমনই অতীতেও করা হতো। দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা হতো নিষ্পাপ অবোধ শিশু সন্তানকে। ইসলাম এই ঘৃণ্য কর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে খাদ্যের মালিক তোমরা নও। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে খাদ্য দান করেন। তিনি যে প্রাণসমূহ পৃথিবীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার খাদ্যের যাবতীয় দায়িত্ব ঐ মহান আল্লাহরই। তাকে পৃথিবীতে প্রেরণের বহু পূর্বেই তিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ–نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا–

দারিদ্রতার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। প্রকৃত ব্যাপার হলো সন্তান হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

সন্তান জন্ম নিলে সংসারে টানাটানি বাধবে, অর্থ সংকট দেখা দেবে, খরচ কুলিয়ে ওঠা যাবে না এমন চিন্তা মনে স্থান দেয়াও মারাত্মক গোনাহ। মুসলিম পিতামাতা সন্তানের আগমনকে অন্তরের খুশী দিয়ে স্বাগতম জানাবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। হতে পারে সে সন্তান পুত্র অথবা কন্যা। সন্তান হলো কলিজার টুকরা। হৃদয় বাগানে ফোটা প্রিয় ফুল। মুসলিম পিতামাতা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে ওঠে। বারবার সে মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করতে থাকে। একজন মুসলিম পুরুষ কিভাবে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا-

হে আমাদের রব! আমাদের সন্তানদেরকে ও আমাদের স্ত্রীদেরকে বানিয়ে দিন আমাদের জন্য চোখ শীতলকারী এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম। (সূরা ফুরকান –৭৪)

প্রকৃত অর্থে স্ত্রী ও সন্তানের চরিত্রে যদি উৎকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটানো যায়, তাহলে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি নেমে আসে। আল্লাহভীরু সন্তান ও স্ত্রী একজন পুরুষের জন্য মহান আল্লাহর অমূল্য নে'মাত। এ জন্য প্রত্যেক পরিবারের প্রধান নিজের উদ্যেগে পরিবারের সকল সদস্যকে ইসলামকে জানা ও অনুসরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পারিবারিকভাবেই চালু করতে হবে। ধৈর্যের সাথে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু রাখলে ক্রমশ তাদের চরিত্রে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে এবং এই ভীতিই তাদেরকে উৎকৃষ্ট চরিত্র গড়তে অনুপ্রাণিত করবে।

শিশু সন্তানের প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তার আহারের প্রয়োজন হয়। শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষ করেনি, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা শিশুর সর্বোত্তম খাদ্য তার মায়ের বুকে প্রস্তুত করে রাখেন। অনেকে না জানার কারণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরেই মায়ের বুকের প্রথম দুধ ফেলে দেয়। ধারণা করে এ দুধ পান করলে বাচ্চার শারীরিক ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো মায়ের বুকের প্রথম দুধ সন্তানের যাবতীয় রোগের প্রতিষেধক। এ দুধ অত্যন্ত উপকারী এবং তা শিশুকে অবশ্যই পান করাতে হবে। শুধু সন্তানের জন্যই দুধ উপকারী নয়– সন্তানকে দুধ পান করানোর মধ্যে মায়ের জন্যও বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেছে, যে মায়েরা সন্তানকে দুধ পান করায় সেই মায়েদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে না।

মাতৃগর্ভে সন্তান যেন বৃদ্ধি হয়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মায়ের একটি নাড়ী সন্তানের নাভীর সাথে যুক্ত করে দিয়ে ঐ নাড়ীর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর শিশু যখন পৃথিবীতে এলো তখন তার দেহ থেকে ঐ নাড়ী বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

গর্ভে থাকাবস্থায় মাত্র একটি লাইন দিয়ে শিশুর দেহে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা করেছিলেন। আর সেই একটি লাইন বিচ্ছিন্ন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তার খাদ্য সরবরাহের জন্য মায়ের বুকে দুইটি লাইনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মায়ের বুকের দুধটা এমন শক্ত নয় যে সন্তান সেটা চুষে পান করতে পারবে না। মায়ের বুকের দুধে ছিদ্র একটি নয়। একটি ছিদ্র থাকলে প্রবল বেগে দুধ নির্গত হয়ে শিশুর কণ্ঠনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মায়ের বুকের দুধে বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন। এই ছিদ্রসমূহ দিয়ে এমন গতিতে দুধ নির্গত হয় যেন শিশুর শ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়।

সন্তানের এটা বড় অধিকার যে, সে মায়ের দুধ পান করার অধিকার লাভ করবে। নারীর স্বভাব এবং সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেও এটা গণ্য যে, সে তার গর্ভজাত সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং এটা মাতৃত্বের দাবী। বৈধ কোনো কারণ না থাকলে মা অবশ্যই তার সন্তানকে দুধ পান করাবে। মায়ের দুধ শিশুর জন্য অপূর্ব সুষম খাদ্য। মানব সন্তান হোক অথবা পশু শাবকই হোক, নিজের মায়ের দুধের মোকাবেলায় অন্য কোনো খাদ্যই তার জন্য সুষম নয়। মায়ের দুধ সন্তানের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সন্তানের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধিতে মায়ের দুধের যতটা মুখ্য ভূমিকা আছে অন্য কোনো খাদ্যে তা নেই। সন্তানের সুন্দর স্বাস্থ্য গঠনে মায়ের দুধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ খাদ্য শুধু সন্তানের দেহের জন্যই প্রযোজ্য নয়-সন্তানের আত্মিক, চারিত্রিক, নৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সন্তানের আবেগ অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করে মায়ের দুধ।

বর্তমান বিজ্ঞানও একথার সাক্ষ্য বহন করে, যে খাদ্য মানুষ আহার করে সে খাদ্য মানুষের আবেগ-অনুভূতি, চরিত্র-স্বভাব এবং মানুষের সার্বিক ব্যবহার ও কর্মের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। সন্তান শুধু মায়ের দুধই মায়ের বুক থেকে পান করে না। মায়ের স্বভাব চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি মায়ের দুধের সাথে সাথে সন্তানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এ কারণে মা'কে হতে হয় অত্যন্ত পরহেযগার-আল্লাহভীরু। দুধ যেহেতু মানব সন্তানের প্রথম খাদ্য এ কারণে মায়ের দুধ পান করানোর বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ পিতামাতার অন্তরে সন্তানের প্রতি অসীম মায়া মমতা ভালোবাসা প্রেম এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানসিকভাবে সন্তানকে লালন পালন করার প্রবণতাও দিয়েছেন। সন্তানের জন্য যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, কষ্ট সহ্য করার মতো মানসিক প্রস্তুতিও আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতার মধ্যে দিয়েছেন। পৃথিবীকে সচল রাখা ও মানব জাতীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই আল্লাহ তায়ালা এসব অনুপম গুণ বৈশিষ্ট্য পিতামাতা ও সন্তানের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দিয়েছেন। পিতামাতার কাছে সন্তানের যতগুলো দাবী রয়েছে, তাকে প্রতিপালন করবে– সন্তানের এটা অন্যতম দাবী। পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্বের জন্য যেমন পিতামাতা প্রয়োজন তেমনি তাকে প্রতিপালনের জন্যও পিতামাতার সান্নিধ্য পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

শৈশবকালে সন্তানের বড় হয়ে ওঠা, তার বুদ্ধির বিকাশ, মানসিক গঠন যথাযথভাবে হওয়ার জন্যে পিতামাতার পরম স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, আদর-যত্ন একান্ত প্রয়োজন। কারণ শিশুর জন্য তার শৈশবকাল অত্যন্ত অসহায়ের সময়। এ সময় সে প্রতিটি প্রয়োজনে থাকে অন্যের মুখাপেক্ষী। এ জন্য পিতামাতার কাছে সন্তানের বড় অধিকার যে তাকে তার পিতামাতা অন্তর দিয়ে প্রতিপালন করবে। পিতামাতা সন্তানের প্রতিপালনের জন্য যে ভূমিকা পালন করে, এই ভূমিকা পিতামাতা ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষেই যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব।

সন্তানকে প্রতিপালন করতে হলে প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা, হৃদয় ভরা প্রেম-ভালোবাসা, অসীম মমতা, যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করার মানসিক ক্ষমতা। কোন আয়া বা নার্সের কাছ থেকে শিশু সন্তান উল্লেখিত বিষয়সমূহ যেমন লাভ করতে পারে না, তেমনি পারে না অর্থের বিনিময়ে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতার অন্তরে সন্তানকে প্রতিপালনের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং যাবতীয় গুণাবলী দান করেছেন যেন পিতামাতা সন্তানের অধিকার আদায় করতে পারে। এ কারণেই সন্তানকে প্রতিপালন করার সময়ে পিতামাতা নানামুখী কষ্ট, দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেও কোনো অভিযোগ করে না। মনে কোন ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে না, বরং অন্তরে নিবিড় এক প্রশান্তি অনুভব করে।

সন্তানের জন্য পিতামাতা যতই দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করুক না কেনো, সন্তানের প্রতি যখন তারা একবার মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন তাদের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যায়, ভুলে যায় তারা যন্ত্রণার সাগর পাড়ি দেয়ার কথা। এ যে আল্লাহর কত বড় নে'মাত তা কল্পনাও করা যায় না। পিতামাতার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এই গুণ-বৈশিষ্ট না দিলে কারো পক্ষেই সন্তানকে প্রতিপালন করা সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না এ অসীম দুঃখ যন্ত্রণামূলক কর্তব্য পালন করা।

মা! সারা পৃথিবীর মাধুর্যতা জড়িয়ে রয়েছে এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে। মায়ের কী অসীম মমতা! নির্দিষ্ট মাস পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভে বয়ে বেড়ানো, নিজের জীবনীশক্তি একটু একটু করে ক্ষয় করা মা ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব! সন্তান পেটে করে মা একটি দিনও আরামে ঘুমাতে পারেনি। খেতে বসেছে মা, গর্ভের সন্তান নড়ে উঠেছে, হাত-পা হাঁটু দিয়ে আঘাত করেছে। মা খাদ্য পেটে রাখতে পারেনি, বমি করে ক্ষুধার্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে। নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তানকে জন্ম দিয়েছে মা। সেই শিশু সন্তানের তখন কতই না অসহায় অবস্থা! না নড়তে পারে, আর না কথা বলতে পারে। শরীরে ব্যথা লাগলে বা পেটে ক্ষুধা অনুভব হলেও বলতে পারে না। সন্তান তখন অসহায় গোস্তের একটি টুকরা। সন্তান প্রসব করে মা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে-চরম অসুস্থ অবস্থায় নিজের জীবনের মমতা বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে মমতাময়ী মা।

গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছে। নিজেকে নিয়োজিত করেছে সন্তানের যত্নে। সন্তান বারবার রাতে কেঁদে উঠেছে। প্রচণ্ড শীতের পরিবেশে মায়ের শরীরে মলমূত্র ত্যাগ করেছে সন্তান, রাতে ঘুমাতে দেয়নি। তবুও মায়ের নেই কোনো এতটুকু অভিযোগ। সন্তান

সামান্য অসুস্থ হলে মায়ের কলিজায় তীর বিদ্ধ হয়েছে। সন্তানের কষ্ট দেখে মা যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। একই অবস্থা পিতারও। পিতা নিজের রক্ত পানি করে যা উপার্জন করেছে, তা শিশুর জন্য খরচ করতে মোটেই দ্বিধা করে না। শরীর ঝলসানো গরমে, কাঠ ফাটা রৌদে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এবং রক্ত জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে যা কিছু উপার্জন করে তা সন্তানদের জন্যই করে। কষ্টলব্ধ সে অর্থ সন্তানদের জন্য খরচ করে পিতা অন্তরে কষ্ট পায় না, বরং আত্মিক শান্তি অনুভব করে।

মা একাই সন্তানের সেবা-যত্ন করবে, পিতা শুধু সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করেই নিষ্কৃতি পাবে এমন হতে পারে না। মাতা ও পিতা সমানভাবে সন্তানের প্রতি যত্ন নেবে। একটি শিশুর সবদিকে প্রবৃদ্ধির প্রতি তারা লক্ষ্য রাখবে। শিশুর আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তাকে নানা ধরনের বিপদ-প্রতিকূল অবস্থা থেকে হেফাজত করবে। শিশুর রুচির দিকে খেয়াল রাখবে। শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য দেবে। শিশুর মধ্যে সচেতনতা, মানবিকতা, দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করবে পিতামাতা। তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হবে ও তার চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেবে।

শক্তিমান, বুদ্ধিমান তথা সবদিক দিয়ে সুন্দর সন্তান পেতে চাইলে সন্তান গর্ভে থাকতেই যত্ন নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সন্তান বহনকারী মাতার প্রতি যত্ন নিলেই সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়া হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সন্তান নিজে উপার্জন না করা পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে পিতামাতা। তার আহারাদী, পরিধেয় বস্ত্র, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন, তার বাসস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার বহন করবে পিতামাতা। এগুলো যেমন সন্তানের অধিকার তেমনি পিতামাতার দায়িত্ব।

পিতা যদি জীবিত এবং সক্ষম থাকে তাহলে তার প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত হয় অর্থ উপার্জনের। ইসলাম মা'কে এ দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কারণ মা যেন সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত সন্তানের যত্ন নিতে পারে, শিশুর মানসিক বিকাশের শুরু থেকেই শিশুকে আল্লাহর একজন দাস হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ সময়টিই মায়ের পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানেই মায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা। সন্তানের যখন শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে, সে সময় সন্তানের মানসিক বিকাশ যেন ইসলাম নির্দেশিত পথেই ঘটে, এ দিকে দৃষ্টি রাখা পিতামাতার প্রধান দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব একজন মা কিভাবে পালন করেছে এ ব্যাপারে আদালতে আখেরাতে তাকে কঠিনভাবে জবাবদিহী করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বামীর গৃহের জিম্মাদার ও তত্ত্বাবধায়ক হলো নারী। যে সমস্ত মানুষ ও জিনিসের হেফাজতকারী হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। (বোখারী)

এক কাজটি যেমন কঠিন তেমনি মর্যাদাপূর্ণ। একজন শিশুকে সর্বোত্তম মানুষে রূপান্তরিত করা, এ যে কতবড় মর্যাদার কাজ তা কল্পনাও করা যায় না। এই কাজটিই ইসলাম অর্পণ করেছে একজন মায়ের তথা নারী জাতীর প্রতি। আজ সেই নারী জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত অর্পিত দায়িত্ব হতে মুক্ত করে অফিস আদালতে, মিল, কলকারখানায়, মাঠে, পথে-প্রান্তরে

www.pathagar.com

স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবন হয়েছে ধ্বংস। সন্তান-সন্ততি আচার আচরণের দিক দিয়ে পশুস্তরে নেমে পড়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের সন্তান পশুকেও হার মানাচ্ছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে নারী নিজের সন্তানকে প্রতিপালন করার লক্ষ্যে নিজের বাড়িতে অবস্থান করবে, সে নারী জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।' নারীর জন্য এটা কতবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, সে পৃথিবীতে সৎ মানুষ সরবরাহের দায়িত্ব লাভ করেছে, আর এ দায়িত্ব পালন করলে সে জান্নাতে আল্লাহর নবীর পাশে অবস্থান করবে। নারীর মন-মানসিকতা তার পবিত্র আবেগ-অনুভূতি, তার চারিত্রিক গুণাবলী এবং শারীরিক গঠন আল্লাহ এমনভাবে করেছেন, যেন সে তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। নারীকে এ দায়িত্ব পালন করতে না দেয়ার অর্থ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার শামিল।

আকীকা-পুত্র সন্তানের খাত্না ও নামকরণ

মাতৃগর্ভ হতে পৃথিবীর আলো-বাতাসে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে পিতামাতার প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে আকীকা আদায় করা। আকীকা বলতে সেই পশুকে বুঝানো হয়, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিনের দিন যে পশুকে সাদকা হিসেবে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের সন্তান এবং নিজের মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সন্তানদের আকীকা দিয়েছেন। সন্তানের আকীকা দেয়া অবশ্য কর্তব্য, কোনো কোনো চিন্তাবিদ বলেছেন অবশ্য কর্তব্য নয়- তবে দেয়া উত্তম। না দিলে গোনাহ্ হবে না। কিন্তু সামর্থ থাকলে অবশ্যই দেয়া উচিত। আকীকা সন্তানের জীবনের সাদকা বিশেষ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি শিশু সন্তান তার আকীকার নিকট বন্দী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার উপলক্ষ্যে পশু যবেহ করা হবে, তার নামকরণ করা হবে এবং তার মাথার চুল কাটা হবে। (বোখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিজী)

প্রাচীন আরব সমাজে আকীকা করার প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল, এর মধ্যে নাগরিক মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক তথা সর্বপ্রকার কল্যাণবোধ নিহিত ছিল। এসব কল্যাণকর কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীকার প্রথা চালু রেখেছিলেন। অন্যকে আকীকার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং স্বয়ং নিজেও আকীকা দিয়েছেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আকীকা সম্পর্কে নবীজী নিজের মেয়েকে বলেছিলেন, হে ফাতিমা! এর মাথার চুল কেটে দাও এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদকা করে দাও।' আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর সন্তানদের মাথার চুল কেটে দিয়েছিলেন এবং সেই চুলের সমপরিমাণ রূপা সাদকা করেছিলেন। তিরমিযীর আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিনের দিন সন্তানের নামকরণ, মাথার চুল কেটে দেয়া ও আকীকা করতে বলেছেন।

www.pathagar.com

মুসলিম পরিবারে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলেই সর্বপ্রথমে যে কাজটি করতে হবে, তাহলে শিশুর কানে তাওহীদের আহ্বান শোনানো। তাওহীদের ঘোষণা সর্বপ্রথমে সন্তানের কর্ণকুহরে শোনাতে হবে। হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে যে কথা শুনিয়েছিলেন, সন্তান পৃথিবীর আলো-বাতাস স্পর্শ করার সাথে সাথে তার কানে তাওহীদের সেই ঘোষণা যেনো প্রবেশ করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। হযরত আবু রা'ফে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত হোসাইন যখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তার কানে নামাযের আযান শোনাতে দেখেছি। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্মাদ)

আকীকা অনুষ্ঠানে যে পশু যবেহ করা হবে সে পশু সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পুত্র সন্তানের জন্য দুটো ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ করাই যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাছায়ী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের খুবই আদর-যত্ন করতেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, উম্মে সুলাইম যখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন তখন তাঁকে নবীজীর কাছে আনা হলো এবং সেই সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দেয়া হলো। নবীজী সে খেজুর নিজের মুখে নিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে খুব নরম করে নিলেন এবং নিজের মুখ থেকে বের করে তা শিশুর মুখে দিলেন এরপর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। (বোখারী)

ছাগলও যবেহ করা যায় ছাগীও যবেহ করা যায়। পুত্র সন্তানের জন্য দুটোই যে যবেহ করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একটি যবেহ করলেও হবে। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনেই আকীকা করা উত্তম। সম্ভব না হলে ১৪ দিনে বা ২১ দিনে অথবা তার পরেও করা যায়। মাতৃগর্ভ হতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে সন্তান যদি সুস্থ থাকে, দুর্বল না হয় তাহলে পুত্র সন্তানের খাতনা ঐ আকীকার দিনেই করে দেয়া উচিত। খাতনা করার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। আকীকার দিন অর্থাৎ সাত দিন বয়সে পুত্র সন্তানের খাতনা করা এ জন্য উপকারী যে, শিশুর চামড়া সে সময়ে থাকে অত্যন্ত কোমল এবং পাতলা। খাতনা করার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেময়ে ঐ ক্ষত অত্যন্ত দ্রুত আরোগ্য হয়।

ইসলাম পাঁচটি কাজকে উত্তম স্বভাব বা সুন্দর প্রকৃতি হিসাবে অখ্যায়িত করেছে। এ পাঁচটি কাজই হলো পবিত্রতার নির্দশন। এ পাঁচটি কাজ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে পরিগণিত। খাতনা করা; নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করা, বগলের চুল উঠানো, মোচ কাটা এবং নখ কাটা।'

খাতনা পদ্ধতি আবহমান কাল থেকেই নবীদের নিয়ম হিসেবে চলে আসছে। সমস্ত নবী খাতনা করেছেন। সমস্ত শরীয়তেই খাতনার আদেশ ছিল। ইসলামী শরীয়তেও খাতনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। এ জন্য পুত্র সন্তান ভুমিষ্ঠ হবার সপ্তম দিনেই খাতনা করা প্রয়োজন। সম্ভব না হলে ৪০ দিন বয়েসের মধ্যেই খাতনা করা উচিত। এর মধ্যেও সম্ভব না

www.pathagar.com

হলে পরেও করা যায়। তবে বেশী বয়স হলে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেননা লজ্জাশীলতার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। সন্তানের মধ্যে লজ্জাশীলতা প্রবল হয়ে পড়লে সে নিজের লজ্জাস্থান অন্যকে দেখানো বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে চাইবে না। বেশী বয়সে জোর করে সন্তানকে খাতনা করাতে গেলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। অপর দিকে বয়েস বেশী হলে শরীরের চামড়া ঘন এবং মোটা হয়ে যায়। এ সময়ে খাতনা করতে গেলে যন্ত্রণা বেশী হবারই কথা।

আকীকা ও খাতনা করার অনুষ্ঠানটি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ এই অনুষ্ঠান পালন করতে চায় তাহলে তা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অনাড়ম্বরের সাথে। অর্থ-বিত্তশালী লোকজন আকীকা ও খাতনা উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কার্ড ছাপিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয়। অতিথিদেরকে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে, উপহার লাভের উদ্দেশ্যে, প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে, গান-বাজনা এবং রং ছিটানোর ব্যবস্থা করে আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না বরং মারাত্মক গোনাহ্ হবে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠানের নামে অমুসলিমদের ন্যায় দোল পূজা চালু হয়েছে। রং ছিটিয়ে যুবক-যুবতীদের বেলেল্লাপনা চালু হয়েছে, শতশত মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয় উপহারের আশায়। নিজে কতটা অর্থ-সম্পদের মালিক তা জাহির করার উদ্দেশ্যে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর সাথে ইসলাম নির্দেশিত আকীকার দূরতম সম্পর্কও নেই। এই কর্মকান্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে উপহাস করার শামিল।

ইসলামের সোনালী যুগে আকীকা বা খাতনা উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না। কাউকে দাওয়াতও দেয়া হতো না। তবে সৎ নিয়তে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। পরিচিত মহলে বা আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে, খোরমা খেজুর বা অন্য কোনো মিষ্টি বিতরণ করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে যে, তারা সন্তানের জন্য দোয়া করবে। কোন বিনিময় পাবার আশায় বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে খাতনা বা আকীকা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা ইসলামী শরীয়াতে জায়েজ নেই।

অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর সুন্দর নামে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়েও অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। নাম আবেগ-অনুভূতির উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এর বাস্তব প্রমাণ হলো, কাউকে অর্থহীন শ্রুতিকটু নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়-ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। আবার অর্থবোধক সুন্দর নামে কাউকে আহ্বান জানালে সে সন্তুষ্ট হয়-খুশী প্রকাশ করে। পিতামাতার কাছে সন্তানের এটা অধিকার যে, তারা সন্তানের একটি অর্থবোধক শ্রুতিমধুর সুন্দর নাম রাখবে। পিতামাতার মনেরও এটা স্বাভাবিক দাবী যে, তার সন্তানকে মানুষ সুন্দর শ্রুতিমধুর নামে আহ্বান করুক। শিশুও চায় তাকে উত্তম নামে সম্বোধন করা হোক। মানুষ নিজের উত্তম নাম শুনলে নিজেকে মর্যাদাবান গর্বিত মনে করে, তার আত্মমর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

শিশু বড় হয়ে সর্বত্র ঐ সুন্দর নামেই পরিচিতি পাবে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ নামের অর্থ বোঝে না। মন যেমন চায় তেমন নাম রাখে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পবিত্র এবং সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে শিশুর পিতামাতা দরবারে নববীতে এসে সন্তানের নামের জন্য আবেদন করতেন। নবীজী অর্থবোধক পবিত্র নাম বলে দিতেন এবং নামের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। নতুন কেউ তার কাছে এলে তিনি প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করতেন।

আগন্তুকের নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশী প্রকাশ করে তার জন্য দোয়া করতেন। নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি এত খুশী হতেন যে, তাঁর চেহারা মোবারকে খুশীর চিহ্ন প্রকাশ পেতো। নাম পছন্দ না হলেও সে চিহ্ন তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে ফুটে উঠতো। নতুন স্থানে গেলে তিনি সে স্থানের নাম জানতে চাইতেন। স্থানের নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন। পছন্দ না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সে স্থানের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম দিতেন।

অর্থহীন, শ্রুতিকটু, শিরকমূলক কোনো নামই নবীজী বরদাস্‌ত করতেন না। নাম তাঁর অপছন্দ হলে তিনি পরিবর্তন করে সুন্দর নাম প্রস্তাব করতেন। যদি নামের অর্থ ইসলামের বিপরীত বা অর্থহীন হতো, কোনো ক্ষতিকর খারাপ জিনিষের নামের সাথে মিলে যেত, তাওহীদের ধ্যান-ধারনার বিপরীত অর্থ প্রকাশ পেত, নামের অর্থে কোনোরূপ অহংকার বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দাসত্ব প্রকাশ পেত তাহলে তিনি সে নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে পছন্দের নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।' এর অর্থ এই নয় যে, সকলেই নিজের নাম আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান রাখবে। আব্দুল্লাহ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর গোলাম। আর রহমান হলো মহান আল্লাহর নাম এবং এর পূর্বে আব্‌দ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ হলো রহমানের গোলাম। সুতরাং এমন নাম রাখতে হবে যা শির্কের গন্ধমুক্ত এবং যে নামের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর দাসত্বের ভাবধারা প্রকাশ পায়। কোনো ধরনের বস্তুবাদী নাম বা ধর্মনিরপেক্ষ নাম রাখা যাবে না।

তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থহীন খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।' নবীজী বলেছেন, আখিরাতের ময়দানে তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে আহ্বান করা হবে। সুতরাং ভালো নাম রাখো। (আবু দাউদ)

আল্লাহর গুণবাচক নামের পূর্বে আবদ্‌ শব্দ যোগ করে যে নামসমূহ রাখা হয়েছে, যেমন আব্দুস সাত্তার, আব্দুর রহমান, আব্দুস সালাম ইত্যাদি। এসব নামের ব্যক্তিকে শুধু সালাম, সাত্তার বলে ডাকা ঠিক নয়। পুরো নাম উচ্চারণ করে ডাকতে হবে অথবা তার পছন্দনীয় কোনো ছোট সংক্ষিপ্ত নামে ডাকতে হবে। মানুষ প্রিয়জনকে ভালোবাসার আবেগে নানা নামে ডেকে থাকে। তেমন কোনো আদরের নামেও ডাকা যেতে পারে। কাউকে ডাকার সময় এটা স্মরণে রাখতে

হবে যে, তার নাম যেন কিছুতেই বিকৃত না হয়। নাম বিকৃত করা মারাত্মক গোনাহ। কারো নাম যদি মনে না থাকে, তাকে ডাকার প্রয়োজন হলে কোনো উত্তম শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগ করে নিজের দিকে ডাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারো নাম মনে না থাকলে তিনি তাকে হে আব্দুল্লাহর সন্তান অর্থাৎ হে আল্লাহর গোলামের ছেলে বলে ডাকতেন। বর্তমানেও এভাবে নবীজীর অনুকরণে ডাকতে হবে।

মানুষের শারীরীক কোনো ত্রুটি বা কোনো মুদ্রাদোষ অথবা স্বভাবের মধ্যে মন্দ কিছু থাকলে সে দিকগুলো উল্লেখ করে তাকে ডাকা হারাম। কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার নামের পূর্বে কোনো খারাপ বিশেষণ ব্যবহার করা হারাম। এসব বিষয়ে মুসলিম সমাজকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করে অনেককেই সংক্ষীপ্ত নামে ডেকেছেন, নামের পূর্বে সুন্দর বিশেষণ দিয়েছেন। আয়েশা শব্দ উচ্চারণ না করে আয়েশ, ওসমান শব্দ উচ্চারণ না করে ওস্‌ম ইত্যাদী সংক্ষিপ্ত নামে ডেকেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর বিশেষণে ডেকেছেন। শিশুর নাম রাখার ব্যাপারে পিতামাতা বা অভিভাবকদের একটি দিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, আমি আমার ছেলে বা মেয়েকে কেমন দেখতে চাই! বিষয়টি স্মরণে রেখে সেই আশা আকাংখা অনুযায়ী শিশুর নাম রাখতে হবে। যদি কেউ মনে করে অমুক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, যোদ্ধা, নেতা, ব্যবসায়ী, লেখক, সমাজকর্মী, বিজ্ঞানী ইত্যাদী ব্যক্তির মতো আমার সন্তান হোক। তাহলে তারা অবশ্যই তাদের নামের অনুকরণে সন্তানের নাম রাখে।

কিন্তু মুসলমানদের বিষয়টি ভিন্ন। তারা নাম রাখবে ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, তার সন্তান বড় হয়ে ইসলামী জ্ঞানে আকাশের সূর্যের মতোই প্রদীপ্ত হবে-এ আশায় সে তার সন্তানের নাম রাখবে সামসুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের সূর্য। কেউ যদি আশা করে তার সন্তান বড় হয়ে আল্লাহর তরবারী হিসেবে পৃথিবী থেকে মিথ্যে ও বাতিল শক্তিকে নির্মূল করবে, এ কথা মনে করে সে তার সন্তানের নাম রাখলো সাইফুল্লাহ অথবা সাইফুল ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী বা ইসলামের তরবারী।

কেউ যদি আশা করে তার শিশু কন্যা বড় হয়ে হযরত আয়েশা, খাদিজা, হাবীবা, উম্মে সালমা, যয়নব, সওদা, আসমা, ফাতিমা, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, উম্মে আম্মারা, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা আজমাইন অথবা জয়নব আল গাজালী, হামিদা কুতুব বা মরিয়ম জামিলা ইত্যাদী মহিয়ষী নারীদের মতো হবে। তাহলে তাদের নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখা যেতে পারে। অনেকে আরবী শব্দ দেখে ইসলামী নাম মনে করে নিজের সন্তানদের নাম রাখে। যেমন গোলাম নবী অর্থাৎ নবীর চাকর, নবী বখস্‌ অর্থাৎ যা নবী দিয়েছেন, গোলাম গাউছ, গোলাম রাসূল ইত্যাদী। এসব নাম রাখা ঠিক নয়। নাম সংক্রান্ত ইসলামী বই-পুস্তক পাওয়া যায়, এগুলো দেখে অথবা ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নাম জেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরই সন্তানের শিক্ষা শুরু হবে। শিশু কথা বলতে না পারলেও তার চোখ বড়ই সজাগ। অবোধ শিশুর সামনে এমন কোনো কথা বা আচরণ মোটেও করা যাবে না- যে কথা বা আচরণ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে বলা বা করা যায় না। শিশুর দৃষ্টির সামনে যা ঘটে তার সব কিছুই শিশুর মন-মানসিকতায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। দৃষ্টির সামনে সে যা ঘটতে দেখবে, কানে যে শব্দ শুনবে, শিশু তাই করা বা বলার চেষ্টা করবে।

সুতরাং শিশুর সামনে শুধু পিতামাতাই নয়-পরিবারের বড় সদস্যদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে আচরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস, দ্বীনের মুজাহিদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিশুর সামনে বড়রা যদি আলাপ-আলোচনা করে তাহলে শিশুও তাই শিখবে। নরম মাটি যেদিকে ইচ্ছে ঘুরানো যায়। যেমন খুশী তেমনভাবে নরম মাটি দিয়ে আকৃতি তৈরী করা যায়। নরম মাটি দিয়ে মানুষের অপূর্ব সুন্দর মূর্তিও নির্মাণ করা যায় আবার পশু-প্রাণীর মূর্তিও নির্মাণ করা যায়। মানব শিশুও নরম মাটির ন্যায়। ইচ্ছে করলে তাকে মানুষ বানানো যায় আবার ইচ্ছে করলে তাকে পশু-প্রাণীতেও পরিণত করা যায়।

মুসলিম পিতামাতার দায়িত্ব হলো, শিশুর মন-মগজে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো অংশীদার নেই। কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে-সব কিছুর সমস্ত প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন। তিনি যে নবী পাঠিয়েছেন- কোরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষকে তাই অনুসরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস ব্যতীত মানুষের মুক্তি ও শান্তির কোনো পথ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা, কোরআন আমাদের জীবন বিধান। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আমাদের জাতির পিতা-অন্য কেউ নয়। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানলে জাহান্নামে যেতে হবে। তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না। কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক।

শিশুকে প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখাতে হবে। কোরআনের সম্মান-মর্যাদা তাকে বোঝাতে হবে। নামাযের নিয়ম-কানুন তাকে শিখাতে হবে। সন্তানকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে হবে। তাহলে সন্তানের মধ্যে মসজিদে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তাকে মুখস্থ করাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতিমালা অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সন্তানদের মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি করতে হবে।

শিশুর খেলার ব্যবস্থা করা এবং একটু বড় হলে তাদের ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী বানানোর জন্য ব্যায়াম বা শরীর চর্চার শিক্ষা দিতে হবে। কিভাবে উঠা-বসা করতে হবে, দাঁড়াতে হবে, খেতে

www.pathagar.com

হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরের দোয়া পড়া, হাঁচি দিয়ে কি বলতে হবে, কিভাবে শুতে হবে ইত্যাদী সন্তানকে শিখাতে হবে। সন্তান বারবার ভুল করবে কিন্তু পিতামাতাকে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। ইসলাম সম্পর্কে শিশুদের জন্য অনেক বই পাওয়া যায়। তা সংগ্রহ করে কোরআন-হাদীস, আল্লাহ-রাসূল সম্পর্কে যে সমস্ত ছড়া ও কবিতা রয়েছে, তা মুখস্থ করিয়ে আবৃত্তি করাতে হবে।

শৈশবে সন্তানের মধ্যে যেন কোনো অরুচিকর, দৃষ্টি কটু অভ্যাস সৃষ্টি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শৈশবের অভ্যাস সহজে দূর হতে চায় না। অনেক পিতামাতাকে বলতে শোনা যায়, বড় হলেই ওসব অভ্যাস চলে যাবে। একথা ভুল। শৈশবই উপযুক্ত সময় শিশুর চরিত্র থেকে দৃষ্টিকটু অভ্যাস দূর করা।

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন। বড় হয়ে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তখন খুই ছোট ছিলাম। আল্লাহর রাসূলের কোলে থাকতাম। খাবার সময় আমার হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় তিনি আমাকে বললেন, পুত্র! বিসমিল্লাহ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। ব্যাস, এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।

শিশুরা সাধারণত নানা ধরনের গল্পকাহিনী শুনতে পছন্দ করে। পরিবারের প্রবীন ব্যক্তি অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী নাতীদেরকে অবান্তর কল্প-কাহিনী শোনায়, রূপকথার গল্প, যাদুকরের অবান্তর কাহিনী, জ্বীনের কাহিনী, কাল্পনিক ভূতের কাহিনী, দৈত্য-দানবের অমূলক গল্প কাহিনী শোনায়। এ সব কাহিনী মুসলিম শিশু কিশোরদের শোনানো বা পড়ানো মোটেও উচিত নয়। ইসলামের দুশমনরা এসব কাহিনী বই আকারে লিখে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন মুসলিম শিশু বাল্যকাল থেকেই ভিন্ন চিন্তা চেতনায় বড় হয়। ইসলামী চিন্তা চেতনা যেন শিশুর মগজে প্রবেশ করতে না পারে।

নবী-রাসূলদের কাহিনী, সাহাবায়ে কেরামের কাহিনী, দ্বীনের মুজাহিদদের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা সম্বলিত শিশুদের উপযোগী করে রচিত বই রয়েছে। এগুলো শিশুদেরকে পড়ে শোনাতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে কয়েকগুণ বেশী সৈন্য ও অস্ত্রের সামনে মুসলিম মুজাহিদরা সামান্য সৈন্য আর দুর্বল অস্ত্র নিয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে কিভাবে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন-এসব কাহিনী সন্তানকে শোনাতে হবে। এতে করে সন্তানের মধ্যে মুসলিম হবার কারণে ঈমানী শক্তি, সাহস-বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে।

বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ, তাবুক অভিযান, মুসলিম শাসকদের নানা ঘটনা, গাজী সালাহউদ্দিনের কাহিনী, বালাকোটের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, সিপাহী বিপ্লবের গৌরব গাঁথা, টিপু সুলতানের কাহিনী, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কাহিনী, হাজী শরিয়তুল্লা, মুন্সি মেহেরুল্লাহসহ অগণিত মুজাহিদের গৌরব গাঁথা রয়েছে, এসব কাহিনী সন্তানকে শোনাতে হবে। শিশু এসব ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

www.pathagar.com

মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে নামায। নামাযের গুরুত্ব সন্তানকে বোঝাতে হবে। পিতামাতাকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে, সময় মতো যত্নের সাথে নামায আদায় ও কোরআন তিলওয়াত করতে হবে। শীত বা গরমের মৌসুমে ফজরের নামাযসহ অন্যান্য ওয়াক্তের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে। পিতাকে দেখে সন্তানও অনুপ্রাণিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا–

তোমার পরিবার-পরিজনকে নামায আদায়ের নির্দেশ দাও এবং তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো। (সূরা ত্বাহা-১৩২)

অত্যন্ত সহনশীলতার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পিতামাতা নামায-রোযা তথা ইসলামী অনুশাসনের ব্যাপারে যদি সামান্য অবহেলা করে সেটা সন্তানের চোখে পড়বে এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে ক্ষতিকর। ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা সভা, কোরআন তাফসীর মাহফিল, দরসে হাদীসের মাহফিল বা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যদি মিছিল, জনসভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ফলে সন্তানের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও ঈমানী জজবা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানকে নামাযের আদেশ দিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مُرُوْا الصَّلاَةَ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا–

যখন তার বয়স সাত বছর হয় তখন সন্তানকে নামায আদায়ের তাকিদ দাও। যখন তার বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায আদায়ের জন্য তার উপর কঠোরতা আরোপ করো এবং এ বয়স হবার সাথে সাথে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

আপন সহোদর ভাই ছাড়া অন্য কোনো সমবয়সিদের সাথে সন্তানকে এক বিছানায় শুতে দেয়া যাবে না। নানা ধরনের খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভব হলে সন্তানের জন্যে পৃথক রুমের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। টিভি, ভিসি আর, সিডি, টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেও সন্তানকে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। কোরআন তিলাওয়াত, কোরআন-হাদীসের আলোচনা, ইসলামের উপরে নির্মিত চলচিত্র, নাটক, কোরআন তাফসীরের মাহফিল ভিসিআর বা টেপ রেকোর্ডারের মাধ্যমে সন্তানকে শোনানো ও দেখানো যেতে পারে। শিশুকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ। এই কাজ বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মমতার সাথে সন্তানকে শিখাতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানদের সাথে মায়া-মমতাপূর্ণ ব্যবহার করো এবং তাদেরকে ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।

সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাকে কিয়ামতের ময়দানে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সন্তানকে কি ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে-এ প্রশ্ন করা হবে তার অভিভাবককে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যে বান্দাকেই স্বল্প

www.pathagar.com

সংখ্যক বা অধিক সংখ্য মানুষের দায়িত্বশীল বানান না কেনো, আখিরাতের ময়দানে অবশ্যই তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে অধীনস্থ লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথে পরিচালিত করেছিলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

সন্তানকে উত্তম শিক্ষাদানকারী পিতামাতার মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। আখিরাতের দিন মানুষ যখন অকল্পনীয় বিপদের ঘনঘটা দেখে মাতালের মতো হয়ে যাবে, তখন উত্তম শিক্ষা দানকারী পিতামাতা থাকবেন নিঃশঙ্কচিত্তে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মান দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়লো, শিখলো এবং কোরআন নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করলো, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে। সূর্যের আলোর মতো তার আলো হবে এবং তার পিতামাতাকে এমন মূল্যবান দু'টি পোশাক পরানো হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়াও হতে পারবে না। তখন পিতামাতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরিধান করানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কোরআন অর্জনের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হচ্ছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ- (ترمذى)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজ সন্তানকে একটি ইসলামী আদব শিক্ষা দেয়া আনুমানিক সাড়ে তিন শস্য সাদকা প্রদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (তিরমিযী)

সন্তানকে তার পিতামাতা যথার্থ শিক্ষাদান করবে-এটা সন্তানের অধিকার। সন্তানের দৈহিক বৃদ্ধির প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তার শিক্ষার ব্যাপারে। তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দিলে পিতামাতার সমস্ত পরিশ্রমই এক কথায় বৃথা। যে পবিত্র কামনা আশা-আকাংখা নিয়ে পিতামাতা সন্তান কামনা করে, তার কোনো কিছুই পূরণ হবে না সন্তানকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দিলে।

সন্তানের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো পিতামাতা তাকে অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা, ধৈর্য, মননশীলতা, উদারতা, রুচিশীলতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা, উৎসাহ উদ্দীপনা, মমতার সাথে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সন্তানের এই অধিকার আদায় করার পরে পিতামাতা সন্তানের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন যে, তাদের সন্তান এবার তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে, ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন সিপাহসালার হবে এবং কিয়ামতের দিন এই সন্তানই হবে মুক্তির মাধ্যম।

www.pathagar.com

সন্তান যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অনুগত থাকে, ইসলামী আদর্শ পালনে একনিষ্ঠ হয়, নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচাতে পারে-এই শিক্ষা দেয়া পিতামাতার প্রতি ফরজ।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ-

হযরত আবু আইয়ুব ইবনে মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পিতার পক্ষে তার সন্তানকে উত্তম আদবের শিক্ষা দানই উৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ সন্তানকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়াই পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। (তিরমিযী)

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি সুসন্তান রেখে যান, তাহলে মৃত্যুর পরে আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানকে প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মাতকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, উম্মাতের কোনো গৃহেই যেন সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন, যে সকল পিতামাতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

পিতামাতার জন্য ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সাথে রহম-করমপূর্ণ ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতপর উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। সন্তানদের সাথে রহম করমের ব্যবহার করার অর্থ হলো তাদের মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ বা কথা বলা যাবে না যাতে তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং তারা নিজেদেরকে নীচু ভাবতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়ই এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং শিশুর মর্যাদা ও অহংবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকালই উত্তম সময় যখন আপনি শিশুর মন-মস্তিষ্কে আপনি যে ধরনের ইচ্ছা সে ধরনের ছবি এঁকে দিতে পারেন। এ ছবি বা চিত্র আজীবন চরিত্র ও কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের সম্মান-মর্যাদা দাও এবং তাদেরকে উত্তম স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দাও।'

শিশুর মধ্যে উত্তম অভ্যাস সৃষ্টির ব্যাপারে পিতার তুলনায় মায়ের কর্তব্য অনেক বেশী। কারণ অর্থোপার্জনের জন্য পিতাকে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হয়। সন্তানকে পিতা তেমন সময়

www.pathagar.com

দিতে পারেন না এবং শিক্ষা-শিষ্টাচার শিখানোর সুযোগ তার ঘটে না। মায়ের সান্নিধ্যই সন্তান বেশী লাভ করে। সন্তানের গোটা জীবন ও ব্যক্তিত্ব মায়ের সামনে পরিষ্কার থাকে। মায়ের সান্নিধ্য সন্তান বেশী লাভ করার কারণে মা সম্পর্কে সন্তান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা জড়তায় ভুগে না। মায়ের অসীম স্নেহ-মমতা, নরম মেজাজ, সীমাহীন ধৈর্য ইত্যাদীর কারণে সন্তান যেমন মায়ের নিয়ন্ত্রণে বেশী থাকে, মায়ের আদেশের অনুগত বেশী হয়, মা সম্পর্কে সন্তানের মনে তেমন ভীতিও থাকে না।

এসব কারণে সন্তান মায়ের সাথে রসিকতা ও দুষ্টুমি করে, নির্ভীক চিত্তে মায়ের কাছে নানা দাবী পেশ করে, সময়ে প্রতিবাদের কণ্ঠে কথাও বলে। সন্তানের এই আচরণ মা অনুভব করে অর্থাৎ মা সন্তানের মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্র পিতার চেয়ে বোঝে বেশী। এক কথায় সন্তানের কোন্ রোগের কি ওষুধ দিতে হবে-মা-ই ভালো জানেন। এজন্য সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দোষ-ত্রুটির সংশোধন মা অত্যন্ত দ্রুত করতে পারেন।

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান তথা যে কোনো ব্যাপারেই মায়ের চেয়ে পিতা অতি দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়েন। চোখ গরম করে সন্তানের দিকে তাকান। কিন্তু মায়ের ধৈর্য অসীম, মা সহজে ধৈর্য হারান না, ফলে শিক্ষার ব্যাপারে সন্তান পিতার চেয়ে মা'কেই বেশী পছন্দ করে। সন্তান কোনো অন্যায় করলে পিতা তেড়ে মারতে যান। কিন্তু মা হঠাৎ করেই সন্তানকে মারেন না। ক্ষেত্র বিশেষে পিতা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সন্তানকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ দেয়। কিন্তু মা এমন করেন না। শত অপরাধ করলেও মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে সন্তানকে সংশোধন করার চেষ্টা চালিয়ে যান। এসব দিক সামনে রেখেই চিন্তাবিদগণ বলেছেন, 'মা-কেবল মাত্র মা-ই পারেন সন্তানকে উত্তম শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দান করে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে।'

পিতামাতার জন্য সন্তান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং আমানত বিশেষ। সর্বোত্তম আচার ব্যবহার দিয়ে এ আমানতের হক আদায় করতে হবে। আমানতকে নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। সন্তানের সাথে মধুর ব্যবহার না করলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সাথে মাতাপিতাকে এমন সুন্দর আচরণ করতে হবে যে, তারা যেন পৃথিবীতে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয় এবং পরকালে তারা পিতামাতার কল্যাণে আসে।

পিতামাতা সন্তানের সাথে গভীর মমতা নিয়ে মেলামেশা করবে। সন্তানের ইচ্ছা, আবেগ অনুভূতির মর্যাদা দেবে, তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যে ব্যবহারের কারণে তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাদের আত্মসম্মান ও অহংবোধে আঘাত লাগে। শিশু সন্তান পিতামাতার আদর স্নেহ ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, তারা মমতা পাওয়ার আশায় পিতামাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবোধ শিশু এমন অনেক কিছুই করে, অনেক কথা বলে যা পিতামাতার পছন্দ নয়। এ সমস্ত কারণে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আদরের সাথে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে

www.pathagar.com

হবে। শিশু-শিশু সুলভ আচরণই করবে এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় সে বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্রের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু এ কারণে কোনক্রমেই শিশুর সাথে কষ্টকর আচরণ করা যাবে না।

শিশুকে অমূলক কোনো ভয় দেখানো বা তার সাথে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। আপনি হয়ত বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে তোমার খাবার বিড়াল এসে খেয়ে নেবে। আবার বললেন, একা একা বারান্দায় যেও না, ওখানে বাঘ আছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, নইলে ভূত এসে ভয় দেখাবে। এসব মিথ্যে ভয় দেখাবেন না। যদি দেখান তাহলে আপনারই কারণে আপনার সন্তান মিথ্যেবাদী ও ভীতু হবে। কেননা আপনার কাছে থেকেই সে মিথ্যে কথার ছবক পাচ্ছে। আপনি শিশুকে বললেন, এখন যদি পড়তে বসো তাহলে তোমাকে একটি সুন্দর খেলনা কিনে দেবো। অথবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। অথবা আপনি নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শিশুকে বললেন, ঐ কাজটি করো তাহলে আমার হাতে মিষ্টি আছে তোমাকে দেবো।

সরল বিশ্বাসে আপনি যা বলবেন আপনার শিশু তাই করলো। কিন্তু আপনি যে কথা শিশুকে বললেন সে কথা অনুযায়ী কাজ করলেন না। আপনি আপনার সন্তানের সাথে প্রতারণা আর ধোকাবাজী করে তাকেও প্রতারণা আর ধোকাবাজীর ছবক দিলেন। আপনি যা পারবেন না তেমন কোনো কথা বা ওয়াদা সন্তানের সাথে করবেন না।

মনে রাখবেন, আপনার যাবতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করবে আপনার শিশু। এমন আচরণ করবেন না, যাতে পরিশেষে আপনাকেই আফসোস করতে হয়। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শিশুর সাথে রাগারাগি বা চিৎকার করবেন না। শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে অকর্মা, অপদার্থ ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করবেন না। আপনি আপনার শিশুকে তার ইচ্ছা-স্বাধীনতা অনুযায়ী চলাফেরা করতে দিন। এতে করে আপনার সন্তান সাহসী হবে, স্বাধীনচেতা হবে, তার আত্মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

শিশু কোনো কাজ করলে আপনি তাকে আরো উৎসাহ দিবেন। এতে করে তার মধ্যে কর্মের স্পৃহা জাগবে। শিশুর প্রশংসা করবেন, শিশুর সামনে অন্যের প্রশংসা করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিজের এবং অন্যের মূল্য উপলব্ধি করতে শিখবে। শিশুর কোনো কাজের সমালোচনা করবেন না এতে করে শিশু হীনমন্যতায় ভুগবে। শিশুর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন, শিশুর সামনে ঝগড়া করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিষ্ঠুর এবং কলহপ্রিয় হবে।

আপনি শিশুর প্রতি রহম করুন আপনার শিশুও বড় হয়ে আপনার প্রতি রহম করবে। শিশুর জন্য এমন সুন্দর শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন, শিশু যেন সর্বদা হাসিখুশী থাকতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবেন এতে আপনার শিশু বড় হয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর ও আপরাধী হবে। পরিশেষে আপনিই সন্তানের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে

www.pathagar.com

দেবেন। পৃথিবীতে যত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ, অপরাধী, খুনী, চোর ডাকাত সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তাদের শিশু কাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পিতামাতার কোনো ভুলের কারণেই তাদের সন্তান আজ এই পরিণতি লাভ করেছে।

সুতরাং সন্তানকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যে সন্তান মানবতার কল্যাণ সাধন করবে। যে সন্তান আল্লাহর পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করবে। তাহলে এই সন্তান কিয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে জান্নাতে যাবার কারণ হবে। আর পিতামাতা সন্তানকে যদি সন্ত্রাসী, বেদ্বীন, নাস্তিক, মানুষের বানানো আইন-কানুনে বিশ্বাসী হিসেবে গঠন করে, সেই সন্তানের কারণে যতবড় পরহেজগার পিতামাতাই হোক না কেনো, তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

ইসলামী আদর্শে আদর্শবান সন্তানের এত বড় মর্যাদা যে, তার কারণে তার মরহুম পিতামাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। এসব সন্তানই হলো সাদকায়ে জারীয়াহ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ-

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এ সবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে)। কাজ তিনটি হলো, এমন সাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, যখন মৃত মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।

উপহার দেয়ায় ও আদর-ভালোবাসায় সমতা রক্ষা

সন্তানের সাথে শুধু ব্যবহারই নয়- প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির সাথে একই রূপ আচরণ ও সমতা রক্ষা করতে হবে। পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ তারা আইন অনুসারে লাভ করবে। কিন্তু পৃথিবীতে পিতামাতা সন্তানদেরকে যখন কোনো উপহার, পোষাক, খাবার দিবে তখনও সমানভাবে দিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তাদের মাঝে ন্যায়পরতা সংস্থাপন করো, এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করো।'

পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা-প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও রক্ষা করা।

সন্তান যদি দেখে পিতামাতা তাদের সাথে ইনছাফ করছে না এতে তাদের মন-মানসিকতা ভেঙ্গে যাবে। পিতামাতার প্রতি তাদের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তারা বড় হয়ে ইনসাফ করা শিখবে না। কারো মধ্যে তারা ন্যায়-নীতিও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ-

নোমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার পিতা আমাকে একটি তোহফা দিয়েছিলেন। এতে (আমার মা) উমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, তুমি যদি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সাক্ষী বানাও তাহলে আমি রাজী হবো। অতঃপর আমার পিতা আল্লাহর রাসূলের নিকট এলেন এবং বললেন, উমরাহ বিনতে রাওয়াহার পক্ষ থেকে আমার যে পুত্র রয়েছে তাকে আমি একটি তোহফা বা উপঢৌকন দিয়েছি। এতে উমরাহ আপনাকে সাক্ষী করার দাবী জানিয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই এ ধরনের তোহফা দিয়েছো? তিনি বললেন, না, সবাইকে তো দিইনি। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের সে তোহফা ফেরত নিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর নবী বললেন, আমি যুলুমের উপর সাক্ষী হই না। অন্য আরেক রাওয়ায়েতে

www.pathagar.com

আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের আচরণ করুক এটা কি তুমি পছন্দ করো? হযরত বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিলেন, কেনো নয়। নবীজী বললেন, তাহলে তুমি এ ধরনের করো না। (বুখারী, মুসলিম)

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে, তাহলে এ সমতাকে কিছুতেই অবহেলা করা এবং দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা উচিত হবে না। যদি কোনো সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দান করা হয় তবে তা চরম অন্যায় হবে। আবার অনেকে রাসূলের এ আদেশকে 'মুস্তাহাব' বলে ধরে নিয়েছেন। যদি কেউ এক সন্তানকে অপর সন্তান অপেক্ষা বেশী কিছু দান করে, তবে সে দান ঠিকই হবে, তবে তা অবশ্য মাকরুহ্ হবে।

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে বিখ্যাত ইসলামী গবেষক আল্লামা ইমাম শাওকানী (রাহঃ) মন্তব্য করেছেন, প্রকৃত সত্য কথা এই যে, সন্তানদের মধ্যে উপহার দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, কাউকে অল্প কাউকে বেশী দেয়া স্পষ্ট হারাম।

পিতামাতার কাছে এক সন্তানের তুলনায় অন্য সন্তানের মূল্যও কম নয় আবার সন্তানের প্রতি ব্যথাও কম নয়। প্রত্যেক সন্তানের প্রতিই পিতামাতার ব্যথা-বেদনা একই রকম। তবে শুধু পিতামাতাই নয়-কোনো মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে তার নিজের সব সন্তান সন্ততির প্রতি একই ধরনের মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসার মনোভাব পোষন করবে। মানুষের এটা সহজাত ব্যাপার যে, সে বিশেষ কোনো কারণে কোনো সন্তানের প্রতি বেশী দুর্বল থাকে। আকর্ষণের দিকটা কোনো সন্তানের প্রতি একটু বেশী হয়।

প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ভালোবাসার ব্যাপারে কোনো মানুষের কাছ থেকেই সমান অংশ আশা করা যায় না। আর এ ধরনের আশা করাও অযৌক্তিক। আর এমন কোনো দাবী ইসলাম মানুষের কাছে করেনি। ইসলাম পিতামাতার কাছে দাবী করেছে বৈষয়িক ব্যাপারে তথা আচরণগত ব্যাপারে। সন্তানের পিতামাতা যারা তাদের কাছে নিজের সব সন্তানই সমান এবং পিতামাতার কাছে সব সন্তানের অধিকারও একই রূপ।

অতএব পিতামাতার এ অধিকার নেই যে, সে এক সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করবে, একজনকে সবদিক থেকে বেশী দেবে অন্য জনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, দেয়ার সময় তাকে কম দেবে। এই আচরণ যেসব পিতামাতা করেন তারা আরেক সন্তানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন। সন্তানের সাথে ইনসাফ না করলে সন্তানদের মধ্যেও গর্হিত আচরণের অত্যন্ত অশুভ প্রভাব পড়ে। যাকে বেশী দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আত্মঅহংকার বা আমিই উত্তম– এমন ভাব সৃষ্টি হয়। সে অন্যান্য ভাইবোনদের ছোট জ্ঞান করতে থাকে।

www.pathagar.com

আর যে সন্তানকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা সৃষ্টি হয়, আমি অত্যন্ত নীচু এবং অযোগ্য। এভাবে আপনারই সন্তান আপনার ইনসাফহীনতার কারণে আত্মমর্যাদা বোধহীন এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। অন্যান্য ভাই বোনদের সে হিংসা করতে থাকে, মানসিকভাবে প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ওঠে। পিতামাতার প্রতি সম্মানবোধ ঐ সন্তানের হৃদয়ে থাকে না। পিতামাতা তাকে অন্য ভাইবোনদের তুলনায় কেনো দেখতে পারে না, কেনো কম দেয়-এ চিন্তায় চিন্তায় আপনার সন্তান একসময় মানসিক রোগী হয়ে পড়তে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশু বাচ্চা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দশ বছর যাবৎ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর অনেক কাজ করে দিতাম। আমি ছিলাম তখন এত অল্প বয়সের যে, উচিত-অনুচিত জ্ঞান তখন পর্যন্ত আমার হয়নি। কিন্তু আল্লাহর নবী একদিনও আমার প্রতি সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেননি। মধুর কণ্ঠ ব্যতীত আমার সাথে তিনি কখনো উঁচু কণ্ঠে কথা বলেননি। তিনি নিজে যেমন সন্তানদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল অপর কাউকে স্নেহ করতে দেখলেও তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন।

নবীজীর কাছে এক ব্যক্তি এলো। তাঁর কোলে ছিল শিশু। সে শিশুকে স্নেহভরে আদর করতে লাগলো। তিনি এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রতি কি তোমার দয়া হয়? সে বললো, কেনো হবে না। তিনি বললেন, তুমি এ শিশুর প্রতি যত দয়া করো, আল্লাহ তা'য়ালা এর থেকেও বেশী তোমার উপর দয়া করে থাকেন। কেননা তিনি সকল দয়াকারীর চেয়ে বেশী দয়াকারী। (আল-আদাবুল মুফরিদ)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললো, আপনারা কি সন্তানের মুখে চুম্বন দিয়ে থাকেন? আমরা কিন্তু দেই না। নবীজী বললেন, আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে সন্তান বাৎসল্য উঠিয়ে নিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি? (বোখারী, মুসলিম)

পিতামাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক হতে হবে অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সন্তান সর্বদা পিতামাতাকে দেখে ভয়ে ভয়ে থাকবে, অস্বস্তি বোধ করতে এটা ঠিক নয়। সন্তানের সাথে সম্পর্ক এমন যেন হয়-সে সন্তান যেন পিতামাতার সাহায্যকারী হয়। পিতামাতার উচিত অবসরে সন্তানদের সাথে শিক্ষামূলক গল্প, সত্যাশ্রয়ী কৌতুক বলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা।

একশ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, যারা মনে করেন সন্তানদের কাছে অত্যন্ত গম্ভীর থাকতে হবে। তাদের সাথে খোলামেলা আচরণ পরহেজগারীর বিপরীত। সন্তান থাকবে সন্তানের জগতে আর পিতামাতা থাকবে পিতামাতার জগতে। এতে করে সন্তান আর পিতামাতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই আচরণ ইসলামের বিপরীত। সন্তানদের সাথে নিয়ে অবসরে খেলা করলে পরহেজগারী হ্রাস পাবে না বরং নবীর সুন্নাত আদায় হবে পরহেজগারী বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

একবার হযরত হাসান অথবা হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম নবীজীর কাঁধ মোবারকে সওয়ার ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তা দেখে বললেন, বাঃ! খুব সুন্দর সওয়ারী পেয়েছে তো! নবীজী এ কথা শুনে বললেন– সওয়ারও খুব ভালো সওয়ার।

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার একটি শিশু কন্যা উমামাকে নবীজী খুব ভালোবাসতেন। প্রায় নামাযের সময়ই সে নবীজীর কাছে থাকতো। তিনি নামাযে দাঁড়ালে সে কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে যেত। রুকূ'র সময় তিনি তাকে নামিয়ে দিতেন। তিনি পুনরায় দাঁড়াতেন, সে আবার সওয়ার হতো।

একবার এক ব্যক্তি নবীজীর খিদমতে তোহফা হিসেবে কিছু জিনিস পাঠালেন। তার মধ্যে সোনার হারও ছিল। সে সময় শিশু উমামা সেখানে খেলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ হার আমি তাকে দিব ঘরে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। মহিলারা মনে করলেন যে, তিনি এ হার হযরত আয়িশাকেই দেবেন। কিন্তু তিনি উমামাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তার গলায় সে হার পরিয়ে দিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। শিশু হোসাইন রাস্তার উপর খেলা করছিলেন। তিনি দু'বাহু আপত্য স্নেহে প্রসারিত করে দিলেন। যাতে হযরত হোসাইন তাঁর কাছে চলে আসেন। হযরত হোসাইন হাসতে হাসতে তাঁর কাছে আসতেন এবং দুষ্টুমী করে আবার সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং এক হাত তার থুতনীর উপর ও অপর হাত মাথার উপর রেখে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হোসাইন আমার, আর আমি হোসাইনের।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোলে নিয়ে এক উরুর উপর আমাকে ও অন্য উরুর উপর হযরত হাসানকে বসাতেন এবং আমাদের দুজনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলতেন– হে আল্লাহ! এ দু'জনের উপর রহম করো। আমি তাদের উপর দয়া দেখিয়ে থাকি। (বোখারী)

হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এরা আমার চোখের মনি। তিনি মেয়ের বাড়িতে গেলেই হযরত ফাতিমাকে বলতেন, আমার বাচ্চাদেরকে আনো। তাদের আনা হলে তিনি তাদেরকে কোলে করতেন, চুমু দিতেন এবং বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতেন। হযরত হোসাইনকে তিনি প্রায়ই কোলে নিতেন এবং তার মুখের উপর মুখ রেখে আদর করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি এবং তাকেও ভালবাসি যে একে ভালোবাসে।

সন্তানদেরকে প্রাণভরে আদর করতে হবে। তাদেরকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বয়স অনুযায়ী হাতে, গালে, কপালে, মাথায় চুমো দিতে হবে। এতে করে সন্তানের মন-মানসিকতায় এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি হবে। সন্তানকে ভালোবাসলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসানকে চুমো দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা বিন

www.pathagar.com

হাবিসও সেখানে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমার তো ১০টি বাচ্চা। কিন্তু আমি তো কখনো একটি বাচ্চাকেও আদর করিনি। আল্লাহর রাসূল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যে রহম করে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি রহম করেন না।

যে ব্যক্তি অন্যকে আদর ভালোবাসা দিতে জানে নিঃসন্দেহে এটা তার উপরে মহান আল্লাহর অত্যন্ত বড় মেহেরবাণী। কেননা তার অন্তরে আল্লাহ মায়া-মমতা দিয়েছেন। মায়া-মমতাহীন মানুষ সভ্য সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত। যারা অপরকে ভালোবাসে এবং খোলামনের অধিকারী সমাজের সবাই তাকে স্নেহ-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। যে মানুষ নিজের সন্তানের প্রতি মমতাশীল নয়-নিজের সন্তানের মর্যাদা মূল্য বোঝে না-সে অপরের সন্তানের মূল্যও উপলব্ধি করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, সন্তানের বয়স দু'তিন বছর হলেই সে খেলার সঙ্গী চাইবে। আরেকটু বড় হলে সে প্রাণ খুলে গল্প করতে চাইবে। কিশোর-তরুণ বয়সে একটি পরিবেশ চাইবে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

পিতামাতা যদি এ সময়ে সন্তানকে সঙ্গ না দেয়, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার তুচ্ছ অহমিকায় সন্তানের সাথে গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে, তাহলে সে সন্তান পিতার এই গাম্ভীর্যতার কারণে বিকল্প বন্ধু অবশ্যই খুঁজে নেবে। সে বন্ধুর মাধ্যমে সন্তান যদি ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা শিখে তখন পিতামাতাকে অনুশোচনা করতে হবে। এ জন্য পিতামাতাকে এমন ভূমিকা পালন করতে হবে, সন্তান যেনো তাদেরকেই অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করে।

সন্তানের প্রয়োজন পূরণ পিতামাতার দায়িত্ব

অর্থোপার্জন বা জীবিকার ব্যবস্থা করার কঠিন দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ পুরুষ জাতির উপরে অর্পণ করেছেন। পুরুষকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সৃষ্টিও করেছেন সেভাবেই। জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব পুরুষের। নারীকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব কঠিন ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখেছেন। নারীর মর্যাদার কারণেই নারীকে জীবিকার্জনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি।

অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব সন্তান প্রতিপালন করা। এ দায়িত্ব যেন সে পালন করতে পারে সে যোগ্যতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সৃষ্টিই করেছেন যার যার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের উপযোগী করে। পুরুষের দায়িত্ব সে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করবে। নারী তার দায়িত্ব পালন করে যদি সময় সুযোগ পায় তাহলে উপার্জন করবে নতুবা নয়।

সন্তান গর্ভে আসার পরপরই তার জন্য পিতার খরচ শুরু হয়ে যায়। মা'কে ডাক্তার দেখানো, ঔষধ পথ্যাদি ও উত্তম খাদ্য সরহরাহ করতে হয়। সন্তানের জন্য ফিতরা দান করা পিতার উপরে ওয়াজিব। এক কথায় সন্তান জীবিকা অর্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতার হৃদয়ে পিতা সুলভ মমতার অসীম আবেগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে দিয়ে পিতার ও সন্তানের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

পিতা হিসেবে একজন মানুষ তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ সন্তানের জন্য ব্যয় করবে শুধুমাত্র এই ধারণার কারণে সন্তানের অধিকার আদায় করা ছিল অসম্ভব। সন্তানের প্রতি অসীম প্রেম ভালবাসা মায়া-মমতা পিতার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি সৃষ্টি না করতেন তাহলে কোনো পিতাই বোধহয় একটি পয়সাও সন্তানের পেছনে ব্যয় করতো না।

সন্তানের জন্য পিতা উদার হস্তে খরচ করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের রক্ত পানি করে পিতা অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ সন্তানের পেছনে ব্যয় করার পরে পিতা যখন সন্তানকে হাসি-খুশী দেখতে পায় তখন পিতার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। অমুসলিম পিতা সন্তানের পেছনে অর্থ ব্যয় করে পৃথিবীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে, আর মুসলিম পিতার দৃষ্টি থাকে আখিরাতের দিকে। সন্তানের পেছনে যে ব্যয় তা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। হযরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ–

যখন কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালে সওয়াব পাওয়ার জন্য পরিবার পরিজনের উপর ব্যয় করে তাহলে তার এ ব্যয় (আল্লাহর দৃষ্টিতে) সাদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বোখারী, মুসলিম)

একজন মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং মুসলিম পিতা সন্তানের জন্য খরচ করে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। মানুষকে মহান আল্লাহ যে সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদের প্রথম হকদার হলো তারই সন্তান। পিতামাতার সম্পদে সর্বপ্রথম যার অধিকার সে হলো তাদেরই কলিজার টুকরা সন্তানের।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো বর্তমানের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে এমন এক পশু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করতে চায় না। এ ব্যাপারে তারা ভীষণ কার্পণ্য করেন। তাদের বক্তব্য হলো, কি হবে এই অবাধ্য ছেলেমেয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করে!

সন্তান অবাধ্য– এই অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে দান করে দেন। পশ্চিমা দেশ সমূহে তো অর্থ-সম্পদ থেকে সন্তান-সন্ততিকে বঞ্চিত করে বাড়িতে সখ করে যে সমস্ত কুকুর-বিড়াল পোষা হয়, সেসব কুকুর বিড়ালের নামে অর্থ-সম্পদ দান করা হয়। পিতামাতা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, সে অর্থ তারা ক্লাবে বা পার্টিতে অকাতরে ব্যয় করেন। কিন্তু তাদেরই কিশোর সন্তান-চাঁদের মতো ফুট ফুটে সন্তান মাত্র একটি ডলারের জন্য কোনো রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলে বয়-বেয়ারার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, কন্যা নিজের নারীত্ব অর্থের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছে, এ দিকে পিতামাতার দৃষ্টি নেই।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে মুসলিম পিতামাতার প্রতি ইসলামের কঠোর নির্দেশ, সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সর্বপ্রথম সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করো, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করো। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহলে অন্যস্থানে দান করো। মুসলিম পিতামাতার কাছে এটা ইসলামের দাবী। নিজের সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় না করে, তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ-মাদ্রাসায়, স্কুলে বা অন্য কোনো ব্যাপারে দান খয়রাত করে, তার সে দান খয়রাত ইসলাম মোটেও পছন্দ করে না।

দান খয়রাত করতে করতে অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, নিজের সন্তানের জন্য ব্যয় করার মতো অর্থ থাকবে না-আল্লাহর নবী এটা পছন্দ করতেন না। আপনি সৎপথে দান করছেন-অথচ আপনার সন্তানের চিকিৎসার টাকা নেই, তার স্কুলের বেতন বাকী, তার পোষাক নেই, এ অবস্থা ইসলাম মেনে নেয় না। আপনি নিজের সুখ্যাতির জন্য, নিজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অথবা আপনার ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করবেন। আর আপনার সন্তান পেট ভরে খেতে পারবে না, কষ্টে জীবন-যাপন করবে-এটা আল্লাহ্ তা'য়ালা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবেন।

আপনি সর্বপ্রথম আপনার অর্থ সম্পদ হতে আপনার সন্তানের হক আদায় করবেন। নিজের আরাম-আয়েশের পরিবর্তে সন্তানের আরাম-আয়েশের দিকে নজর দিবেন। এ সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশ হলো-

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ-

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সাদকা তার যার পরও স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের উপর খরচ করো যাদের ব্যয়ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। (বোখারী)

কার্পণ্যতা ইসলামে ঘৃণার বিষয়। অর্থ-সম্পদ থাকলে তা অবশ্যই বৈধ পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান-সাদকা করতে হবে। দান-সাদকা করা কোরআন হাদীসের নির্দেশ। কিন্তু এ দান-সাদকা নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে উপোস করে নয়। মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে সন্তান-সন্ততির জন্য। সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করেও মানুষ তৃপ্তি পায়, অনাবিল আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় তথা বস্তুবাদী সভ্যতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে এ আনন্দ নেই। পিতামাতার মন থেকে সন্তানের প্রতি ব্যয়ের আনন্দ মুছে গিয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের মনে এ আনন্দ সার্বক্ষণিক রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। পিতামাতা যদি সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে এটাই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যাদের খাওয়া পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গোনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কারো উপরে বর্তে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গোনাহ হবে। (নাসায়ী)

নিজের সন্তান হোক বা অন্য কেউ হোক, কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ থাকার পরও তার অধীনস্থদের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ অপরাধ করে, আদালতে আখিরাতে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। এমন কিছু মানুষ রয়েছে তারা ধারণা করে, ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করলে সওয়াব হবে। এরা অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের অভাবে রেখে নানা ভালো কাজে সওয়াবের আশায় দান করে। এই কাজ ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অর্থ হচ্ছে সেটি, যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্য, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্য এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্য।

এ হাদীসে প্রথমেই সন্তান-সন্ততির জন্য যে অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে তাই হচ্ছে সর্বোত্তম অর্থ-টাকা-পয়সা। আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক আশরাফী যা তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছো, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গোলামের গোলামী থেকে মুক্তির জন্য খরচ করেছো, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গরীবকে সাদকা হিসেবে দিয়েছো এবং এক আশরাফী যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছো। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বড় সওয়াব সে আশরাফীর যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছো।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, মানুষ যত ভালো কাজেই অর্থ ব্যয় করুক না কেনো, এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সওয়াব হলো নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য অর্থ ব্যয় করা, এটাই সর্বোত্তম ব্যয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে– সবচেয়ে উত্তম আশরাফী সে আশরাফী যা মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করে থাকে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্র পথের সওয়ারীর জন্য খরচ করে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্র পথের সঙ্গীদের জন্য খরচ করে। আবু কালাবা (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করা থেকে শুরু করেন এবং বলেন, সে ব্যক্তি থেকে বেশী সওয়াব ও পুরস্কার কে পেতে পারে যে নিজের ছোট ছোট সন্তানের জন্য খরচ করে। যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে হাত পাতা থেকে বাঁচায় এবং সচ্ছল অবস্থায় রাখেন। (জামে তিরমিজী)

বস্তুত মানুষ স্বাভাবিক কারণেই, তার মনের তাগিদেই পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ জন্য বিশেষ কোনো যুক্তি বা দলীলের প্রয়োজন হয় না। তবুও ইসলাম এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়েছে এ কারণে যে, শয়তান মানুষকে যেন এ দায়িত্ব পালনে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

www.pathagar.com

পিতামাতা কতদিন পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করবে-এটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত হলো, পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হলেও যদি সে শারীরিকভাবে উপার্জনে সক্ষম না হয়, উপার্জনের পথ পেতে দেরী হয়-এসব ক্ষেত্রেও সন্তানের ব্যয়ভার পিতাই বহন করবে।

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাধ্যমে দুনিয়া অনুসন্ধান করলো, যাতে নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এ জন্য দুনিয়া অর্জন করেছে যে, অন্যদের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। (বায়হাকি)

নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তানের জন্যে ব্যয় করা অত্যন্ত মর্যাদা ও সওয়াবের ব্যপার। মহান আল্লাহ এ সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত করে দেননি। স্বামীর বর্তমানে অথবা অবর্তমানে হোক সামর্থবান নারী তার সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে চাকরি করে, বাড়িতে বসে হাতের কাজ করে নারী অর্থ উপার্জন করতে পারে। সে অর্থ তার সন্তান, মা, বোন, ভাই বা অধীনস্থদের জন্য ব্যয় করলে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময় অবশ্যই দিবেন। শুধু তাই নয়-এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা সে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছে, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে তার সওয়াবও অতিরিক্ত হবে।

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আবু সালমার পুত্রদের জন্য ব্যয় করার জন্য সওয়াব পাবো? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা অভাবগ্রস্তের মত পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তারা তো আমারও পুত্র। তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য যে ব্যয় করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ববান মা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ওহূদের যুদ্ধে মারাত্বকভাবে আহত হয়েছিলেন। আরোগ্য লাভ করেননি। পরে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি চারটি শিশু সন্তান রেখে যান। হযরত উম্মে সালমা পরে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তার পূর্বের স্বামীর সন্তানের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম স্বামীর সন্তান তাঁর কাছেই তিনি রাখতেন।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ইসলামের কারণে তাঁকে স্বামী ও শিশু সন্তানের কাছ থেকে প্রায় একবছর বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অসীম। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সন্তানের ব্যাপারে তার চিন্তা-চেতনা মুসলিম নারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পথ দেখাবে।

কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর নে'মাত

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে তাঁর কোন্ বান্দাকে নিঃসন্তান রাখবেন, কোন্ বান্দাকে শুধুমাত্র পুত্র সন্তান অথবা কোন্ বান্দাকে শুধুই কন্যা সন্তান বা কোন্ বান্দাকে পুত্র এবং কন্যা সন্তান- উভয়টিই দান করবেন, এ ফায়সালা একমাত্র তিনিই করে থাকেন। ইসলামী আদর্শের অনুসারী মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, তারা আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করে। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। ইসলামের অনুসারী পিতামাতা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।

কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী পিতামাতার কাছে পুত্র বা কন্যা সন্তানের সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান। এদের মধ্যে কোনো ব্যবধান তারা করেননা। কারণ ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। পুত্র বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া মারাত্মক গোনাহ।

নামধারী কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। পিতামাতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। কোন্ বান্দাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে অথবা অকল্যাণ হবে, আর কোন্ বান্দাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

মুসলিম পিতামাতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন- এ ধারণা সঠিক নয়। বান্দার জন্য যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। কারো ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাজ করেন না। তাঁকে বাধ্য করার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন।

স্বামী তার ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা সন্তানের ভ্রূণ স্থাপন করতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ অত্যন্ত অসহায় এবং যতবড় কামিল পীর সাহেবই হোক না কেনো, তার পানি

www.pathagar.com

পড়ায় বা তাবিজ কবজেও পুত্রের ক্ষেত্রে কন্যা আর কন্যার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে পীর সাহেব নিজেই নিজের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতেন। আল্লাহ যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তার কোনো বান্দাকে তিনি সন্তান দিবেন না এ ক্ষেত্রে- পীর-মাজারের ক্ষমতা নেই কারো স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়া। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে, এ কথা কেউ যদি বিশ্বাস করে তাহলে তার পক্ষে মুসলিম থাকা অসম্ভব।

মানুষের জ্ঞান-কোষাগারে এমন কোনো জ্ঞান মওজুদ নেই, যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, পুত্র সন্তান তার জন্য উপকার বয়ে আনবে অথবা কন্যা সন্তান তার জন্য ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ তা'য়ালার ফায়সালা থাকলে, পুত্র-কন্যা যা-ই হোক যে কোনো সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে পুত্র বা কন্যা দান করে থাকেন। মানুষকে যখন কেউ কিছু দান করে, তখন তার কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মহান আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মু'মিনের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নে'মাত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মু'মিনের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়েছিল। সে আক্ষেপ করে বললো- হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি তাদের রিযিক দাও?

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর নবী স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা, কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে সাহাবী হযরত ইবনে শুরায়েত কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা! তোমাদের প্রতি সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।' আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَتَكْرَهُوْا الْبَنَاتِ فَانِّىْ اَبُوْ الْبَنَاتِ-

কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন– কন্যারা অত্যন্ত মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। (কানযুল উম্মাল)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ هٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যৌবনে না পৌছানো অথবা স্বামীর বাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এভাবে একত্রে থাকবো। এ কথা বলে তিনি হাতের অঙ্গুলসমূহ একত্রিত করলেন। (মুসলিম)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِىْ الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারোও কন্যা সন্তান হলে যদি সে তাকে জীবন্ত দাফন না করে, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা না করে, পুত্র-সন্তানদেরকে তার তুলনায় বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার না দেয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ)

ইসলাম কন্যা সন্তানকে জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় আল্লাহর কাছে কন্যা সন্তানের কত বিশাল মর্যাদা। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পথ অত্যন্ত কঠিন এবং কন্টকাকীর্ণ। সে পথ অত্যন্ত সহজ-সরল কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যাবে কন্যা সন্তানের কারণে। পুত্র সন্তানকেও যে আল্লাহ রিযক দান করেন ঐ একই আল্লাহ কন্যা সন্তানকেও রিযক দান করেন। কন্যা সন্তানকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে পরহেযগার পাত্রের হাতে অর্পণ করার অর্থ হলো জান্নাতে নিজের আবাস নির্মাণ করা।

পৃথিবীর সর্বত্রই কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখানে কন্যা সন্তানকে লজ্জা, অপমান, অমর্যাদার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তিনিই নারী জাতিকে ঘৃণা ও লাঞ্চনার অতল গহবর থেকে টেনে উঠিয়ে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। ইসলামী পরিবারে কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অসীম। পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের মর্যাদা বেশী। কিয়ামতের দিন মসিবতের সময় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হতে পারা যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তা কল্পনাও করা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসঙ্গে থাকবো। (মুসলিম)

www.pathagar.com

শুধু নিজের কন্যা সন্তানই নয় নিজের বোনের ব্যাপারেও একই কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। (তিরমিযী)

বিয়ের পরে কারো বোন বা মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ি থেকে ফেরৎ আসতে বাধ্য হয়, সেই মেয়ে বা বোনের ব্যাপারে ব্যয় করাকে বলা হয়েছে সর্বোত্তম দান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন-তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলবো কি? তাহলো তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তখন তার জন্য উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে অতীব উত্তম সাদকা। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে। সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিভাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করেছে এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কোনো গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু' কন্যা হয়। তিনি জবাব দিলেন, যদি দু' কন্যা হয় তাহলেও এ সওয়াব পাওয়া যাবে। (আল-আদাবুল মাফরুজ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি মাত্র কন্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করতো, তাহলে তিনি একমাত্র কন্যার ব্যাপারেও সুসংবাদ প্রদান করতেন। (মিশকাত)

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি পুরোপুরি কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে নিশ্চিত জান্নাত লাভ করবেন। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক। পৃথিবীর কোনো আদর্শ বা তথাকথিত ধর্ম কন্যা সন্তানকে কোনোই মর্যাদা দেয়নি। কন্যা শয়তানের সঙ্গী, সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক, নরকের দরজা, কন্যা মানুষের মধ্যে গণ্য নয় ইত্যাদী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান একমাত্র ইসলামই বলেছে, কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দাস-দাসীকে, মহিলাকে বা পশুকে কোনদিন নিজের হাতে আঘাত করেননি। তিনি বাইরে থেকে যখন ঘরে আসতেন তখন তাকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখা যেত। তার মুখে যেন চাঁদের হাসির বন্যা বয়ে যেত।

হাদীসে আরেকটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার কাছে এক মহিলা দুইজন কন্যাসহ সাহায্যের জন্য এলো। সে সময় আমার কাছে একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। খেজুরটি আমি তার হাতে দিলাম। সে খেজুরটি অর্ধেক করে নিজের দু'কন্যাকে দিয়ে দিল, নিজে কিছু খেলো না। এরপর সে

www.pathagar.com

চলে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে এলেন তখন আমি এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিকেই এ কন্যার মাধ্যমে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। তাহলে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। (বোখারী, মুসলিম)

সন্তানের প্রতি মায়ের যে কত মমতা এটাই প্রকাশ পেয়েছে উল্লেখিত হাদীসে। মা অভুক্ত থেকে সন্তানকে খাওয়ায়। তবুও কন্যা সন্তান। যার কাছ থেকে পুত্র সন্তানের ন্যায় বিনিময় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ এই কন্যা সন্তানই পিতামাতাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে হেফাজত করবে-যদি সত্যিকারভাবে কন্যা সন্তানের অধিকার আদায় করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজের কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বলতেন, আমার দেহের একটি অংশ হলো ফাতিমা। যে তাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে। (বোখারী)

আল্লাহর নবী কন্যাদেরকে অত্যন্ত সম্মানও করতেন। বিয়ের পরে মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার সাথে যখনই দেখা করতে আসতেন, মেয়েকে দেখার সাথে সাথে তিনি মেয়ের সম্মানে মুখে মধুর হাসি টেনে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। মধুর সম্ভাষণে মেয়েকে সম্ভাষণ জানাতেন। মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে মেয়েকে নিজের জায়গায় বসাতেন। (আবু দাউদ)

কিন্তু আফসোস্ আল্লাহর নবীর এই শিক্ষা তার অনুসারীরা ভুলে গিয়েছে। মেয়েকে যতদ্রুত সম্ভব নিজের বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে মেয়ের অভিভাবক। বছরে মেয়েকে দু একবার দেখতে যাবার সময় হয় না তাদের। এ জন্য অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদিহী করতে হবে। মেয়ের চেহারা মলিন দেখলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাও মলিন হয়ে যেত। হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, একবার তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষন পর সেখান থেকে অত্যন্ত হাসিখুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন কন্যার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন হাসি খুশী অবস্থায় বের হলেন, ব্যাপার কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি উভয়ের মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিজের কাছাকাছি রাখার জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। হিজরতের পরে মদীনায় আল্লাহর রাসূল হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বেশ দূরে থাকতেন। তিনি একদিন মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে মেয়েকে জানালেন, মা! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকো। আমার মন চায় তোমাকে আমি আমার কাছাকাছি রাখি।

www.pathagar.com

হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতাকে বললেন, আব্বা! হারিছ ইবনে নোমানের বেশ কয়েকটি বাড়ী আছে। আপনি যদি তাকে একটি বাড়ীর কথা বলেন তাহলে সে অবশ্যই আপনার কথা রাখবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– মা! আমি তাকে এ কথা বলতে লজ্জা অনুভব করি।

এ কথা যে কোনোভাবেই হোক হযরত হারিছ ইবনে নোমানের কানে গেল। তিনি দেরী না করে দ্রুত আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম আপনি আপনার মেয়েকে আপনার অবস্থানের কাছাকাছি কোনো বাড়ীতে নিয়ে আসতে চান। হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার পবিত্র কদম মোবারকে উৎসর্গ হোক! আমার সমস্ত বাড়ী আপনার খেদমতে পেশ করলাম। যে বাড়ী আপনার ইচ্ছা, সেটা আপনি গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যে বস্তুই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবেন, সেটা আমার কাছে থাকার চেয়ে আপনার কাছে থাকা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি যথার্থ বলেছো। মহান আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত ও বরকত নাজিল করুন।

এরপর তিনি হযরত হারিছ ইবনে নোমানের একটি বাড়ী গ্রহণ করে সে বাড়ীতে কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে এলেন, এরপর থেকে তিনি সফরে যাবার সময় একে একে সবার সাথে সাক্ষাৎ করে সবশেষে কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে সফরে বের হতেন। সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে নফল নামায আদায় করে সর্বাগ্রে কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তারপর অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

সুতরাং কন্যা সন্তানকেও তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কোনো ব্যাপারেই কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞা করা যাবে না। তাদের তুলনায় পুত্রদের অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। কন্যা সন্তান যেন স্বাবলম্বী হতে পারে, এ জন্য তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করতে হবে। তবে সর্বপ্রথমে তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে এবং পিতামাতার কাছে এটা তাদের অধিকার। এই অধিকার আদায় না করলে আখিরাতের ময়দানে পিতামাতাকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততির বিয়ের অধিকার

সন্তানের প্রতি পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে বিয়ে দেয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো, তার ভালো নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে উপযুক্ত বয়সে পৌছে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেয়া। উপযুক্ত বয়সে পৌছার পর যদি সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং সন্তান কোনো গোনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে। (বায়হাকী)

সন্তান পুত্র-কন্যা যা-ই হোক, সে যখন উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয়, তখনই তার বিয়ের চিন্তা করা পিতামাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালন না করলে এক অশুভ পরিণতির সম্মুখিন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সন্তান-সন্ততির বিয়ের ব্যাপারে পিতামাতা অবশ্যই তাদের মতামত নেবে, কেননা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন কোনো সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয়-এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার। হঠাৎ করেই এ ধরনের চিরস্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি হতে যেমন পারে না আর হলেও তা টিকে থাকার নিশ্চয়তা নেই।

এ কারণে ইসলামের বিধান হলো কারো সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ পরস্পরে প্রস্তাব দিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। অথবা ছেলে বা মেয়েও তাদের নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবাব নামক এক সাহাবীর জন্য এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার কাছে পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মায়ের মতামত জেনে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে তার মত নেই বলে জানিয়ে দেয়।

কন্যা আড়াল থেকে পিতামাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন আল্লাহর রাসূলের কাছে বিষয়টি জানাতে যাবেন, এমন সময় মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন করো। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার কাছে তার মতামত যা গোপন ও অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

পিতামাতা বা অভিভাবকই শুধু পাত্র বা পাত্রী দেখে সন্তানের বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন না। কেননা দাম্পত্য সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে যার সাথে স্থাপন করা হবে, তাকে পরস্পর দেখে নেবে। এ ক্ষেত্রে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীকে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক পাত্র-পাত্রী পছন্দ করবে আর পাত্রী হয়ত পাত্রকে পছন্দ করবে না অথবা পাত্র পছন্দ করবে না এ সুযোগ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে

www.pathagar.com

তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।' এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্য আমি চেষ্টা চালাতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। এরপর তাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করি। (আহ্মাদ)

দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে মেয়েকে যেমন ছেলে দেখবে তেমনি দেখবে ছেলেকে-মেয়ে। ছেলে-মেয়ের যতদিক পছন্দ করবে অনুরূপভাবে মেয়েও ছেলের বিভিন্ন দিক পছন্দ বা অপছন্দ করবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কোনো কুৎসিৎ কদর্য চেহারার ছেলের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা মেয়ের দেহের যে সব অংশ একজন ছেলের নিকট আকর্ষণীয় অনুরূপভাবে একজন মেয়ের নিকটও একজন পুরুষের ঐ সব অংশ আকর্ষণীয়।

অতএব মেয়ে অবশ্যই দেখবে কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে তার বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের অমতে মেয়ের পছন্দের বাইরে তার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক তাকে বাধ্য করতে পারে না। মেয়ে তার বিয়ের পূর্বেই যার সাথে সে বিয়ে করবে, তার সমস্ত দিক দেখে জেনে বুঝেই বিয়ে করবে।

বিয়ের সময় পাত্রীর যে সমস্ত গুণাবলী দেখা জরুরী, তার মধ্যে পাত্রী ধার্মিক কি না সেটা দেখা সবথেকে বেশী জরুরী। পাত্রীর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলী অল্প মাত্রায় যদি থাকে আর সে পাত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তাকেই বিয়ে করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়। তার অর্থ-সম্পদ, তার বংশ গৌরব-সামাজিক মান-মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ করো।'

এই হাদীসের নির্দেশ হলো, দ্বীনদারীর গুণসম্পন্ন পাত্রী পাওয়া গেলে তাকেই যেন স্ত্রীরূপে বরণ করা হয়, তাকে বাদ দিয়ে অপর কোনো গুণসম্পন্ন মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। দ্বীনদার ও ধার্মিক মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। সদ্বংশজাত ও সুন্দরী রূপসী হওয়াও মেয়ের বিশেষ গুণ এবং এর যে কোনো একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়–গৌণ। চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদার হওয়ার গুণটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়ের সময় পাত্র আল্লাহভীরু পাত্রীকে বিয়ে করবে আর পাত্রী যে কোনো চরিত্রের পাত্রের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ইসলামের নির্দেশ তা নয়। বরং পাত্রীও অনুসন্ধান করবে দ্বীনদার পাত্রের। নারী যখন একজন পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হবে, তখন সে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না।

www.pathagar.com

কোরআন-হাদীসের অনুসরণ করে না। হালাল- হারামের পরোয়া করে না। যার চরিত্র বলতে কিছুই নেই এবং চিন্তা-চেতনা ইসলামী আদর্শের বিপরীত- এমন পুরুষের সাথে কোনো মুসলিম নারী কিছুতেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। পাত্রপক্ষ যেমন পাত্রী পক্ষের নানা ধরনের সৎ গুণাবলী চাইবে, অনুরূপ পাত্রী পক্ষ পাত্রের ঐ ধরনের গুণাবলীই চাইবে যে ধরনের গুণাবলী তারা পাত্রীর মধ্যে চায়। বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর প্রতি ইসলামের এটাই নির্দেশ এবং এই নির্দেশ পালন করা অত্যন্ত জরুরী।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি একত্রিত করবেন

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের গবেষকগণ তা ৯টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই উপদেশমালা হযরত লূকমান যে যুগে তাঁর সন্তানকে উপলক্ষ্য করে দিয়েছিলেন, কথাগুলো শুধুমাত্র সেই যুগের উপযোগীই নয়- এই উপদেশমালা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের সকল যুগের মানব সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। এই উপদেশ অনুসরণ করলে যেমন পূর্ণ মুসলিম হিসেবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যাবে এবং সফলতা ও কল্যাণ লাভ করা যাবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি বিনয়ী সমাজও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

যেসব কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলতা, অশান্তি, পরস্পরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-মারামারি সৃষ্টি হয় এবং সমাজকে কলুষিত করতে পারে, সেসব কারণ দূরীকরণে হযরত লূকমানের উপদেশ মূখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে মানবমন্ডলীকে অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন।

ইতোপূর্বে আমরা মহান আল্লাহর সাথে শিরক না করা সম্পর্কিত প্রথম উপদেশটি এবং আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতা ও সন্তানের অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে দ্বিতীয় উপদেশে যে কথাগুলো বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে উল্লেখ করেছেন, '(আর লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বললো) হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানার মতোও (ক্ষুদ্রও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতরে, আকাশে অথবা পৃথিবীতে কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা (হাশরের ময়দানে) বের করে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ অবশ্যই সুক্ষদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত আছেন।'

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে সরিষার উপমা দিয়েছেন। সরিষার উপমা হয়ত তিনি এ জন্যই দিয়ে থাকবেন যে, সে সময় পর্যন্ত মানুষের কাছে সরিষাই সবথেকে ক্ষুদ্র বস্তু বলে গণ্য হতো। দৃশ্যমান সরিষার থেকেও ক্ষুদ্র বা অদৃশ্যমান ক্ষুদ্র অনু-পরমাণুর বিষয়টি তখন পর্যন্ত হয়ত মানুষের জানা ছিলো না। তিনি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিষয়টি সন্তানের সম্মুখে এভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, অনু-পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র কোনো জিনিস, যা মানুষের পক্ষে এই চর্মচোখে দেখা সম্ভব নয় বা যা দেখতে কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়। এই ধরনের কোনো বস্তু যদি বিশাল বিস্তীর্ণ পাহাড়, সাগর-মহাসাগর, ঠিকানাহীন মরুপ্রান্তরের বালুকা রাশির মধ্যে অথবা মহাকাশের কোনো স্তরে পড়ে থাকে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে তার অবস্থান জানা মোটেও অসম্ভব নয়।

অদৃশ্য কোনো বস্তু নয়– দৃশ্যমান সরিষার একটি দানা যদি আটলান্টিক মহাসাগরে বা বিশাল মরুভূমির বালুকা রাশির মধ্যে অথবা আন্দেজ পর্বতমালার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, সরিষার এই দানাটি অক্ষত অবস্থায় খুঁজে বের করার মতো কোনো টেক্‌নোলজি বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ এ ধরনের বিষয় মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং মহান আল্লাহর কাছে তা খুবই সহজ।

কারণ দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কোনো বস্তু যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি, তেমনি তার অবস্থান তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নয়। যেখানে যা রয়েছে, মানুষ তা কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হোক বা না হোক, সবই আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি ইচ্ছা করার সাথে সাথে তা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে বাধ্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরত, ক্ষমতা, জ্ঞান ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা এই তাফসীরের 'তাওহীদের দ্বিতীয় পর্যায়' ও 'আল্লাহর অবস্থান ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপক ধারণা' শিরোণামে কোরআন থেকে আলোচনা করেছি।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কুদরতের বিষয়টি হযরত লুকমান তাঁর সন্তানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেই সাথে তিনি তাঁর সন্তানের দৃষ্টির সম্মুখে আদালতে আখিরাতের দৃশ্যও একজন নিপুণ শিল্পীর মতোই অঙ্কন করেছেন। শেষ বিচারের দৃশ্য এমন ভয়ঙ্করভাবে নিজ সন্তানের সামনে উপস্থাপন করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে সন্তানের কলিজা কেঁপে ওঠে এবং সে যেনো নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপরাধ থেকেও গুটিয়ে নেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে সে যেনো মহান আল্লাহর জানার ক্ষমতার বিষয়টি স্মরণে রাখে। অর্থাৎ মনের গহীনেও কল্পনার জগতেও যেনো কোনো ধরনের অপরাধ বৃত্তিকে প্রশ্রয় না দেয়।

হযরত লুকমানের দ্বিতীয় এই উপদেশের মধ্যেও শির্ক পরিহার ও তাওহীদের আকীদা অনুসারে জীবন পরিচালনার বিষয়টি জড়িত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যে এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার অংশীদার যে কেউ নেই, এই বিষয়টি তিনি সন্তানের মন-মানসিকতায় এভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহই হলেন মানুষের ইলাহ এবং তিনি অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জানার বাইরে কোনো কিছুই নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঘন তমসাবৃত রজনীতে বজ্রপাতের গগন বিদারী শব্দের মধ্যেও ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকা হেঁটে যাওয়ার শব্দও মহান আল্লাহর জানার বাইরে নয়। তাঁর এই অসীম ক্ষমতায় অন্য কারো সামান্যতম অংশ নেই। তিনি একাই যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এই বিশ্বাসই মানুষকে সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য অপরাধমূলক কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত রাখে এবং আদালতে আখিরাতে বিচারের দিনে অণু-পরমাণু পরিমাণ কাজ- তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেনো, তার পরিণাম ফল ভোগ করার অনিবার্যতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়মূল করে দেয়।

হযরত লুকমানও নিজের সন্তানের ব্যাপারে এই চেষ্টা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেক পিতাকেই নিজের সন্তানের মন-মস্তিষ্কে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। সন্তানের মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, তাঁর ভয় এবং আদালতে আখিরাতের ভয় দৃঢ়মূল করে দেয়াও পিতামাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নিজ নিজ সন্তানের ব্যাপারে এই দায়িত্ব যদি প্রত্যেক পিতামাতা পালন করতেন, তাহলে বর্তমানে সর্বত্র যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হতাশা, চুরি-ডাকাতী, ছিনতাই, হত্যা-রাহাজানী বহুলাংশে হ্রাস পেতো- সন্দেহ নেই।

পিতা সন্তানের সম্মুখে আখিরাতের বিচারালয়ের চিত্র উপস্থাপন করে তার মধ্যে আখিরাতে সকল কাজের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইতোপূর্বে আমরা তাফসীরে সাঈদীর অন্যান্য খন্ডে আখিরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ক্ষেত্রে এ কথা বলেছি যে, আখিরাতের বিষয়টি মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র কিছুতেই ভালো হতে পারে না এবং মানুষ অপরাধমুক্ত বা অপরাধের চিন্তামুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ সেই মানুষের মনে আদালতে আখিরাতের বিচারালয়ে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত না থাকে। এই অনুভূতি মানুষের মনে জাগ্রত করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে যেমন আখিরাতের বিষয়টি সবথেকে বেশী উল্লেখ করেছেন তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আখিরাতের বিষয় সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ একত্রিত করলে ত্রিশ পারা কোরআনের দশ পারার সমান হবে।

একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত ব্যাপক আলোচনা এ জন্যই করা হয়েছে যে, মানুষ যেনো পরকালে জবাবদিহির চেতনায় এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করে। অর্থাৎ মানুষ অপরাধমুক্ত থাকে এবং এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ-রাষ্ট্র। ঠিক এই লক্ষ্যেই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানের মনে আখিরাতের ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি সরিষার দানার সাথে তুলনা দিয়ে বলেছেন, তা যদি পাথর খন্ডের মধ্যেও লুকায়িত থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা তা বের করে আনবেন। এই ছোট্ট কথার মধ্য দিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় সন্তানের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথা পবিত্র কোরআনের আলোচনা সূচনাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কথা কোরআন অধ্যয়নকারী লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আমি তাকে সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলাম।'

এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত লোকদেরও আমরা দেখে থাকি যে, যথারীতি গুছিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে কোনো বিষয় শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারেন না। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প কথার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন না- প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, শ্রোতা মন্ডলী বিরক্ত বোধ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই এক মাহ্‌বুব বান্দা লূকমানকে এমন সুক্ষ্মজ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন, যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হতো, সেই কথাগুলোই তিনি খুবই ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের মধ্যে দিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, যা শ্রোতার মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথামালার মধ্যে কোনো বাহুল্য শব্দ বা ভাব নেই। প্রত্যেকটি শব্দই বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে এবং প্রত্যেক শব্দই শ্রোতার মন-মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

হযরত লূকমানকে দেয়া সুক্ষ্মজ্ঞানের বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে যেনো এ কথাই মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন– দেখো, আমি আমার বান্দা লূকমানকে অতি সামান্য জ্ঞান দিয়েছি এবং তোমরা তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করছো এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তাঁকে নিয়ে চর্চা করছো। এবার তোমরা সেই জ্ঞানদাতার অসীম জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো, তাঁর কি কোনো শরীক থাকতে পারে?

মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয়টি বছরের পর বছর ব্যাপী আলোচনা করলেও শেষ হবে না। অথচ এই বিশাল ও ব্যাপক কথাগুলোই হযরত লূকমান খুব ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে এভাবে প্রকাশ করলেন, 'হে আমার সন্তান! সরিষার থেকেও ক্ষুদ্র কোনো বস্তু যদি পাথরখন্ডে, আকাশ সাম্রাজ্যে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে, মহান আল্লাহ তা বের করে আনবেন।'

এই মহাবিশ্বের কোথায় কোন্ বস্তু অবস্থান করছে, তা সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালা জানেন– শুধু এই বিষয়টিই উক্ত কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়নি। বরং তাঁর ন্যায় বিচার ও ইনসাফ থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও বাদ পড়বে না, মানুষের ক্ষুদ্র কোনো কাজ– যা অন্যের চোখে পড়েনি। যার অস্তিত্ব মানুষের চোখে পড়ে না, যা দৃশ্যমান নয় এবং মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, থাকতে পারে তা মহাকাশের অগণিত গ্রহের কোনো এক স্তরে বা মাটির অতল তলদেশে। এমন ক্ষুদ্র বিষয়ের সাথে যদি কোনো মানুষ জড়িত থাকে, তাহলে তাকে আদালতে আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا-وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا-

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ পরিমাপ করার জন্য ন্যায়দন্ড স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার কণা পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তা-ও আমি সামনে আনবো। (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

www.pathagar.com

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি এমন পাথরের (ঘরে) মধ্যে অবস্থান করে কোনো কাজ করে, যার কোনো দরজা-জানালা নেই এবং কোনো ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'য়ালা তা মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন, সে কাজ ভালো-মন্দ যা-ই হোক। (ইবনে কাসীর)

মহাকাশের ঐ বিশাল শূন্যমার্গে, তারকাপুঞ্জ বা গ্রহের অভ্যন্তরে, মহাকর্ষের শূন্য বলয়ে, গভীর আগ্নেয় গিরির গহ্বরে, মহাসাগরের তলদেশে, মৃত্তিকার সর্বনিম্ন ভাগে, অগণিত পর্বত পরিবেষ্টিত পিপীলিকার ক্ষুদ্র কোনো গুহায় বা বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালুকা রাশির মধ্যে মানুষের বিন্দু পরিমাণ কোনো কর্মের স্পর্শ জড়িয়ে থাকে, এসব কিছুকেই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه–وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه–

যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও সৎকাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে এবং যে বক্তি বিন্দু পরিমাণও অসৎকাজ করেছে সে-ও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল-৭-৮)

হযরত লুকমান এভাবেই তাঁর সন্তানের মনে মহান আল্লাহ তা'য়ালার শক্তি, ক্ষমতা, অসীম জ্ঞান ও কুদরত সম্পর্কিত বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সাথে সন্তান যেনো আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়ে, সেই উপাদানও তিনি সরবরাহ করেছেন।

প্রকৃত অর্থে পিতামাতার কাছে সন্তানের যতগুলো অধিকার রয়েছে, এর মধ্যে সবথেকে বড় অধিকার হলো পিতামাতা সন্তানকে এমন সব উপাদানের ভিত্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিবেন, সন্তান যেনো আপন মনিব মহান আল্লাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে পারে এবং আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়তে পারে। এসব উপাদান সন্তান শুধুমাত্র পিতামাতার কাছ থেকেই লাভ করার অধিকারী নয়– সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে, তাদের কাছেও নতুন প্রজন্ম উল্লেখিত উপাদান লাভ করার অধিকারী।

এসব উপাদান লাভ করা থেকে বঞ্চিত নতুন প্রজন্ম অবশ্যই আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে না, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিকর পথেরই পথিক হবে। সূরা হামীম সিজ্‌দার ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতের দিন এরা যখন কৃত অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাবে তখন বলবে–

رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ–

হে আমাদের রব! সেইসব জিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

এই পৃথিবীতে নবজাতক যারা আসছে, তাদের হক শুধু মাত্র পিতামাতার প্রতিই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের কাছেই তাদের নানা ধরনের হক রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্তরে যারা নেতৃত্বের দায়িত্বে অবস্থান করছেন, তারা অবশ্যই শিশু-কিশোর ও তরুণ-যুবকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং এবং তাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থাসহ অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞান দান করবেন- এটা নতুন প্রজন্মের অধিকার। এই অধিকার পিতামাতাসহ অন্যরা যদি পালন না করেন, তাহলে ভুল পথ অবলম্বন করার কারণে নতুন প্রজন্ম যখন আখিরাতে গ্রেফতার হবে, তখন তারা মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে-

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ-رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লা'নত বর্ষণ করো। (সূরা আহ্‌যাব-৬৭-৬৮)

হযরত লুকমানের দ্বিতীয় উপদেশের শেষের কথাটি হলো, 'আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত।'

তিনি তার সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কুদরত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত।'

এই কথাটি স্বয়ং হযরত লূকমানের না আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, হযরত লূকমান আল্লাহ তা'য়ালার গুণ-বৈশিষ্ট্য সন্তানকে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে এই কথাটি বলেছেন। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক স্থানে এই কথা এবং এ কথার অনুরূপ অনেক কথাই বলেছেন।

মানুষ সাধারণত আল্লাহ তা'য়ালার শক্তি-মত্তা বা অসীম জ্ঞান এবং তাঁর সকল বিষয়ে অবগত থাকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেমন বলে থাকে, তিনি সুক্ষ্ম বিচার করে থাকেন, তিনি সবকিছুই দেখছেন, তাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন করা যাবে না।'

মূলত এসব কথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের মুখ-উচ্চারিত হলেও কথাগুলো কোরআনের এবং নবী-রাসূল ও কোরআন-হাদীস থেকেই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করেছে। আদালতে আখিরাতে মহান মালিক মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেরও হিসাব গ্রহণ করবেন, এই কথাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই শেষের কথায় রাব্বুল আলামীনের ঐ বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিই একমাত্র সুক্ষ্মদর্শী ইলাহ, রব, মা'বুদ- যিনি সকল বিষয়ে অবগত রয়েছেন। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি এক, একক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। সুতরাং দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করতে হবে, কেননা তিনিই একমাত্র দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব অর্পণ

হযরত লুকমান প্রথমে তাঁর সন্তানকে মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে অর্থাৎ তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা দিলেন। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দিলেন। এবার সেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য কি এবং পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কোন্ দায়িত্ব পালন করত হবে, সে ব্যাপারে তিনি বলছেন, 'হে পুত্র! নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। তোমার ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে ধৈর্য ধারণ করো, আর এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

উল্লেখিত আয়াতে তিনি তাঁর সন্তানকে নামায প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এরপর মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার কথা বলেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে মানুষকে নানামুখী বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করতে হয়, এসব বিপদ-মুসিবত এলে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন এবং সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সৎকাজের আদেশ-নিষেধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

নামায সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণই হলো নামায। মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে– এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নামাযই মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের উপযোগী করে প্রস্তুত করে। আল্লাহ্র দাসত্ব করতে হলে মানুষের মধ্যে যে ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকা প্রয়োজন, নামায তা মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে। মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নামাযের মাধ্যমে মানুষ সেই যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

রোগাক্রান্ত মানুষকে রোগমুক্ত করার কাজে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন, প্রথমে তাদেরকে রোগ ও কোন্ রোগের কোন্ ওষুধ– এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং চিকিৎকসার কাজে ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। যথারীতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরই চিকিৎসক মূল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, এই দায়িত্ব কোনো মানুষের পক্ষ থেকে অন্যান্য মানুষের প্রতি অর্পণ করা হয়নি।

বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর আদেশ এবং তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ধরনের গুণাবলী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, নামাযের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশিক্ষণই মানুষকে দেয়া হয়ে থাকে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন, তা কোরআন নির্দেশিত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত নামাযই মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

সরবরাহ করে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালন করতে হলে মানুষকে সর্বপ্রথমে চারটি গুণে গুণান্বিত হতে হয়। এ গুণসমূহ হলো, ঈমান, আমলে সালেহ্, হক-এর দাওয়াত এবং ধৈর্য অবলম্বন। মূলত এই চারটি গুণ অর্জন করা ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষেই পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ এবং সফলতা অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের ছোট্ট একটি সূরা– সূরা আসরে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাফসীরে সাঈদী–সূরা আল আসরের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বস্তুত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালনের ওপরই মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ নির্ভর করে। প্রত্যেক নবী-রাসূলই এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এই দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং তাঁরা অনুসারীদের এই প্রশিক্ষণই দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেই সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই নীতি অবলম্বন করাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বলে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের ললাট লিখন।

যে কারণে ইয়াহুদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহুদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহুদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহুদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ্-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটোই দান করেছিলেন। যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহান আল্লাহর ভাষায়—

إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ-

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুরমুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খানকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলামের সাধারণ বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

কোনো সরকারের প্রতিনিধিত্ব যিনি করেন, প্রথমে তাকে সেই সরকারের আনুগত্য করতে হয় এবং সরকারের কোন্ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তার সরকারের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। মানুষ মহান আল্লাহর খলীফা অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধি। মানুষ যার প্রতিনিধি এ জন্য তাকে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় জানতে হবে, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে। এরপর তাঁর আনুগত্য করতে হবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ- এই দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়টি স্মরণে রাখুন এবং হযরত লুকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে দেয়া উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিন। তিনিও সর্বপ্রথমে সন্তানের কাছে মহান আল্লাহর পরিচয় পেশ করেছেন (১৫ নং আয়াতে)। তারপর আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন (১৬ নং আয়াতে)। এরপর সেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলেছেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হলে প্রথমে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে হয়। আর নামাযই মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়। আপন সন্তানকে তিনি কঠিন দায়িত্ব পালন করার উপদেশ দেয়ার পূর্বে নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি সন্তানকে উপদেশে দিয়েছেন, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মানুষকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো (১৭ নং আয়াতে)।

যাঁর পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে সন্তানকে আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের অন্যতম শাখা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস- এই বিশ্বাস সন্তানের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে- অন্য কারো নয়, এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মানুষের চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দাস হিসেবে গড়ার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব পালনের উপযোগী হিসেবে তাকে গড়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যেই তিনি সন্তানকে নামায প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন।

যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা হয় এবং যিনি দায়িত্ব অর্পণ করেন, এই দুইজনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতেই হবে। নতুবা দায়িত্ব পালনকারী কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না। একদিকে তিনি সন্তানকে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' পালন করতে বলছেন, অপরদিকে দায়িত্ব যে আল্লাহ তা'য়ালা অর্পণ করেছেন, তাঁর সাথে নামাযের মাধ্যমে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

এই দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। মানুষ যখন কোনো কঠিন কাজ করতে অগ্রসর হয়, স্বাভাবিকভাবেই সে কঠিন কাজ সহজ করার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকের সাথে পরামর্শ করে সহজ পথ সম্পর্কে জেনে নেয়। এরপর কোনো শক্তিমান লোকের সাহায্য গ্রহণ করে কঠিন কাজ সমাধা করে।

মানুষ যে কঠিন দায়িত্ব পালন করবে, এই দায়িত্ব পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানার মাধ্যম এবং দায়িত্ব পালনকালে কোন্ শক্তিমান সত্তা তার পৃষ্ঠপোষক-বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে তার সাথে থাকবেন, এই বিষয়টি হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি প্রচন্ড ক্ষমতাবান, তাঁর এতই শক্তি ও ক্ষমতা যে, মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি গোচরে রয়েছে। অসীম তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান। সুতরাং তুমি যখন দায়িত্ব পালনকালে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তখন প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নিজেকে শক্তিহীন বা একা মনে করো না। মহাজ্ঞানী ও অসীম শক্তিশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার সাথে অবশ্যই রয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। সূরা লুকমানের ১৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও তাঁর সুক্ষ্মদর্শী হওয়া এবং যাবতীয় বিষয়ে তাঁর অবগত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে, পরোক্ষভাবে এই দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

স্রোতের বিপরীতেই বীরের সংগ্রাম

আলোচ্য সূরা লুকমানের ১৭ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার আদেশ পালন করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।' অপরদিকে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِى نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَالتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِى الظَّالِمِ وَلَتَاطِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বনী ইসরাঈল জাতি মহান আল্লাহর বিধান অমান্য করা শুরু করলো, তখন তাদের আলিম-ওলামা তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করলো না। এরপর তাদের আলিম-ওলামা (তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করে) তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে একত্রে সহবস্থান করতে থাকলো। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয় দলের অবস্থা এক করে দিলেন। (অর্থাৎ আলিমদের হৃদয়ও পাপীদের হৃদয়ের মত পঙ্কিল ও কালিমাময় হয়ে গেল)। আর তাদের এ পাপকার্য ও সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে অভিশম্পাত দিলেন।

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এই কথাগুলো আল্লাহর রাসূল হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বলছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন– না, (তোমাদেরকে বনী ইসরাঈলদের অনুরূপ হলে চলবে না।) আমি আল্লাহ তা'য়ালার শপথ করে বলছি, যার মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। আর তোমরা যালিমের বাহু ধরে তাকে হক কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে তোমাদের মন-মানসিকতাও আল্লাহ বিরোধিদের মনের অনুরূপ হয়ে যাবে। তারপর তোমরাও বনী ইসলাঈল জাতির মতো অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। (বায়হাকী, মিশকাত)।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى (رضى) عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে তাহলে সে যেন কথার মাধ্যমে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক নিষেধও করতে না পারে তাহলে যেন মনে মনে এই কাজ উচ্ছেদ করার চিন্তা করে। আর মনে মনে চিন্তা করাটা হলো ঈমানের সব চেয়ে দুর্বলতম লক্ষণ।

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ وَلَايُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا-(ابوداؤد)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিও আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَايَسْتَعِنَكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ-

হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং কল্যাণকর কাজের জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দিবে। অন্যথায় এক সামগ্রিক আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে নিকৃষ্টমত পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করবেন। এরপর তোমাদের সৎ লোকেরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

www.pathagar.com

এই আদেশ-সম্পর্কিত বিষয়টি পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করে মুসলমানদের সতর্ক ও সজাগ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত লক্ষণীয়। ইতোপূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, এই দায়িত্ব পালন করা মামুলী কোনো বিষয় নয় এবং এই দায়িত্ব যথারীতি পালনের মধ্যেই মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে। আর এই কাজে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে, তাদেরকে অবশ্যই সাহস ও বীরত্বের যে কোনো পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে হবে। ভীরু ও কাপুরষদের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। মানুষের চারিত্রিক সংশোধনের ও সমাজ-রাষ্ট্রকে সমস্যা মুক্তকরণের কাজ সাহসহীন ভীরু লোকদের পক্ষে পৃথিবীর কোনো দেশে বা কোনো যুগেই সম্ভব হয়নি।

যিনি যে আদর্শের অনুসারী, সেই আদর্শের রঙে মানবতাকে রঙিন দেখতে চাইলে বা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই রঙে রঙিন করতে চাইলে মামুলী ধরনের কর্মসূচী ও পন্থা অনুসরণ করে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আরাম-আয়েশের জিন্দেগীতে অভ্যস্ত বিলাসী-ভীরু লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। নেতৃত্বের আসন ভীরু-কাপুরষদের জন্য নয়- এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, অসীম সাহসী, ত্যাগী আর বীর পুরুষদেরকেই নেতৃত্বের আসন বার বার স্বাগত জানিয়েছে আর ভীরু-বিলাসী লোকদেরকে আস্তা কুড়োয় ছুড়ে দিয়েছে।

মুসলমানদেরকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে হবে এবং নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের উপযোগী করে গঠন করতে হবে। এরপর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে মানুষকে সৎকাজের আদেশ তথা ইসলাম যেসব কাজ করার আদেশ দিয়েছে, তা জারী করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে আইন-বিধান দিয়েছেন তা প্রশাসনিক শক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর ইসলাম যেসব কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং এই নিষেধাজ্ঞাও প্রশাসনিক পন্থায় বাস্তবায়িত করতে হবে।

এটাই হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং এই দায়িত্ব পালন করা আর না করার মধ্যেই মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে আর এই দায়িত্বের বিষয়টিই হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে আগত সন্তানদের তাদের অভিভাবকদের কাছে এটা তাদের মৌলিক অধিকার যে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অভিভাবকগণ সজাগ-সচেতন করবেন।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত দেশ ও মুসলিম পরিচিতির অধিকারী মানুষগুলো সর্বত্র সন্দেহ-সংশয়, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পাত্রে পরিণত হয়েছে। মুসলিম পরিচিতি বহন করে প্রত্যেক দিন যেসব শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তারা যেনো অমুসলিমদের অস্ত্রের খোরাক হিসেবেই পৃথিবীতে আগমন করছে। প্রত্যেক দিন ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় মুসলিম নামে পরিচিত মানুষের লাশের মিছিল প্রদর্শিত হচ্ছে। নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম অত্যাচার ভোগ এদের যেনো ললাটের লিখনে পরিণত হয়েছে। অমুসলিম দেশসমূহের বিমান বন্দরে কারো মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি অথবা পাসপোর্টে মুসলিম নামের গন্ধ পেলেই তাকে

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী সন্দেহে অপমান করা হচ্ছে। মুসলমানদের এই অবস্থার একমাত্র কারণই হলো, তারা নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে রেখেছে।

মহান আল্লাহর অসীম রহমত যে, তিনি তাঁর এই গোলামকে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে কোরআনের আহ্বান পৌছানোর সুযোগ দিয়েছেন– আল হাম্‌দু লিল্লাহ্। দেশ-বিদেশে সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদের আসীন হওয়া প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন করে থাকেন। এসব প্রশ্ন শুধু আমার সম্মুখেই উত্থাপন করা হয়নি। ইসলামকে একটি জীবন বিধান হিসেবে পাবার আশায় যারাই নিজেদের কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন এবং তৎপরতা চালিয়েছেন, তাঁদেরকে প্রত্যেক যুগেই অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইসলামের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবল স্রোত দেখে একশ্রেণীর মুসলিম পরিচিতির অধিকারী লোকজন যেসব প্রশ্ন করেন এবং পরম শুভাকাংখীর মতো পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার সমষ্টি হলো– আপনি ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব?

সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রচন্ড ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং কর্তৃত্ব করছে। এই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করছে, তারাই বর্তমান পৃথিবীতে উন্নতি আর প্রগতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছে। এরা অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নীতি নৈতিকতার বন্ধন মানে না। পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বন্ধন মানে না। ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রেও কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নয়। আবহমান কাল ধরে যেসব প্রথা চলে আসছে, তারা তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

যেসব বিষয় ছিলো মানুষের একান্ত গোপনীয়, তা তারা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত করছে এবং এই পথ অনুসরণ করেই তারা পৃথিবীব্যাপী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। অপরদিকে মুসলমানদের শক্তি-মত্তা বলতে কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই এবং তারা রণক্লান্ত সৈনিকের মতোই পর্যুদস্ত। আপনারা কোরআনের বিধান অনুসরণের কথা বলেন, কিন্তু কোরআনের বিধান কি বর্তমান যুগে অনুসরণ করা সম্ভব?

সারা দুনিয়া ব্যাপী পুঁজিবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক শক্তি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়ে মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগকে পরিবেষ্টন করেছে। পুঁজিবাদী পশ্চিমা সভ্যতা-যাকে আপনার মতো ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বগণ নোংরা সভ্যতা নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এই পশ্চিমা সভ্যতাই মুসলমানদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব বলয় থেকে কোনো একটি মুসলিম পরিবারও মুক্ত নেই এবং মুক্ত থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যেই উন্নতি নিহিত। আমরা যদি কোরআন প্রদর্শিত পথের কথা বলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এড়িয়ে

www.pathagar.com

যেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাবো। জীবনের গতিপথ প্রত্যেক যুগে একই পথে প্রবাহিত হয় না। যুগের বাতাসে তা পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তিত পথেই উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা মুসলমানরা যদি নিজেদেরকে অপরাপর জাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে অক্ষম হই, তাহলে আমরা সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে যাবো। কারণ আমাদের সেই শক্তি-সামর্থ নেই, যা দিয়ে আমরা অপরাপর জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম। বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ডের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অমুসলিম হিসেবে পরিচিত উন্নত জাতিসমূহ তাই অনুসরণ করে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে আমাদেরকেও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, আর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হলে পুরনো প্রথা-পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে অন্যান্য জাতির দাস হিসেবে টিকে থাকতে হবে। ইসলাম যেসব বিধি-বিধান দিয়েছে, তার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যত-সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা যথাস্থানে রেখে যতটুকু অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা ঢেলে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণ।'

উল্লেখিত কথাগুলো যারা বলে থাকেন, তারাও নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে এমন ভাব ও ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেন, শুনে মনে হবে তারা মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় অস্থিরতার মধ্যে রয়েছেন। এই ধরনের কথা শুধু বর্তমান যুগেই আসছে না, অতীতে প্রত্যেক যুগেই দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের সামনে এসেছে এমনকি নবী-রাসূলদের সম্মুখেও একশ্রেণীর লোকজন কল্যাণকামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'কিছু দাও এবং কিছু নাও Give and take' ধরনের প্রস্তাব পেশ করেছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা কাফিরুন এ ধরনের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা কাফিরুনের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই ধরনের প্রশ্ন ও প্রস্তাব এবং শুভাকাংখী দলের অস্তিত্ব অতীতেও মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের মধ্যে ছিলো এবং বর্তমানেও যেমন রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদের প্রশ্ন ও প্রস্তাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি– পরিবর্তন যা হয়েছে তা ভাষাগত ও চেহারার।

নবী-রাসূলদের সম্মুখেও ঐ একই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, 'বর্তমান পৃথিবীতে যে বাতাস বইছে, তুমি তো সেই বাতাসের গতি পরিবর্তন করতে চাও। তোমার শক্তি-সামর্থ বলতে কিছুই নেই, তুমি কিভাবে যুগের বাতাসের গতি পরিবর্তন করবে? বরং তুমি তোমার আদর্শকে যুগের বাতাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে নাও।'

এ প্রস্তাব শুধু নবী-রাসূলের সম্মুখেই উত্থাপিত হয়নি। নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে পরবর্তীতে যারাই সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের কাছেই এই প্রস্তাব নানা আঙ্গিকে দেয়া হয়েছে। ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও লোভ-লালসা দেখানো হয়েছে। মূলনামের পূর্বে আলিম বা মাওলানা

www.pathagar.com

বিশেষণধারী লোকদের মধ্যে যারাই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাদের নামের পূর্বে প্রগতিশীল, উদার, নরমপন্থী ইত্যাদি বিশেষণ জুড়ে দিয়ে তাদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

আর যেসব মর্দে মুজাহিদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের সাথে সামান্যতম আপোষে রাজী হননি, তাঁদের নামের পূর্বে কট্টরপন্থী, মৌলবাদী, পশ্চাৎপন্থী ও সন্ত্রাসী বিশেষণ জুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁদেরকে ঘৃণা আর অবহেলার পাত্রে পরিণত করার যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কোনো দিক গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজিয়ে যেসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে টিকে থাকতে চান বা উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি সেই পুরনো কথাগুলোই উচ্চারণ করতে চাই– যে কথাগুলো প্রত্যেক যুগেই ইসলামের মর্দে মুজাহিদগণ বাতিল শক্তির ক্রীড়ণকদের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছেন।

আল্লাহর বিধানকে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে ঢেলে সাজিয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তারা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে কেনো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার এই কষ্ট স্বীকার করতে চান? বরং যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজাতে চান, তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যান। পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হলে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে যদি বিশ্বাসই করে থাকেন, তাহলে নিজেদের নামের সাথে মুসলিম গন্ধ জড়িয়ে রাখতে কে আপনাদেরকে বাধ্য করেছে?

মানব রচিত বিধান বা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই যারা প্রগতি ও উন্নতির একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাস করেন এবং এর আলোকেই ইসলামকে ঢেলে নতুন রূপ দিয়ে মডার্ণ ইসলাম বানাতে চান, এদের মতো শত কোটি মুসলিম (?) ইসলামের কোনোই প্রয়োজন নেই, বরং এদের গায়ে ইসলামের গন্ধ থাকলেই ইসলাম ও মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে সবথেকে বেশী। ইসলামের এমন দুর্দিন আসেনি যে, ইসলাম এদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে চাই, আল্লাহর বিধান অন্য কোনো বিধানের অধীনে নিজেকে অস্তিত্বশীল রাখতে বা অন্য বিধানের অনুগ্রহ কুড়াতে অথবা অন্য বিধানের সাথে আপোষ করে টিকে থাকার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়নি।

বর্তমানে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যেই উন্নতি নিহিত এবং আমরা যদি কোরআন প্রদর্শিত পথের কথা বলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এড়িয়ে যেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাবো– শুভাকাংখীর ছদ্মাবরণে যারা এই পরামর্শ দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথা হলো, কেউ তো

www.pathagar.com

আপনাদেরকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরেনি, কেনো আপনারা মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন না? এই আদর্শ সর্বাগ্রে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে উন্নতি ও প্রগতির ঘোড়া কত দ্রুত ছুটে তা দেখিয়ে দিন না?

জীবনের গতিপথ প্রত্যেক যুগে একই পথে প্রবাহিত হয় না, যুগের বাতাসে তা পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তিত পথেই উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয়- মুসলিম মিল্লাতকে যারা এই নসিহত করছেন, তারা রঙহীন পরিবর্তনশীল এবং মৌলিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। শকুন যতোই উপরে উঠুক না কেনো তার চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে। এসব লোকের স্বভাবও শকুনের অনুরূপ, উত্তম মূল্যবোধে এরা সন্তুষ্ট নয়। নোংরা আবর্জনায় নিমজ্জিত থাকার মধ্যেই এরা তৃপ্তি অনুভব করে।

প্রত্যেক যুগে মানবতা বিধ্বংসী নোংরা সভ্যতার প্রচলন ঘটবে আর ঐসব লোক জীবনের গতিপথ ঐ সভ্যতার নোংরা পথের দিকেই ঘুরিয়ে দেবে। স্থায়ী এবং মৌলিক মূল্যবোধে এরা বিশ্বাসী নয়। বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয়, এসব লোক সেদিকেই ছুটতে থাকে অর্থাৎ এরা আল্লাহর গোলামী পছন্দ করে না, এরা বাতাসের দাসত্ব করে।

পশ্চিমা দেশগুলোয় নারীদের পোষাক সংক্ষিপ্ত হতে হতে নগ্নতার সর্বশেষ স্তরে এসে নেমেছে। এরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগ্রহে নিজেদের স্ত্রী-কন্যাদের পোষাক সংক্ষিপ্ত করে দেহের মধ্যভাগে এক টুকরো আর নিম্নাঞ্চলে আরেক টুকরো ন্যাকড়া জড়িয়ে পথে, মার্কেটে ও ক্লাব-পার্টিতে ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতায় মদ্যপান দোষের কিছু নয়- এরাও মদ্যপানকে আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ যদি পরিপূর্ণ নগ্ন হওয়াকেই আভিজাত্য বলে ফতোয়া দেয়, এরাও সাথে সাথে সে ফতোয়া বাস্তবায়ন করবে। এদের কাছে হালাল-হারামের একমাত্র মানদন্ড হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। সেখানে যা বৈধ-অবৈধ, এদের কাছেও তাই বৈধ-অবৈধ। পাশ্চাত্যের বিপণী কেন্দ্রসমূহে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নানা পদার্থের তৈরী মূর্তির গায়ে পণ্য ঝুলিয়ে রাখে। এরাও নিজ নিজ দেশের বিপণী কেন্দ্রে মূর্তি স্থাপন করে মূর্তিকে বস্ত্র আর অলঙ্কারে সাজিয়ে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করার পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

এ জন্য আমি বিভিন্ন স্থানে বলে থাকি, মুসলিম নামে পরিচিত এসব দেশ আল্লাহ না করুন- কখনো যদি প্রবল ভূমিকম্পে মাটির তলায় ধ্বসে যায়, আর কয়েক শতাব্দি পরে নৃতত্ত্ববিদগণ খনন কাজের মাধ্যমে যখন এসব দেশ আবিষ্কার করবে, তখন তাদের পক্ষে এসব দেশের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মূর্তির সমারোহ দেখে তারা ধারণা করতে বাধ্য হবে যে, এসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মূর্তি পূজারী ছিলো। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশসমূহের ইতিহাস তারা যদি পাঠ করে থাকে যে, এসব দেশ মুসলিম দেশ ছিলো। তখন তারা নতুন ইতিহাস রচনা করবে এভাবে, এসব দেশ অমুসলিম দেশ ছিলো এবং তাদের রচনার সপক্ষে তারা মূর্তিসমূহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

www.pathagar.com

এসব লোক পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং যখন যেভাবে পরিবর্তন হয়, সেভাবেই নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে ইচ্ছুক। বর্তমান পৃথিবীতে সাদা চামড়া ওয়ালাদের আবিষ্কৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন রয়েছে। পরিবর্তনে বিশ্বাসী ও যুগের বাতাসের অনুসারী লোকগুলো সাদা চামড়া ওয়ালাদের আবিষ্কৃত সভ্যতাই অনুসরণ করছে। আগামী কাল যদি আফ্রিকার নিগ্রোদের আবিষ্কৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়, তাহলে এসব লোক নিজেদেরকে কালো রঙে আবৃত করে নিগ্রোদের সভ্যতাই অনুসরণ করবে, নিগ্রোরা যে ফতোয়া দেবে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। আবার ভারতীয় টিকি ও পৈতাধারী ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হলে, এরাও টিকি ও পৈতার অনুসারী হতে সামান্যতম লজ্জাবোধ করবে না।

নসিহত করা হচ্ছে– বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ডের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অমুসলিম হিসেবে পরিচিত উন্নত জাতিসমূহ তাই অনুসরণ করে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে আমাদেরকেও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

এই নসিহতের বিপরীতে আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, এই পৃথিবীতে যারা সুসভ্য, সুস্থ সংস্কৃতির অনুসারী, নম্র-ভদ্র ও সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত, মানবতাকে যারা উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন করার মহৎ কাজে লিপ্ত, পৃথিবীময় শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অকুতোভয়, তাদেরকেই হেয়-প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার লেবেল তাদের গায়ে এঁটে দেয়া হচ্ছে, তাদের ছবি নানা ধরনের মিডিয়ায় বার বার প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এভাবেই মানবতার দুশমনরা মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড পরিবর্তন করেছে। আমাদেরকেও কি এই ঘৃণ্য নীতি অবলম্বন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্ব করতে হবে?

আপসোস, এই পৃথিবীতে যারা শান্তির শ্বেত কবুতর ওড়ানোর জন্য নিজেদেরকে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রেখে দরিদ্রতা আর দুঃখ-কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে, পশ্চিমা মূল্যবোধ আর ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড তাদেরকেই অশান্তি আর বিপর্যয়ের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করছে। আর যারা সন্ত্রাসী, বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, শান্তির শ্বেত কবুতরকে যারা নিষ্ঠুর হাতে নির্মম পন্থায় হত্যা করছে, মানুষের ওপরে জুলুম অত্যাচারের রোলার চালিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকেই শান্তির দুত হিসেবে পরিচিত করে নানা ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার আবিষ্কৃত ন্যায়-অন্যায়ের এই ঘৃণ্য মানদন্ডই কি আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে?

এই নসিহত যারা করছে তারা রঙহীন এবং এই ধরনের রঙহীন, পরিবর্তনশীল, দাসসুলভ মন-মানসিকতা সম্পন্ন লোকগুলোই প্রত্যেক যুগে মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের সম্মুখে নানা যুক্তি দিয়ে এই পরামর্শই দিয়েছে যে, আল্লাহর বিধানকে যুগের রঙে রঙিন না করলে উন্নতি আর প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। এসব লোক স্পষ্টতই

www.pathagar.com

মুনাফিক এবং মুনাফিক গোষ্ঠীর ইতিহাস হলো, এরা প্রত্যেক যুগেই ইসলামের দুশমনদের অনুগ্রহ কুড়ানোয় নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। নবী-রাসূলদের সমকালীন ইতিহাস এ কথাই বলে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন ইতিহাস ও নিকট অতীতের মুসলমানদের ইতিহাসও এ কথার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বালাকোটের ইতিহাস এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসও এই মুনাফিকদের ঘৃণ্য তৎপরতায় কলঙ্কিত হয়েছে। বর্তমানেও মুসলিম দেশগুলোকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে এবং মুসলিম দেশে অমুসলিম শক্তির আগ্রাসন চালানোর ক্ষেত্রও এরাই প্রস্তুত করেছে এবং করছে।

আল্লাহর বিধানকে এরা সবসময় নিজেদের জন্য 'কারাগার'-এর অনুরূপ মনে করেছে এবং এ জন্যই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে আল্লাহর বিধানকে মসজিদ ও মাদ্রাসার চার দেয়ালে বন্দী করার কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এসব লোকের আবদার এবং তৎপরতার কারণে অতীতেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেমে থাকেনি, বর্তমানেও থেমে নেই এবং ভবিষ্যতেও থেমে থাকবে না- ইন্শাআল্লাহ। দৃঢ় মনোভাব, অসীম সাহস ও অকুতোভয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে, যে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন এবং হযরত লুকমানও তাঁর সন্তানকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার আদেশ পালন করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (১৭ নং আয়াত)।'

এই দায়িত্ব ঐসব লোকদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়- যারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী, রঙহীন, ভীরু-কাপুরুষ এবং যুগের বাতাসে ভেসে বেড়ানোয় অভ্যস্ত। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার সংশোধন ও সংস্কারের জন্য যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা রঙহীন, পরিবর্তনে বিশ্বাসী ও ভীরু-কাপুরুষদের জন্য অবতীর্ণ করেননি। ভিন্ন জাতির গোলামী বা দাসত্ব করার মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের জন্যও কোরআনের বিধান পৃথিবীতে আসেনি। যুগের বাতাসে যারা জীবনের গতিপথ পরিবর্তনে অভ্যস্ত তাদের জন্যও আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

যারা মৌলিকত্বে বিশ্বাসী, আপোষহীন, দুঃসাহসী, অকুতোভয়, নির্ভীক, দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বিধান অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর বিধানকে যারা নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও নিজের প্রাণের তুলনায় অধিক প্রিয় মনে করে, যারা যুগের বাতাসের গতিপথকে নিজের আদর্শের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, নিজের প্রিয় আদর্শের রঙে যারা সারা দুনিয়াকে রাঙানোর দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে তাদের জন্যই পবিত্র কোরআনের বিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রাম করতে গিয়ে যারা ফাঁসির মঞ্চকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বার মনে করে, কারাগারকে যারা বিশ্রামস্থল মনে করে, দুশমনের মারণাস্ত্রের আঘাতকে যারা সুগন্ধযুক্ত ফুলের ছোঁয়ার অনুরূপ মনে করে, পৃথিবীর জীবনে যারা সাফল্য ও ব্যর্থতার তোয়াক্কা না করে যে কোনো ক্ষতিকেই হাসি মুখে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, আল্লাহর বিধান তাঁদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর জীবনের চাকচিক্যকে যারা প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর বিধান পরিত্যাগকারী নগ্ন সভ্যতার অনুসারীদেরকে যারা সাফল্যের উচ্চমার্গে আরোহণকারী বলে মনে করে, তাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, যে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে স্রোত ও যুগের বাতাসের বিপরীতেই অবস্থান নিতে হয়। যাবতীয় ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসাকে জয় করতে হয় এবং যে কোনো প্রকার ক্ষতিকে স্বাগত জানানোর দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করতে হয়।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ- এই দায়িত্ব পালনে যারাই অগ্রসর হয়েছে, নানামুখী প্রচন্ড বাধা-বিপত্তি তাদের পথরোধ করেছে। এই দায়িত্ব পালনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়- সম্পূর্ণ কন্টাকীর্ণ এবং দুর্গম। এই দুর্গম পথ যারা পাড়ি দেয়ার মতো হিম্মত রাখে তাদের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। হযরত লূকমান তাঁর সন্তানের মধ্যে এই হিম্মত সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই বলেছিলেন, 'হে আমার সন্তান! নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। তোমার ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে ধৈর্য ধারণ করো, আর এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

পিতামাতার কাছে সন্তানের এটা অধিকার যে, সন্তানের মধ্যে বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং সাহসী ও নির্ভীক হিসেবে গড়ে তুলবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শিক্ষা দিবে, স্বৈরাচারী জালিমের সম্মুখে তারা যেনো নির্ভীক কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ করতে পারে, এমন শিক্ষা দিবে। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা ও ভীরুতা যেনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে পিতামাতা লক্ষ্য রাখবে। সন্তান যেনো বিলাসী ও আরাম প্রিয় না হয়, বরং কষ্ট সহিষ্ণু ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে যে কোনো বিপদ-মুসিবতের সম্মুখে দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারে, সেই শিক্ষায় সন্তানকে গড়ে তুলবে।

www.pathagar.com

অহঙ্কার বশে কাউকে অবজ্ঞা করোনা

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীর বুকে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না, কারণ আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।'

কোনো কোনো মুফাস্‌সীর এই আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ করেছেন, 'আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না।' কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। এই দুই অনুবাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। দুটো অনুবাদের সারমর্ম বা ভাবার্থ ও তাফসীর একই। হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে অহঙ্কার এবং উদ্ধত স্বভাব পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে উদ্ধত স্বভাব প্রথমে সৃষ্টি হয় না। মূলত অহঙ্কারই উদ্ধত স্বভাবের স্রষ্টা। অহঙ্কার ছাই চাপা আগুনের মতোই, অহঙ্কার যার হৃদয়ে লুকায়িত রয়েছে, তার স্বভাবে তা প্রকাশ পাবেই। মানুষের সামনে হাঁটা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় অহঙ্কার তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সূরা লূকমানের ১৮ নং আয়াতে صعر 'সা'আর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত উটের ঘাড়ে এমন এক রোগের সৃষ্টি হয়, যে রোগে উটের ঘাড়ের পেশীসমূহ আক্রান্ত হয়। ফলে উট তার ঘাড় সোজা রাখতে পারে না- একদিকে বাঁকা করে রাখে। অহঙ্কারী লোকগুলো নিজেদের ঘাড় রোগগ্রস্ত উটের মতোই বাঁকা করে বিষয়টি এমন নয়।

ভদ্রতা ও নমনীয়তাকে 'সোজা বা সহজ-সরল' শিষ্টাচার হিসেবেই আবহমান কাল ধরে মানব সমাজ চিহ্নিত করে আসছে। আর অহঙ্কারকে 'বক্র বা বাঁকা' স্বভাব হিসেবেই নিন্দিত করে আসছে। আর কেউ যখন অন্য কাউকে ছোট জ্ঞান করে, অবজ্ঞা বা অবহেলার পাত্র মনে করে, তখন তার দিকে ভদ্রতা ও নমনীয়তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কথা বলে না, তার কথায় মনোযোগ দেয় না বা তাকে কোনো গুরুত্বই দেয় না। এই অর্থেই বলা হয়েছে, কাউকে অবজ্ঞা করে বা কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না।

মানুষ যেসব কারণে অহঙ্কার নামক ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয়, তার কতকগুলো হলো, ধন-ঐশ্বর্য্য, রূপ-সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পদ ইত্যাদির কারণে। এসব জিনিস স্বয়ং খারাপ কোনো জিনিস নয়, বরং প্রশংসনীয় বস্তু এবং গুণ। কিন্তু মানুষ যখন এসব প্রশংসনীয় বস্তু ও গুণ-বৈশিষ্ট্য লাভ করে নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করে, তখনই সে মানুষ গৌরব আর অহঙ্কারের মতো নিন্দনীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে আর একেই বলে আত্মম্ভরিতা।

এই অহঙ্কারের ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো সর্বপ্রথম ইবলিস শয়তান। এই শয়তানই সর্বপ্রথমে নিজেকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ অমান্য করেছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত

www.pathagar.com

আদমের সম্মুখে অবনত হওয়ার আদেশ দেয়ার পরে উপস্থিত ফেরেশ্‌তাগণ সে আদেশ তৎক্ষণাত মান্য করলো কিন্তু ইবলিস অমান্য করলো। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে প্রশ্ন করলেন-

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ-

আমি যখন অবনত হওয়ার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে আমার আদেশ পালনে বিরত রাখলো? (সূরা আ'রাফ-১২)

ইবলিস নিজের অন্তরে যে ভাব পোষণ করতো তাহলো, সে আদমের থেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। এই ভাব সে গোপন রাখলো না বরং এভাবে জানিয়ে দিলো-

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ-

আমি তার থেকে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে করেছো মাটি থেকে। (সূরা আ'রাফ-১২)

'আমি তার থেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ' নিজের সম্পর্কে এই ধারণাই অহঙ্কার উৎপাদনের মূল কারখানা। তার তুলনায় আমি ধনী, আমার শক্তি-সামর্থ বেশী, রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী, ক্ষমতার মসনদ আমার হাতে, আমি যা খুশী তাই করতে পারি। আমি অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছি। অমুক অমুক ভাষায় আমি পারদর্শী, অমুক বিষয়ে সকলের তুলনায় আমিই শ্রেষ্ঠ, দেশের অধিকাংশ মানুষ আমার ভক্ত এবং সকলের ওপরে আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রিয়াশীল। এই মনোভাব এবং এর বাহ্যিক প্রকাশই শয়তানের গুণ এবং এই ঘৃণ্য গুণই মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহঙ্কার সহ্য করেন না। ইবলিসের অহঙ্কারও তিনি বরদাস্ত করেননি। ইবলিসের কথা ও স্বভাবে অহঙ্কার প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ক্রোধান্বিত ভাষায় আদেশ দিয়েছিলেন-

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ-

বললেন, এখান থেকে তুই দুর হয়ে যা, তুই নিচে নেমে যা। এখানে অবস্থান করে অহঙ্কার আর গৌরব দেখানোর তোর কোনোই অধিকার নেই। বের হয়ে যা, তুই মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান আর লাঞ্ছনাই কামনা করে। (সূরা আ'রাফ-১৩)

'তুই মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান আর লাঞ্ছনাই কামনা করে' ইবলিসকে বলা মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই কথাটিই অহঙ্কার আর গৌরব প্রকাশের অশুভ পরিণতি কি হতে পারে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা যেসব অহঙ্কারী লোকের পদভারে প্রকম্পিত হয়েছে, তারা আজ কোথায়? দেহের অস্থি-মজ্জা গোস্ত ধূলি কণায় মিশে গিয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে ইতিহাস তাদের নাম উচ্চারণ করলেও তা ঘৃণাভরেই উচ্চারণ করেছে। কেউ বলেছে, আমরাই সর্বশক্তিমান, আমাদের তুলনায় আর কেউ শক্তিশালী নেই,

www.pathagar.com

আমরাই এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার কেউ নেই, মিসরের নদীসমূহ আমার আদেশেই প্রবাহিত হয়, আমিই জীবন-মৃত্যুর মালিক, আমার শক্তি এত বেশী যে, আমি তোমাদের বন্দী করে কারাগারে পচিয়ে মারবো। সারা দুনিয়ায় আমরা রাজত্ব করবো, অন্য সকলে হবে আমাদের আজ্ঞাবহ, দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ও স্তরে একমাত্র আমার দলই কর্তৃত্ব করবে, দেশে একমাত্র আমার দলই সক্রিয় থাকবে অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব সহ্য করা হবে না। সর্বত্র একমাত্র আমার কণ্ঠই উচ্চকিত হবে, অন্য কারো কণ্ঠ বরদাস্ত করা হবে না, আমার দেশের প্রয়োজনে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই আমরা হামলা চালাবো- এ ধরনের দম্ভোক্তি ইতিহাস অতীতে যেমন বারবার শুনেছে, বর্তমানেও শুনছে।

দম্ভ আর অহঙ্কারী লোকদের করুণ পরিণতিও ইতিহাস বার বার দেখেছে। মূলত দম্ভ আর অহঙ্কারের শেষ গন্তব্য স্থল হলো অপমান আর লাঞ্ছনা। অহঙ্কারী লোকগুলো পরিশেষে অপমান আর লাঞ্ছনামূলক অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফেরাউনকে সলীল সমাধি বরণ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। নমরূদকে জুতা পেটা খেয়ে লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রত্যেক যুগে যেসব ছোট বড় নমরূদ-ফেরাউন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গজিয়েছে, তারাও লাঞ্ছনামূলক জীবনে পৌছে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানেও যারা নমরূদ-ফেরাউনের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে, তারাও অপমান আর লাঞ্ছনার দিকেই দ্রুত বেগে ধাবিত হচ্ছে।

অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং মহাসত্য অনুধাবনে প্রত্যেক যুগেই প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। নবী-রাসূলদের সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর যে এলাকাতেই নবী-রাসূলগণ দ্বীনি আন্দোলনের সূচনা করে সেদিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই এলাকার অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো তাঁদের সাথে সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেছে।

কারণ তারা ধারণা করেছে, নবী-রাসূল হবে সমাজ বা দেশের সবথেকে অর্থ-বিত্তবান ও প্রভাবশালী ক্ষমতাবান লোকদের মধ্য থেকে কেউ একজন। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যার কথা সকলে মানতে বাধ্য হবে এবং সকলেই তার অনুসরণ করবে।

বিষয়টি হয়েছে তার বিপরীত, কারণ দুই একজন ব্যতীত অধিকাংশ নবী-রাসূলকেই আল্লাহ তা'য়ালা চয়ন করেছেন সমাজের সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে। কেউ কৃষিনির্ভর ছিলেন, ছাগল চরিয়েছেন, কেউ কেউ নানা ধরনের হস্তশিল্পী ছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একেবারেই ইয়াতিম। এসব বাহ্যিক দরিদ্রতার কারণে অহঙ্কারী লোকগুলো তাঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলেছে, 'আল্লাহ বুঝি নবী-রাসূল বানানোর মতো অন্য কোনো লোক খুঁজে পাননি, তোমাদের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন দরিদ্র লোককে নবী বানিয়ে আমাদেরকে হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছে?'

www.pathagar.com

অহঙ্কার এভাবেই তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতিকে মহাসত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন সে জাতির অর্থ-বিত্তবান, প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকগুলো বিদ্রূপ করে তাঁকে বললো, ধন-দৌলত, জাঁক-জমক, দাস, দাসী, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আমরা। নেতৃত্বের আসনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে। তোমার অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নেই। তুমি নিজেকে কিভাবে নবী বলে দাবী করো? তুমি কোন্ দিক থেকে আমাদের তুলনায় উন্নত? পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَقَالَ الْمَلاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِه مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ-وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ-

আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ ব্যতীত আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের সমাজের কেবল দরিদ্র, প্রভাবহীন হীন-নীচ লোকগুলোই তো অজ্ঞতার কারণে তোমার আদর্শ গ্রহণ করেছে। আমরা তোমার মধ্যে এমন কোনো জিনিসই দেখতে পাচ্ছি না, যাতে করে তুমি আমাদের তুলনায় উন্নত হতে পারো? (সূরা হূদ-২৭)

হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতির কাছে নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন তখন সেই জাতির ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকগুলো নিজেদের জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির অহঙ্কার প্রকাশ করে বলেছিলো, তোমার তুলনায় আমরা অনেক বেশী বুঝি। তোমার কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান নেই, তুমি নির্বোধ। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফের ৬৬ আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ الْمَلاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِه اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ-

জাতির নেতৃবৃন্দ– যারা তাঁর আহ্বান মেনে নিতে অস্বীকার করছিলো, তারা বলেছিলো, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী।

এভাবে প্রত্যেক নবী-রাসূলদের সম্মুখেই সমকালীন নেতৃবৃন্দ নিজেদের ধন-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির অহঙ্কার প্রদর্শন করে নিজেদেরকে মহাসত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছে। সুতরাং অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই যে, মানুষকে প্রকৃত সত্য জানা থেকে বিরত রাখে এবং আসল তত্ত্ব ও তথ্য জানা-বুঝার ব্যাপারে অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই যে সবথেকে বড় বাধা, তা কোরআন এবং ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাব অত্যন্ত ঘৃণিত গুণ এবং ঘৃণিত গুণ কোনোক্রমেই যেনো চরিত্রে বাসা বাঁধতে না পারে, এ জন্যই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, হে আমার সন্তান! কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করোনা

অহঙ্কার সবথেকে ঘৃণিত গুণ

অহঙ্কারের মতো ঘৃণ্য গুণ যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে এই চেতনা সব সময় সক্রিয় থাকে যে, আমিই সবদিক থেকে উত্তম বা বড় আর অন্যরা আমার থেকে অধম বা ছোট। অহঙ্কারের এই চেতনা মানুষের মধ্যে অন্যান্য খারাপ গুণাবলীর জন্ম দিয়ে থাকে। নিজেকে যারা বড় মনে করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এটা চায় যে, অন্যান্য সকল লোক তাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করুক, তার সম্মুখে অনুগত হয়ে বিনয়ী হয়ে থাকুক এবং সকলে একমাত্র তারই অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা করুক। অহঙ্কারী ব্যক্তি যখন এর ব্যতিক্রম দেখতে পায়, তখনই তার মধ্যে স্বৈরাচারী আর অত্যাচারীর মনোভাব সৃষ্টি হয়। যারা অহঙ্কারীর অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নয়, অহঙ্কারী ব্যক্তি তখন তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও অন্যকে নিজের প্রতি অনুগত রাখার ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে।

একই অবস্থা অহঙ্কারী-দাম্ভিক শাসকদেরও, তারাও প্রতিপক্ষকে নানা কৌশলে নিজেদের অনুগত রাখার পন্থা অবলম্বন করে, কৌশল ব্যর্থ হলে শক্তিই হয় তাদের সর্বশেষ অস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকবৃন্দও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই দুর্বল দেশগুলোকে নিজেদের অনুগত রাখে। অহঙ্কারী-দাম্ভিক লোকরা পতনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে ফলে পতনের পথ তাদের দৃষ্টি গোচর হয় না।

হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালাম যখন অহঙ্কারী-দাম্ভিক ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে মহাসত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন তারাও অহঙ্কার প্রদর্শন করে বলেছিলো, আমরা এমন লোকদের কথা মেনে নিতে পারিনা, যে লোকরা আমাদের প্রজা, তারা হলো শাসিত আর আমরা শাসক। সুতরাং তাদের আর আমাদের মধ্যে অবস্থানগত ব্যবধান অনেক। আমরা শাসক শ্রেণী কখনো প্রজাসাধারণের কথা মেনে নিতে পারি না। ওদের কথা সত্য হলেও তা আমরা মানতে পারিনা, এটা আমাদের আত্মমর্যাদার ব্যাপার।

এই হলো অহঙ্কারী লোকদের মানসিক অবস্থা। অর্থ-বিত্ত, সম্মান-মর্যাদা, জনবল, শক্তি-সামর্থে যারা দুর্বল, তাদের কথা সত্য হলেও অহঙ্কারী লোক তা স্বীকার করে না অর্থাৎ অহঙ্কারই সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। ফেরাউন ও তার দলের লোকদের এই মানসিক অবস্থার বিষয়টি পবিত্র কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ-فَقَالُوْا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ-فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ-

তারা অহঙ্কার করলো এবং তারা ছিলো বড়ই আস্ফালনকারী। তারা বলতে লাগলো, আমরা কি আমাদেরই মতো দুইজন লোকের প্রতি ঈমান আনবো? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। এরপর তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো। (সূরা মু'মিনুন-৪৬-৪৮)

www.pathagar.com

অর্থাৎ অহঙ্কার অহঙ্কারী লোকদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে পৌঁছার পরও তারা তা দেখতে পায় না। অবশেষে ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে যায়। সমাজ ও দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এমনই দেখা যায় যে, সমাজের ধনী, প্রভাব, প্রতিপত্তিশালী লোকজন যে আদর্শেই বিশ্বাস করুক না কেনো, তারা চায় সমাজের সকল লোক তাদের আদর্শ অনুসরণ করুক। দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসের সাথে মিল থাক বা না থাক, তারা শক্তির অহঙ্কারে যে কোনো আদর্শ জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের দুর্বল শ্রেণী এবং দেশের অসহায় জনগণ আদালতে আখিরাতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবে–

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ–

দুর্বল ও অধীন হয়ে থাকা লোকজন অহঙ্কারী-দাম্ভিক লোকদেরকে কিয়ামতের দিন বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা তো অবশ্যই ঈমানদারদের দলে শামিল হতাম। (সূরা সাবা-৩১)

মানুষ যদি নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করতো, তাহলে তার অহঙ্কার করার মতো যে কিছুই তার কাছে নেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যেতো। প্রথমে সে ছিলো এক বিন্দু অপবিত্র পানির মধ্যে অবস্থানকারী খালি চোখে দেখতে না পাওয়া ক্ষুদ্র একটি ভ্রূণ মাত্র। মাতৃগর্ভের এক পঙ্কিল সরোবরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীতে সবথেকে অসহায় আর দুর্বল এক সত্তা হিসেবে এলো। অন্যের সাহায্য ব্যতীত মুহূর্তকাল সে অতিবাহিত করতে পারেনি। এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ সূরা কাহ্‌ফ-এ বলেছেন–

اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلاً–

তুমি সেই সত্তার বিধান অমান্য করছো যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন? (কাহ্‌ফ-৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এসব পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেন, সেই মানুষের পক্ষে অহঙ্কার শোভা পায় না। বিশেষ পদের অধিকারী লোককে দেখে তার অধীনস্থ লোকজন যদি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহলে বিশেষ পদের অধিকারী ব্যক্তির কোপানল তাদের ওপরে পতিত হয়। তাকে দেখলেই সম্মানার্থে দাঁড়াতে হবে এবং সালাম জানাতে হবে, এই মনোভাবের অধিকারী লোকদের লক্ষ্য করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مِنَ النَّارِ–

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ জন্য পুলক অনুভব করে যে, তাকে দেখে লোকজন সম্মানার্থে দাঁড়াবে, সে যেনো জাহান্নামে নিজের আশ্রয় স্থল বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

শ্রদ্ধা আর ভক্তি মনের ব্যাপার, মন থেকে এটা আসে এবং যার প্রতি মনে শ্রদ্ধা আর ভক্তি জাগে, তাকে দেখলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু কারো মনোভাব যদি এমন থাকে যে, তাকে দেখলেই লোকদেরকে দাঁড়াতে হবে, তিনি কাউকে সালাম দিবেন না, সবাই তাকেই সালাম দিবে। ঐ ব্যক্তির এই মনোভাবই অহঙ্কারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর অহঙ্কারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নিকৃষ্ট পরিণতি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا-

আল্লাহ তা'য়ালা অহঙ্কারী-গৌরবকারী আত্ম শ্রেষ্ঠত্ব বোধে নিমজ্জিত লোকদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা নিসা-৩৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন জানতে চাইলো, সবাই তো ইচ্ছা করে যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক এবং পাদুকাও আকর্ষণীয় হোক। (এটাও কি অহঙ্কার?) আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহঙ্কার হলো, গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয় বা ছোট জ্ঞান করা। (মুসলিম)

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বাম হাতে আহার করছিলো। তিনি লোকটিকে বললেন, ডান হাতে আহার করো। লোকটি (প্রকৃত সত্য গোপন করে) বললো, আমি পারছি না। আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি যেনো না পারো। অহঙ্কার ছিলো তার প্রতিবন্ধক এবং এরপর থেকে সে আর কখনো মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। (মুসলিম)

হারিসা ইবনে ওয়াহ্ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে জানাবো না? তারা হলো, প্রত্যেক অহঙ্কারী, সীমালংঘনকারী, নিকৃষ্ট স্বভাবের ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে বিতর্ক হলো। জাহান্নাম বললো, অহঙ্কারী ও উদ্ধত প্রকৃতির যারা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বললো, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে ঐসব লোক, যারা দুর্বল মিসকীন ও অসহায়। আল্লাহ উভয়ের মধ্যে

www.pathagar.com

ফায়সালা করে দিলেন, জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতি আমি রহম করার ইচ্ছা করবো, তোমার দ্বারা আমি তার প্রতি রহম করবো। আর জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তি। যাকে আমি ইচ্ছা করবো, তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দেবো। তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

অহঙ্কারী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এতই ঘৃণা করেন যে, কিয়ামতের দিন তার দিকে তিনি ঘৃণায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। অহঙ্কার এবং শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই শোভনীয়- কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী। নিজেকে যারা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায় মেতে ওঠে, তারা যেনো মহান আল্লাহর জন্য যা প্রযোজ্য- তাতে অংশ নিতে চায়।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়ালাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- সম্মান ও মাহাত্ম হচ্ছে আমার পাজামা এবং অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে ব্যক্তি এই দুইটির কোনো একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও বিবাদে লিপ্ত হবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো। (মুসলিম)

নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে তারা যেনো মহান আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অহঙ্কার হলো মহান আল্লাহর চাদর আর কোনো মানুষ যখন অহঙ্কার করে, সে যেনো আল্লাহ তা'য়ালার চাদর ধরে টান দেয়।

সুতরাং এই ঘৃণ্য স্বভাব থেকে মুক্ত থেকে মহান আল্লাহর একজন বিনয়ী বান্দা হিসেবে নিজেকে গড়তে হবে। আর এ লক্ষ্যেই হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

আল্লাহ তা'য়ালা সেই লোকদের পছন্দ করেন না যারা নিজেদেরকে খুব বড় একটা কিছু মনে করে এবং অহঙ্কার প্রকাশ করে। (সূরা হাদীদ-২৪)

www.pathagar.com

পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না

উদ্ধতভাবে চলাফেরার মূলেও রয়েছে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারই মানুষকে উদ্ধত প্রকৃতিতে চলাফেরায় অনুপ্রাণিত করে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকজন! বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। কারণ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ছোট মনে করে, কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। আর যে ব্যক্তি গর্ব অহঙ্কার করে, সে লোকদের দৃষ্টিতে ছোট– যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে। এমনকি সে তাদের কাছে কুকুর ও শুকরের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।

প্রকৃত বিষয় হলো, মহান আল্লাহর গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের প্রতি যে ঈমান আনে, সে ব্যক্তি হয় বিনয়ী– ঈমানদার হয় বিনম্র। তাঁর ব্যবহারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কথায় এবং আচরণে অহংকারের ছোঁয়া থাকে না। মন-মানসিকতায় স্বৈরাচারী চিন্তাধারার উদ্রেক হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا-

রহমানের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান-৬৩)

পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের প্রতি যারা ঈমান এনে মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়, তারা কখনো অহঙ্কারের সাথে পৃথিবীতে বিচরণ করে না। তাদের চাল-চলনে ভদ্রতা ও নম্রতা প্রকাশ পায়। গর্বিত অহঙ্কারী-স্বৈরাচারী লোকের মতো নিজের হাঁটা-চলাফেরায় ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করে না। বরং এসব লোকের সার্বিক আচরণ হয় ভদ্র, মার্জিত ও প্রশংসিত স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরূপ।

এ কথা মনে রাখতে হবে, নম্রভাবে চলার অর্থ এটা নয় যে, রোগীর মতো দুর্বলভাবে চলাফেরা করতে হবে বা নিজেকে মুত্তাকী-পরহেযগার হিসেবে জাহির করার উদ্দেশ্যে চলাফেরায় কৃত্রিম বিনয় ফুটিয়ে চলাফেরা করতে হবে। প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে যে ভঙ্গিতে চলাফেরা করা হয়, তাকে আর যাই হোক, নম্রভাবে চলাফেরা করা বলা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটা চলাফেরায় এমন শক্তভাবে পবিত্র কদম মোবারক ফেলতেন, মনে হতো তিনি ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন দেখতে পেলেন, একজন লোক মাথা হেঁট করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'মাথা উঁচু করে হাঁটো। ইসলাম রোগী নয়।' আরেক দিন তিনি দেখলেন, একজন লোক রোগীর মতো নিজেকে গুটিয়ে চলছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'ওহে জালিম! আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে মেরে ফেলছো কেনো?'

পরহেযগারী বা মুত্তাকী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, চলাফেরার সময় রোগীর মতো আচরণ করতে হবে কোনো কারণ ছাড়াই নিজের চলাফেরায় ভিখারীর আচরণ প্রকাশ করতে হবে।

www.pathagar.com

ঈমানদার ব্যক্তি যদি এভাবে ভিখারীর মতো চলাফেরা করে, তাহলে ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী লোকজন এই ধারণাই করবে, ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষের ব্যক্তিত্ব আর বীরত্ব মৃত্যুবরণ করে। মূল বিষয় হলো, চলাফেরা করতে হবে ভদ্র, নম্র, রুচি মার্জিত ভঙ্গিতে। যার মধ্যে সামান্যতম অহঙ্কার, দম্ভ, দুর্বলতা বা কৃত্রিম বিনয় থাকবে না।

ঈমানের আলো যার মধ্যে বিচ্ছুরিত হতে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে নম্রতার গুণ, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ঈমানদার ব্যক্তির চাল-চলন হয় বিনম্রতার মাধুর্য মন্ডিত। অহংকারের পদভারে পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে। (সূলা বনী ইসরাঈল-৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, খবরদার ! আমার যমীনের ওপরে অহংকারের পদভারে চলাফেরা করো না। তুমি এই যমীনকে পদাঘাতে ধ্বসিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না। তুমি ঐ পাহাড়ের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারো না। ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারী লোকদের মতো আচরণ করো না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানুষের চলাফেরার মধ্যে এমনকি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাঁটা-চলাফেরা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন?

প্রকৃত বিষয় হলো, হাঁটা চলাফেরা মানুষের একটি বিশেষ ধরণ বা ভঙ্গির প্রকাশ নয়। হাঁটা, চলফেরার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের মননশীলতা, তার মন-মানসিক অবস্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে। মনে যদি কোনো ব্যাপারে অস্থিরতা বা ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়, তাহলে চলার ধরনে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। বর্তমানে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ চলার ধরণ দেখেও অপরাধীকে গ্রেফতার করে থাকে। রাস্তায় অসংখ্য লোক চলাফেরা করে। পুলিশ বিশেষ কাউকে থামতে বলে তার দেহ বা ব্যাগ তল্লাশী করে। ক্ষেত্র বিশেষে নিষিদ্ধ কোনো কিছু পেয়েও যায়। অর্থাৎ অপরাধীর চলার ধরনের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ পরিচিত।

নারী, পুরুষ বা শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের হাঁটা চলাফেরায়ও বেশ পার্থক্য রয়েছে। একজন নম্র, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের হাঁটা চলাফেরার ধরণ, সাহায্য প্রার্থী অভাবী লোকের চলাফেরার ধরন, চিন্তাক্লিষ্ট বা অস্থির চিত্তের লোকের চলাফেরার ধরন, চোর, ছিন্‌তাইকারী, মাস্তান, ডাকাত গুন্ডা ও দুষ্কৃতি প্রকৃতির লোকের চলাফেরার ধরন, দাম্ভিক, অহঙ্কারী লোকের চলার ধরন, কবি, সাহিত্যিক, লেখক বা ভাবুক প্রকৃতির লোকের চলার ধরন, আবার শান্তশিষ্ট্য নম্র-ভদ্র লোকের চলাফেরার ধরণ অবশ্যই ভিন্ন হয়ে থাকে এবং হাঁটা চলাফেরার ধরনে কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে তা অনুমান করা বিশেষ কষ্টকর নয়।

www.pathagar.com

ঠিক এ কারণেই ইসলাম হাঁটা চলাফেরার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে যে, একজন ঈমানদারের হাঁটা-চলার ধরন দেখেই যেনো অনুমান করা যায়, লোকটি ধৈর্যশীল, নম্র, ভদ্র, মানবিক সুকুমার বৃত্তির অধিকারী, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই লোকের দ্বারা কারো কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয়, বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয় তবুও তাঁর ভেতরে অহংকারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, তাঁর এই সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এ সম্পদ-ঐশ্বর্য্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। বর্তমানে যিনি দেশের ধনীদের কাতারের একজন আছেন, দেশে-বিদেশে তাকে বিশিষ্ট নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে মুহূর্ত কাল পরেই তাকে কপর্দক শূন্য করে ভিখারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

মৃত্যু যদি এই মুহূর্তে তার দিকে হীমশীতল থাবা বিস্তার করে, তাহলে তার এই বিশাল সম্পদ মুহূর্তে অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। এসব সম্পদ তাঁর কোনো কাজেই আসবে না। তাঁর কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে, এসব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কিছুই নয়। কারণ তাঁর সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, খরচ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা কখনও হারাবে না, ছিনতাই হবে না, বিনষ্ট হবে না, তিনি দান করেন, কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَا-

আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি সম্পদশালী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী, অভাবী। (আল কোরআন)

আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর ভান্ডার কখনও শূন্য হয় না। তাঁর সম্পদের ভান্ডার প্রতি মুহূর্ত পরিপূর্ণ। গোটা পৃথিবীবাসীকে তিনি এক মুহূর্তে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী বানিয়ে দিতে সক্ষম। ঈমানদার তাঁর আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেন, এ কারণে অহংকারের পরিবর্তে তাঁর গোটা দেহ বিনম্রতার বর্মে আবৃত থাকে। তাঁর কথামালায় নম্রতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সম্পদের অহংকার সে করে না।

ঈমানদারের চেতনা এ ব্যাপারে শানিত থাকে যে, আল্লাহ যদি এই মুহূর্তে তাঁর দেহে এমন কোনো রোগ প্রবেশের নির্দেশ দেন, যে রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তার অর্জিত ধন, সম্পদের এই বিশাল স্তুপ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও তিনি রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবেন না। আল্লাহর নির্দেশে তার মস্তিষ্কের একটি নার্ভ যদি একটির সাথে আরেকটি অর্থাৎ পরস্পরে জড়িয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তে তার স্বাভাবিক চেতনা লোপ পাবে, ঘনিষ্ঠ মহল, পরিচিত মহলের কাছে তিনি উন্মাদ নামে আখ্যায়িত হবেন। ভোগ-বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বিশাল বালাখানা থেকে তাকে বের করে পাগলা গারদে প্রেরণ করা হবে।

www.pathagar.com

ঈমানদার ব্যক্তি শক্তির অহংকার করে না। কারণ সে জানে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বেশী। কোনো মানুষের এ শক্তি নেই, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যাবে। যারা অহংকার করে, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, শক্তিতে মদমত্ত হয়ে জাতির ওপরে জুলুম করে, তাদেরকে সাবধান করে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا-لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ-

হে জ্বিন ও মানুষ ! যদি তোমাদের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা এই আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে যাবে, তাহলে চলে যাও। কিন্তু কোথায় যাবে, সমস্ত জায়গার সার্বভৌমত্ব আমার। (সূরা আর রাহ্‌মান)

যাবার স্থান কোথাও নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে, এই সৌর মন্ডলে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যেখানে যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর মহান অধিপতি হলেন আল্লাহ। এই অনুভূতি ঈমানদার বান্দার মন-মস্তিষ্কে সক্রিয় থাকে, এ জন্য মুমিন ব্যক্তি প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'য়ালা দান করলে সে বারবার আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার করতে থাকে।

দৈহিক শক্তির অধিকারী কোনো ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন সে তাঁর শৌর্য-বীর্য শক্তির কারণে অহংকার করে না। কারণ সে জানে, তাঁর এই দৈহিক শক্তি যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর আদেশে তাঁর দেহের সমস্ত নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর চলৎশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্বে প্রচন্ড দৈহিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। এভাবে ঈমান মানুষকে অহংকার মুক্ত করে তার স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আবরণে আচ্ছাদিত করে।

ঈমানদার ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সে জ্ঞানের অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর কোরআনে সে পাঠ করেছে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার রয়ে গিয়েছে আল্লাহর কাছে। মানুষ সে–তার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় এবং নির্ভুলও নয়। যে সামান্য জ্ঞান সে অর্জন করেছে, মস্তিষ্কে কোনো ত্রুটি ঘটলে, স্মৃতিশক্তির কেন্দ্রস্থল বিকল হয়ে গেলে মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান তাকে সব সময় সঠিক তথ্য দান করবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁর জ্ঞান তাকে কোনো অজেয় ক্ষমতা দান করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান তাকে চিরঞ্জীব করতে পারে না। জ্ঞানের মাধ্যমে সে রোগ-ব্যধি-জরাকে জয় করতে পারেনি। মহান আল্লাহই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ঈমান এভাবেই মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে অহংকারের আবর্জনা দূরিভূত করে বিনয় আর নম্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈমান এনেছি, এ দাবি করার পরে যদি তার ভেতরে এসব গুণাবলীর সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বাতিলের মোকাবেলায় উত্তপ্ত ময়দানে টিকে থাকাও সম্ভব হয় না। চরিত্রে বিনয় এবং নম্রতা না থাকলে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। আর নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ইসলামের দাওয়াতও কারো কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌছানো যায় না।

অহঙ্কারের বিপরীতে বিনয় হলো এমনই এক সুন্দর গুণ যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিনয়ী ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি পথ চলতে কোনো শিশু বা বালককে দেখলেও সর্বপ্রথমে সালাম দিতেন। তিনি মদীনার জীবনে যখন রাষ্ট্র প্রধানের পদে আসীন, এই আসনে আসীন থাকার পরও লোকদের বোঝা মাথায় উঠিয়ে দিয়েছেন। দাস-দাসী শ্রেণীর মানুষগুলোও তাঁর পবিত্র হাত ধরে নিজেদের কাজের জন্য নিয়ে যেতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম)

সূরা লূকমানের ১৮ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। একই কথা বলা হয়েছে, সূরা আন্ নাহ্লের ২২ নং আয়াতে। অহঙ্কারী লোকগুলো পৃথিবীতেও যেমন লাঞ্ছিত হয় এবং আখিরাতে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে ও চিরকাল তারা সেখানে অবস্থান করবে। পবিত্র কোরআন বলছে–

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا–فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ–

বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহঙ্কারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা। (সূরা যুমার-৭২)

অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা যাদের জন্য মহাসত্য গ্রহণ ও অনুসরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে–

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ–

اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا–فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ–

তোমাদের এই পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য নিজেদেরকে গর্বিত মনে করতে। এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহঙ্কারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য স্থান। (সূরা মু'মিন-৭৫-৭৬)

www.pathagar.com

অহঙ্কার শোভা পায় একমাত্র মহান আল্লাহর এবং অহঙ্কার একমাত্র মহান আল্লাহরই অধিকার। এই অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করবে, তাকে অবশ্যই লাঞ্ছনামূলক আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কিয়ামতের দিনের পরিণতি সম্পর্কে বলছেন–

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ-

কোনো অধিকার ব্যতীতই তোমরা পৃথিবীতে যে অহঙ্কার প্রদর্শন করেছো এবং নাফরমানী করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। (সূরা আহ্‌কাফ-২০)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (অতীতে) একজন লোক মূল্যবান পোষাক পরিধান করে মাথায় সিঁথি কেটে ও চালচলনে অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হেঁটে যাচ্ছিলো। এই অবস্থায় সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিলো। হঠাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাটির নিচে ডুবিয়ে দিলেন। এভাবে সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচের দিকেই যেতে থাকবে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহুম বলেছেন, যার হৃদয়ে যে পরিমাণ অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা থাকে সেই পরিমাণ জ্ঞান কমে যায়।'

হযরত ইউনুস ইবনে উবায়েদ (রাহঃ) বলেন, সিজদা করার সাথে অহঙ্কার এবং তাওহীদের সাথে নিফাক বা কপটতা থাকতে পারে না। (ইবনে কাসীর)

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় রুকুর শেষ আয়াতে হযরত লূকমান আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানকে সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহলো–হে পুত্র! পৃথিবীতে চলার সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বরকে নীচু করো। কেননা সব আওয়াজের মধ্যে নিকৃষ্টতম-অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার।

হাঁটা চলাফেরায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে, আর এই মধ্যমপন্থা শুধুমাত্র চলাফেরায়ই নয়– জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবলম্বন করতে হবে। নামায সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই মুসলিম মিল্লাতকে একাধিকবার মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের বিধানসমূহও যাবতীয় ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে নমনীয়তার সর্বশেষ পন্থাও নয় আবার চরমপন্থাও নয়– এ দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা যা মানুষের জন্য অনুসরণ করা একান্তভাবেই সহজ, সেদিকেই পথনির্দেশনা দিয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন বেদান্ত দর্শনের কতিপয় দিক এমন রয়েছে যে, পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনের জন্য মানবীয় কামনা-বাসনা, মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে হত্যা করে, পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনো নির্জন জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় বসে সাধনা করতে হবে। অথবা বস্ত্রহীন হয়ে সারা দেহে ভস্ম মেখে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে সাধনা করতে হবে।

খৃষ্ট সম্প্রদায় এই সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নারীকে অচ্ছুৎ পরিগণিত করে তাদেরকে স্পর্শ না করার বিধান দিয়েছে। এমনকি নিজের মা'কেও স্পর্শ করা যাবে বলে ধারণা দিয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শনেও স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে নিজেকে তিলে তিলে আত্মহত্যা করার বিধান দিয়েছে। যরথ্রস্ট দর্শনে ঋতুবতী নারীকে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকার বিধান দিয়েছে। এভাবে করে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল দর্শনে মানুষকে হয় চরমপন্থা অবলম্বনে নির্দেশ দিয়েছে, অথবা মানুষকে সম্পূর্ণ পশুর ন্যায় বল্লাহারা করে দিয়ে সকল নিয়ম-কানুন ও বাঁধন থেকে মুক্ত করে পশুস্তরে নামিয়ে দিয়েছে।

শুধুমাত্র ইসলামই মানুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের একাধিকবার বলা হয়েছে, 'আমি মানুষের জন্য এই কোরআনকে সহজ করেছি, আমার বিধানকে মানুষের জন্য সহজ করে দাও-কঠোর করো না। নবী-রাসূলকে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে দারোগা করে প্রেরণ করিনি যে, মানুষ নির্দেশ মানতে না চাইলে আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন। আমি আপনার মধ্যে নমনীয়তা প্রদান করেছি এই জন্য যে, মানুষ যেনো আপনার কোমল ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়।'

আল্লাহ তা'য়ালা যা হারাম করেছেন, তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজনে এই মানুষের জন্যই হারাম বস্তু থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। যেমন কোনো মানুষ যদি গভীর জঙ্গল, নির্জন মরুপ্রান্তরে বা এমন কোনো অবস্থায় পতিত হয় যে, তার সম্মুখে মদ বা শূকরের গোস্ত রয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর মতো অন্য কোনো খাদ্য যদি না থাকে বা যোগাড়ের কোনোই সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ঐ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঐ পরিমাণ মদ বা শূকরের গোস্ত গ্রহণ করতে হবে, যে পরিমাণ গ্রহণ করলে প্রাণে রক্ষা পায়।

ঠিক একইভাবে মানুষের সার্বিক আচরণেও কল্যাণধর্মী মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকে চলাফেরার অনুমতি দেয়নি, যার মাধ্যমে অহঙ্কার, উদ্ধত, গর্বিত ভঙ্গি আর কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। আবার এ অনুমতিও দেয়নি যে, তার চলাফেরার মধ্যে দুর্বলতা, নীচুতা, দীনহীনতা বা রোগীর ভাব প্রকাশ পায়।

ঠিক এভাবেই কথা বলার মধ্যেও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের বোধগম্য নয় এমন অনুচ্চ স্বরে কথা বলা, এত দ্রুত শব্দসমূহ উচ্চারণ করা যা এক শব্দের সাথে আরেক শব্দ জড়িয়ে যায় এবং অন্যের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয়, এমন উচ্চ শব্দে কথা বলা যা শ্রোতার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে, এমন অঙ্গি-ভঙ্গিতে কথা বলা বা হাত, চোখ ও মুখের ভঙ্গি এমন করা যা শ্রোতার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। এসব পদ্ধতি পরিহার করে নম্র,

www.pathagar.com

শান্ত, ভদ্র, শালিন, আকর্ষণীয় ভঙ্গি, শব্দসমূহ এমন স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা যা শ্রোতার বুঝতে কষ্ট হয় না এবং তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে- এমন ভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে অনুচ্চ শব্দে বা উচ্চ আওয়াজে কথা বলার নির্দেশ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুধাবন করে যেখানে যে নিয়ম সেখানে তাই অনুসরণ করতে হবে। কথা বলার সময় কথককে স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার মধ্যে বাহুল্য কথা যেনো এসে না যায়, যা শ্রোতাকে বিরক্ত করে। একই শব্দ যেনো বার বার উচ্চারণ করা না হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মুখে উচ্চারিত শব্দ বা কথার সাথে হাতের ভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই সংযোজন হয়।

এই ভঙ্গি সংযোজনের ক্ষেত্রেও কথককে সতর্ক থাকতে হবে। ভঙ্গি যেনো অশোভন না হয় এবং কথার সাথে হাতের ভঙ্গির সাদৃশ্য নেই- এদিকে কথককে সতর্ক থাকতে হবে। অস্পষ্ট বলা কথককে এড়িয়ে চলতে হবে। যা জানাতে চাওয়া হবে অথবা যা বলা হবে, তা পরিপূর্ণ বাক্যে শেষ করতে হবে- যেনো শ্রোতা বুঝতে পারে তাকে কি বলা হলো বা কথক কি বললো।

কথার অর্ধেক মুখে উচ্চারণ করা হলো, আর অবশিষ্ট কথা ভঙ্গির মাধ্যমে বুঝানো হলো অথবা কথা শেষ না করে নিরব থাকা হলো। এই অভ্যাস পরিহার করতে হবে, তবে পরিবেশ যদি এমন থাকে যে, যেখানে পরিপূর্ণ বাক্যে কথা শেষ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে বা ভঙ্গির মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রকাশ করাই নিরাপদ- সেখানে তা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এসবই পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

কথককে মুদ্রাদোষ পরিহার করতে হবে। অনেকে কথার মধ্যে একাধিকবার একই শব্দ উচ্চারণ এবং অপ্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োগ করে থাকে। যেমন, 'সুতরাং, এবং, এ জন্য, কারণ, অতএব, ধরুন, মনে করুন, আপনার, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে, তারপর, আর কি, বুঝলেন, বুঝেছেন, সর্বনাশ, সেই, ইয়ে, মানে হলো' ইত্যাদি ধরনের শব্দ কথার মধ্যে উচ্চারণ করতে থাকে এবং যত্রতত্র প্রয়োগ করে। ফলে শ্রোতা বিরক্তি বোধ করে এবং কথা শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পিতামাতা বা অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, সন্তানের মধ্যে যেনো কোনো দিকে কোনো খারাপ, অরুচিকর অভ্যাস সৃষ্টি না হয় এবং কথার মধ্যেও অপ্রীতিকর, শ্রুতিকটু শব্দ অথবা মুদ্রাদোষ জনিত কোনো শব্দ দেখা দিয়েছে কিনা। কথা বলার সময় সন্তান এমন কোনো ভঙ্গি অবলম্বন করছে কিনা, যা অমার্জিত অভদ্র এবং অশালীন। সাধারণত কিশোর, তরুণ ও যুবক বয়সেই এসব অভ্যাস সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এই সময়ই সন্তানের প্রতি পিতামাতা বা অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

যে বাক্য যে ভাব প্রকাশ করে, কথকের বলার ধরনে তা অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং এটাই স্বাভাবিক বাক্য রীতি। প্রশংসাসূচক বাক্য বিশেষ ভঙ্গিতে কথক প্রকাশ করে থাকে,

www.pathagar.com

স্নেহ-মমতা প্রকাশ বা সহানুভূতিসূচক কথামালা, ঘৃণা বা নিন্দা প্রকাশকসূচক কথা, অবজ্ঞাসূচক কথা, অবহেলা প্রদর্শনসূচক কথা অর্থাৎ কথায় যেখানে যে ভাব প্রকাশ পায়, কথকের চেহারা ও ভঙ্গিতেও তাই প্রকাশ পায় এবং এটাই স্বাভাবিক রীতি। ইসলাম এই রীতি নিষিদ্ধ করতে চায় না।

বরং আপত্তিকর বিষয় হলো, কথার মধ্যে অহঙ্কার প্রকাশ পাবে না, অন্যের মনে ভীতি সৃষ্টি করার মতো ভঙ্গিতে কথা বলবে না এবং অন্যের মনে আঘাত দেয়ার ভঙ্গিতে বা অপমানসূচক ভঙ্গিতেও কথা বলবে না। কথার ধরনে রুক্ষতা, কঠোরতা ও অবজ্ঞা-অহঙ্কারের ভাব যেনো প্রকাশ না পায়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।

কথা বলার ধরনে অসৌজন্যতা প্রকাশ না পায় বা কথকের সম্মান-মর্যাদার হানী না হয় এবং কথক যেনো অন্যের কাছে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত না হয়। অন্যের কাছে কথকের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা যেনো বৃদ্ধি পায় সে ভঙ্গীতেই মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কথককে কথা বলতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলায় সাদকার সমান সওয়াব।

নিজেকে অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে রাখাও যেমন অনুচিত তেমনি নিজের ব্যক্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েও হাস্যকর ভঙ্গি অবলম্বনে কথা বলা অনুচিত। শামায়ের তিরমিযীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে কোন্ ভঙ্গি অবলম্বনে কথা বলতেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল তোমাদের অনুরূপ লাগাতার ও দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না। বরং তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন এবং তাঁর কথার বিষয়বস্তু একটি থেকে অপরটি পৃথক হতো। এ কারণে কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি ভালোভাবে তা অনুধাবন করতে পারতো।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনানুসারে কোনো কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেনো শ্রোতামন্ডলী কথার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।

সমাবেশ যদি বড় হতো বা বিষয়বস্তু কঠিন হলে তিনি ডানে-বামে ও সম্মুখে পবিত্র মুখমন্ডল শ্রোতাদের দিকে দিয়ে কথা বলতেন এবং কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যেনো শ্রোতামন্ডলী কথার তাৎপর্য অনুধাবন করে হৃদয়ে সংরক্ষিত করতে পারে। তিনি এমন সারগর্ভ ভাষায় কথা বলতেন, যার মধ্যে শব্দ থাকতো কম এবং অর্থ থাকতো বেশী। মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) কম কথার অধিক অর্থ– এ ধরনের চল্লিশটি হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা একটি থেকে আরেকটি পৃথক হতো এবং কোনো বাহুল্য বা ত্রুটিও থাকতো না এবং যে উদ্দেশ্য যা বলতেন তা অস্পষ্টও থাকতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কারণে কোনো দিকে ইশারা করতেন, তখন সম্পূর্ণ হাত দিয়েই ইশারা করতেন। এ প্রসঙ্গে গবেষকগণ বলেছেন, শুধুমাত্র আঙ্গুলি দিয়ে ইশরা করা বিনয়ের পরিপন্থী অথবা তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিলো আঙ্গুলি দিয়ে তিনি তাওহীদের প্রতি ইশারা করতেন। এ জন্য তিনি পবিত্র আঙ্গুলি দিয়ে অন্য কিছুর প্রতি ইশারা করতেন না।

www.pathagar.com

তিনি যখন কারো প্রতি সন্তুষ্ট হতেন তখন তাঁর পবিত্র চেহারার ভঙ্গি এমন হতো যে, তিনি যেনো লজ্জা পেয়ে পবিত্র চোখ বন্ধ করেছেন। তাঁর পবিত্র হাসির সময় মনে হতো যেনো পূর্ণিমার পূর্ণশশী হঠাৎ করেই ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসির সময় পবিত্র দাঁত মোবারক তেমন বিকশিত হতো না। হঠাৎ যদি দেখাও যেতো, মনে হতো যেনো মুক্তার দানা সূর্যের কিরণচ্ছটায় ঝিকমিক করে উঠলো। অট্ট হাসি তিনি দিতেন না এবং পছন্দও করতেন না। কথা বলার সময় ক্ষেত্র বিশেষে তিনি পবিত্র হাত মোবারক নাড়তেন এবং কখনো ডান হাতের তালুকে বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্য ভাগে রাখতেন।

সুতরাং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি যেভাবে হাঁটতেন, যেভাবে কথা বলতেন, হাসতেন, কথা বলার সময় যে ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ করতেন, তা অনুসরণ করতে হবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সভ্যতা, ভদ্রতা, নমনীয়তা ও শিষ্টাচার।

উপদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি

আমরা ইতোপূর্বে সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেখানে উল্লেখ করেছি, সন্তানকে আদর-ভালোবাসায় সিক্ত করে তাদের মন-মানসিকতায় ইসলামের শিক্ষা দৃঢ়মূল করে দিতে হবে। তাকে নমনীয়তা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখাতে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন–

لَيْسَ الْيَتِمُ الَّذِىْ قَدْ مَتٰى وَالِدُهٗ–بَلِ الْيَتِمِ يَتِمِ الْعِلْمِ وَ اَدَبُ–

যার পিতা ইন্তেকাল করেছে সে ইয়াতিম বটে, কিন্তু প্রকৃত ইয়াতিম হলো সেই ব্যক্তি যার মধ্যে জ্ঞান ও শিষ্টাচার অনুপস্থিত।

সন্তানকে আদর, ভালোবাসার সাথে শিক্ষা না দিয়ে শাসনের সাথে শিক্ষা দিলে তা তার মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করবে না। পিতামাতা বা অভিভাবক সন্তানকে সম্মান না দিলে সন্তান সম্মান দেয়ার শিক্ষা পাবে কোথায়? আল্লাহর রাসূল পিতামাতার প্রতি আদেশ দিয়েছেন, সন্তানকে সম্মান-মর্যাদা দেয়ার জন্য। তাদেরকে সম্মান করলে তারাও পিতামাতাকে সম্মান করবে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে শুধুমাত্র হে আমার ছেলে, এভাবে সম্বোধন করেননি। তিনি সম্বোধন করেছেন, হে আমার প্রিয় সন্তান, হে আমার কলিজার টুকরা বা নয়নের মণি বলে। যেনো পিতার কথাগুলো সন্তানের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা অনুভব করা যায় যে, তিনি তাঁর যে সন্তানকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সন্তান বয়সের ঐ প্রান্তে উপনীত হয়েছিলো, যে বয়স উপদেশ ধারণ করতে পারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর সন্তান ছিলো তরুণ বা যুবক।

www.pathagar.com

যে উপদেশ সন্তানকে দেয়া হবে, তা যেনো সন্তানের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে এবং সন্তান তা অনুসরণ করে, এই পদ্ধতি হযরত লুকমান অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মমতা সিক্ত ভাষায় এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই পদ্ধতি কি তাঁর নিজের আবিষ্কৃত না মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জ্ঞানের জগতে দান করেছিলেন?

এ প্রশ্নের জবাবও সূরা লুকমানের ঐ আয়াতে দেয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে– আমি লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানে ভূষিত করেছিলাম। অর্থাৎ মহাসত্যের দিকে দাওয়াত দেয়ার যে পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন, তিনিও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে এবং কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে উপদেশ দেবে। হতে পারে এ দুইজন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পিতা-পুত্র, বড়ভাই-ছোট ভাই অথবা পরিচিত কেউ একজন। এই দুইজন মানুষকে যদি ইটের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে এই দুটো শক্ত ইটকে একটির সাথে আরেকটি জুড়ে দিতে হবে।

অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি যে আদর্শ অনুসরণ করছেন, যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তিনিও যেনো দাওয়াত দানকারীর আদর্শ অনুসরণ করেন। এভাবেই দুইজনকে একত্রিত করতে হবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে তা করা সম্ভব?

দুটো ইটকে একত্রিত করতে হলে সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। দুটো ইটকে পাশাপাশি রেখে এর মাঝখানে সিমেন্টের আবরণ দিলেই দুটো ইট পরস্পর জুড়ে যায়। অনুরূপভাবে দাওয়াত বা উপদেশের ভাষা ও ভাব হতে হবে মমতাসিক্ত। যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে বা উপদেশ দেয়া হচ্ছে, সে যেনো দাওয়াত গ্রহণ করে বা উপদেশ মেনে নিয়ে দাওয়াত দানকারীর- উপদেশ দানকারীর আদর্শের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়।

মহাসত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে, সে পন্থাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখিয়ে দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহল-১২৫)

যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার

www.pathagar.com

যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন্ প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি তার কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তার সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে মহাসত্যের দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে আক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়।

দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছে, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে মহাসত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এড়িয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'-দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই কথকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। মহাসত্যের দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও

www.pathagar.com

প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

নবী করীম নিজের মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তার করেছেন। একজন লোক তাঁর কাছে এসে জানালো, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি কিন্তু আমার একটি শর্ত রয়েছে। আল্লাহর রাসূল উক্ত ব্যক্তির শর্ত জানতে চাইলে সে জানালো, আপনি যা করতে আদেশ করবেন আমি তাই করবো। কিন্তু অন্য নারীর সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি আমাকে দিতে হবে।

একই কথা যদি পীর সাহেবের কাছে কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে বলতো যে, আমি আপনার মুরীদ হতে পারি, কিন্তু আমাকে ব্যাভিচার করার অনুমতি দিতে হবে। তাহলে পীর সাহেব মুখ খোলার পূর্বেই উপস্থিত মুরীদরা ঐ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করার সুযোগ দিতো না। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্যতম বিরক্ত হলেন না বা উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসূলের অনুমতি ব্যতীত কোনো প্রতিবাদ করলেন না। নবীজী পরম মমতাভরে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, এই ঘৃণিত কাজে তোমার স্ত্রী, কন্যা, বোন বা গর্ভধারিণী মা যদি লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি কি তা সহ্য করবে?

লোকটি তৎক্ষণাত প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, অসম্ভব! এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

নবীজী এবার বললেন– দেখো, তুমি যে কাজটি করার অনুমতি প্রার্থনা করছো, তা কোনো নারীর সাথে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেই নারীও তো কারো স্ত্রী, বোন, কন্যা বা মা। তাহলে তুমি নিজের স্ত্রী, কন্যা, বোন বা মায়ের জন্য যা খারাপ মনে করছো, তা অন্য কারো মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ের জন্য কেনো ভালো মনে করছো?

নবীজীর কথা শুনে লোকটি সাথে সাথে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে বললো– এই ধরনের চিন্তাও আমি আর নিজের মনে স্থান দেবো না।

এ কথা বলেই সে ইসলাম গ্রহণ করলো। মদীনার একটি ঘটনা। সে সময় মদীনায় একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন রয়েছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাহাবায়ে কেরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় মসজিদে নববীর মধ্যে বসে রয়েছেন। এমন সময় একজন অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে থাকলো। সাহাবায়ে কেরাম বাধা দিতে যাচ্ছেন, আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে নিবৃত্ত করে বললেন– লোকটিকে শুরু করা কাজটি শেষ করতে দাও। নতুবা তার শরীরিক অসুবিধা দেখা দেবে।

মসজিদে নববীর মধ্যে একজন অমুসলিম প্রসাব করছে, যাঁর পরিশ্রমে গড়া মসজিদ তিনি– আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য বীর কেশরী

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তাঁরা স্বচোক্ষে তা দেখছেন এবং পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের দেশে অমুসলিম দূরে থাক, কোনো মুসলমানের নাবালেগ সন্তানও যদি মসজিদের বাইরের দেয়ালে প্রসাব করে, তা দেখে কি কেউ সহ্য করবে?

অমুসলিম লোকটির প্রসাব করা শেষ হলে লোকটিকে নবীজী কাছে ডাকলেন এবং একজন সাহাবাকে বললেন, পানি এনে প্রসাব পরিষ্কার করতে। লোকটি কাছে এলে নবীজী মমতার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যেখানে প্রসাব করলে সে স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা রয়েছে? এই স্থান হলো মসজিদ- যেখানে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সিজ্দা দেয়া হয়। তোমার ধর্মীয় উপাসনালয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী কোনো লোক যদি ঐ কাজ করতো, যা তুমি করেছো- তখন তোমার অনুভূতি কেমন হতো?

নবীজীর কথায় লোকটির মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটে গেলো। তার ভেতরের জগতটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে চিন্তা করলো, সে যখন মসজিদের মধ্যে প্রসাব করছিলো, তখন নবীজীর পক্ষ থেকে মুখে কোনো আদেশ দেয়ার প্রয়োজনও ছিলো না। সামান্য একটু ইশারা দিলেই উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন তরবারীর আঘাতে তার দেহ থেকে মাথা পৃথক করে দিতো। কিন্তু তিনি তা না করে কি মধুর সম্ভাষণে তাকে বিষয়টি বুঝালেন।

সুতরাং এই মানুষটি সাধারণ কোনো মানুষ নন- তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী। এই চিন্তার উদ্রেক হওয়ার সাথে সাথে লোকটি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনুপম আদর্শ দিয়ে অন্য মানুষকে ইসলামের আদর্শে দিক্ষীত করেছেন। তিনি যখনই কোথাও দাওয়াতী কাজের জন্য লোক পাঠাতেন, তখন তিনি বলে দিতেন- মানুষের কাছে ইসলামকে সহজ-সরলভাবে তুলে ধরবে, কোনো বিষয় কঠিনভাবে উপস্থাপন করবে না। মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দ্বীনের পথে এনো, জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিও না।

www.pathagar.com

তরুণ-যুবকদের জন্য সর্বোত্তম উপহার

সূরা লূকমানের এই তাফসীর অধ্যয়ন করে অন্তরে এ ধারণার স্থান দেয়ার অবকাশ নেই যে, হযরত লূকমান যেহেতু তাঁর পুত্র সন্তানকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, সুতরাং তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই অনুসরণীয়- নারীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর বিধান নারী-পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই প্রযোজ্য এবং হযরত লূকমানের উপদেশ আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে তা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় করেছেন।

তবে এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ কিশোর, তরুণ ও যুবক বয়সে যা কিছুই রপ্ত করে, তা অবশিষ্ট জীবনে অনুসরণ করে। এ জন্যই হযরত লূকমান আলাইহিস্ সালাম নিজের তরুণ সন্তানকে উল্লেখিত উপদেশসমূহ দিয়েছিলেন, যেনো তাঁর সন্তান অবশিষ্ট জীবনে এসবের অনুসরণ করে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কারণ তরুণ ও যুবক জীবনই হলো মানুষের জীবনের স্বর্ণালী-বর্ণালী সময় এবং এই সময়ই জীবনের অবশিষ্ট জীবনের মূলভিত্তি।

বয়সের বিশেষ এক প্রান্তে পৌছে মানুষের পক্ষে কোনো অভ্যাস নিজের চরিত্রে রপ্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ জন্য চরিত্রে যা কিছু উত্তম গুণের সমাবেশ ঘটানোর চমৎকার সময় হলো কৈশোর, তরুণ ও যৌবনকাল। এ সময়ে মনের শক্তি থাকে অপ্রতিরোধ্য এবং ইচ্ছারও দৃঢ়তা থাকে। হযরত লূকমান ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁর সন্তানকে সঠিক উপদেশসমূহ দিয়েছিলেন। কারণ তরুণ ও যুবশক্তিই হলো জাতির মেরুদন্ড। দেহের মেরুদন্ড যদি সোজা থাকে তাহলে গোটা শরীরই সোজা থাকে। আর মেরুদন্ড যদি বাঁকা হয়ে যায় বা কোনো দূরারোগ্যে পচনশীল রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই শরীর হয়ে যায় কর্মের অনুপোযোগী।

হযরত লূকমান এই মেরুদন্ড সোজা রাখার লক্ষ্যেই তাঁর সন্তানের জন্য এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যেনো জাতির মেরুদন্ড তরুণ-যুবশক্তি সঠিক পথে দৃঢ় থেকে গোটা জাতিকেই সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে তরুণ ও যুবশক্তিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অন্যায় আর অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কোনো উপাদান নেই, যে উপাদান তরুণ-যুবকদের সর্বোত্তম নৈতিক গুণসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে। একদিনে বস্তুবাদ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তরুণ ও যুবশক্তি চরিত্রহীন, উচ্ছৃংখল ও নীতি-আদর্শ বিবর্জিত অবস্থায় গড়ে উঠছে, আরেক দিকে মানব রচিত মতবাদ-মতাদর্শের ধারক-বাহক ইসলামের শত্রুদের পদলেহী রাজনৈতিক শক্তিসমূহ তরুণ-যুবকদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র, নারী আর মাদকদ্রব্য।

ফলে গোটা তরুণ ও যুবসমাজ দ্রুত গতিতে এক ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অস্থিরতা তাদেরকে অক্টোপাশের মতোই জড়িয়ে ধরেছে। নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টিতে অক্ষম এবং

www.pathagar.com

কর্ম বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষাঙ্গন থেকে এক বিপুল সংখ্যক যুবশক্তি অস্থিরতা আর হতাশা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জাতির জন্য এরা হয়ে পড়ছে বোঝা, ফলে তারা বাধ্য হয়েই চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস আর পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ যোগাড়ের অন্ধকার পথ বেছে নিচ্ছে।

তরুণ ও যুবশক্তি যেনো পথভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, এ জন্যই হযরত লূকমান তাঁর পুত্রকে উপলক্ষ্য করে সমকালীন যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক যুগের তরুণ ও যুবকদেরকে সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। তরুণ ও যুবকদেরকে যেমন তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের ওপর ছেড়েও দেয়া যাবে না, তেমনি তাদেরকে শাসনের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধও করা যাবে না। তাদেরকে গড়ার জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ স্নেহ-মায়া আর মমতার বাঁধনে জড়িয়ে সেই শিক্ষা দিতে হবে, যা অনুসরণ করলে তারা সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরুণ-যুবকদেরকেই সবথেকে বেশী ভালোবাসতেন। তারা যেনো পিতামাতা ও বড়দের সম্মান করে, এ সম্পর্কে তাকিদ দিয়েছেন।

عَنْ سَعْدِ ابْنِ الْعَصِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ-قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ كَبِيْرِ الاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِ هُمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ-

হযরত সা'দ ইবনে আছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক যেমন, ছোট ভাইদের উপর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের হকও তেমন।

বড় ভাইকে পিতৃসমতুল্য সম্মান ও সেবা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং ছোট ভাইয়ের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করাও বড় ভাইয়ের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। তরুণ-যুবকদেরকে পরম মমতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তারা আবেগ-উচ্ছ্বাসের কারণে অথবা না জেনে ভুল-ক্রটি করলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأمُرْبِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে না এবং সৎকাজে আদেশ দিবে না, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে না, সে ব্যক্তি আমাদের অনুগামী বা দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.pathagar.com

وَسَلَّمَ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهِ اِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ- (ترمذى)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো যুবক কোনো বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের জন্য সম্মান করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার বার্ধক্যের সময় তার সম্মান ও সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করে দিবেন।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ-

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তা'য়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না। (বোখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা দয়ালু, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। পৃথিবীর লোকদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে আকাশ হতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

عَنْ اَنَسٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ-

হযরত আনাস এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, অতএব, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানব সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (শুআবুল ঈমান)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضٰى لاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ-

www.pathagar.com

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কাউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার কোনো অভাব পূরণ করে দেয়, সে আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং যে আমাকে সন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শুআবুল ঈমান)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثُلُثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهٖ كُلِّهٖ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهٗ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তির আবেদন শুনে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭৩ টি ক্ষমা নির্ধারণ করেন। তার মধ্য হতে একটির দ্বারাই তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। অবশিষ্ট ৭২ টি ক্ষমা দ্বারা কিয়ামতের দিন তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (শোআবুল ঈমান)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَاْلَفُ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ-

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন প্রেমময়, প্রেমপূর্ণ পাত্রবিশেষ এবং যে ভালোবাসে না এবং যাকে ভালোবাসা হয় না অর্থাৎ যে অপরকেও ভালোবাসে না এবং তাকেও কেউ ভালোবাসে না, তার মধ্যে কিছু মাত্র মঙ্গল নেই। (আহমদ)

উল্লেখিত হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন, এর প্রত্যেকটি শব্দ স্নেহ, মায়া আর মমতায় পরিপূর্ণ এবং তরুণ-যুবকদের চরিত্রে সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর মতো মূল্যবান উপাদান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার লোকদের লক্ষ্য করে বলছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا-

হে ঈমানদারগণ! তুমি স্বয়ং এবং তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (আল কোরআন)

হযরত লুকমান মহান আল্লাহর দেয়া এই দায়িত্বই পালন করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি। তাঁর এই উপদেশমালা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর তরুণ ও যুব সমাজের জন্য মূল্যবান মুক্তার মালা বিশেষ। যার প্রত্যেকটি দানার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার রাতে পথ দেখানোর মতো শুভ্র আলোকচ্ছটা। নবীজী তরুণ-যুবকদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তিনি তরুণ-যুবকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তরুণ-যুবকদের কল্যাণকামী হওয়া

www.pathagar.com

সম্পর্কে নসিহত করছি, আদেশ দিচ্ছি। তাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে উদারতা দান করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছে তরুণ-যুবক সম্প্রদায়। আর দ্বীনি আন্দোলনে বয়োবৃদ্ধ শ্রেণী বাধার সৃষ্টি করেছে।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসও এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই আন্দোলনে তরুণ-যুবকরাই তৎপর থেকেছে সবথেকে বেশী এবং তারাই ইসলামী আন্দোলন নামক বৃক্ষের গোড়ায় নিজের দেহের তপ্ত রক্ত সিঞ্চন করে এই আন্দোলনকে সতেজ-সজীব রেখেছে। বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। রাসূলের যুগে সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করেও যারা দ্বীনি আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন তরুণ-যুবক। তরুণ-যুবকদের রক্তই হলো ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ।

প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলদের সাথী হয়েছিলেন তরুণ-যুবক শ্রেণী। পবিত্র কোরআনের আসহাবে কাহ্ফ- অর্থাৎ গুহার অধিবাসীদের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলো তরুণ-যুবক। নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য তাঁরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। সূরা কাহ্ফে উল্লেখ করা হয়েছে-

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا-

যখন ক'জন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং তারা বললো, হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো। (সূরা কাহ্ফ-১০)

ইতিহাসে ইসলামের যেসব কুখ্যাত দুশমনদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই হলো বয়োবৃদ্ধ। আবু জাহিল, আবু লাহাব, ওৎবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খালফ্, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, রাবীআ' এসব লোক প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গিয়েছিলো।

আর আল্লাহর নবীর পবিত্র হাতে হাত রেখে যাঁরা নিজেদের তপ্ত রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, তাঁদের বয়স আট থেকে সাঁইত্রিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তরুণ-যুবকদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান-মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তরুণ সাহাবী হযরত জরীর আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর রাসূল কখনো আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে হাসি ফুটে উঠতো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোনো তরুণ-যুবককে আসতে দেখলেই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, স্বাগতম হে যুবক! তুমি তো শুধু যুবকই নও, তুমি যেনো

আল্লাহর রাসূলের চলমান উপদেশ আমার দিকে এগিয়ে আসছো। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেনো তাঁর হাদীসসমূহ মুখস্থ করি এবং আমাদের মজলিসে যেনো যুবকদেরকে স্থান করে দেই।

অথচ বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। যুবকদেরকে সম্মান-মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। অবহেলা আর অবজ্ঞা যেনো তাদের ললাট-লিখনে পরিণত হয়েছে। তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই, তাদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি কোনো কোনো মসজিদেও যুবকদেরকে সামনের কাতারে দাঁড়াতে দেয়া হয় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের কতটা সম্মান-মর্যাদা দিতেন, একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল একটি সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সমাবেশে বসার স্থান ছিলো না। হযরত জারীর ইবনে বাজারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু– বয়সে সবেমাত্র তরুণ। অপূর্ব সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য আগমন করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সম্পর্কে এভাবে প্রশংসা করতেন যে, আমাদের মধ্যে চাঁদ উদিত হয়েছে।

তিনি সমাবেশে বসার স্থান পাননি, এ জন্য একদিকে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দৃষ্টি তাঁর এই তরুণ সাহাবীর প্রতি আটকে গেলো। সৃষ্টিসমূহের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহর কাছে যাঁর সম্মান-মর্যাদা সবথেকে বেশী, সেই মহামানব সাধারণ একজন তরুণকে কত সম্মান-মর্যাদা দিলেন। তিনি বক্তৃতা থামিয়ে নিজের পবিত্র চাদর কাঁধ মোবারক থেকে নামিয়ে তরুণ সাহাবী হযরত জারীরের দিকে ছুড়ে দিলেন আর বললেন– জারীর! তুমি দাঁড়িয়ে কেনো, আমার চাদরের ওপর বসো।

হযরত জারীর দুই হাত বাড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের চাদর নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বার বার সেই পবিত্র চাদরে চুমু দিতে লাগলেন। সুন্দর চোখ দুটো আনন্দ অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। কাঁদতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন– আকরামা কাল্লাহু, কামা আকরাম তানি ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সম্মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আপনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন। আপনার চাদরে বসতে পারে এমন কি কেউ পৃথিবীতে আছে!

তরুণ-আর যুবকদের ত্যাগের বিনিময়েই এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তাওহীদের আওয়াজ পৌঁছেছে। অথচ বর্তমানে সেই মুসলিম তরুণ-যুবকদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ ছোঁয়াটুকুও বিদায় করে দেয়ার জন্য ধর্মনিরপেক্ষবাদী গোষ্ঠী যেনো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, পূজা-পার্বনের পদ্ধতিতে বেদীতে ফুল দেয়া, কোনো অনুষ্ঠান উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালানো, মৃত ব্যক্তির মূর্তি বানিয়ে বা তার ছবির সামনে ফুল দেয়া, মৃতদেহকে ফুলে ফুলে সাজানো এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মোমবাতি

www.pathagar.com

জ্বালানোর সংস্কৃতি চালু করেছে ধর্মনিরপেক্ষ মহল। অমুসলিমদের সংস্কৃতিতে মুসলিম তরুণ-যুবকদেরকে অভ্যস্থ করে তোলার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা।

অথচ এই তরুণ-যুবকরাই তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বয়সে যুবক- তিনিই মূর্তি ভাঙ্গার সংস্কৃতি চালু করলেন। কিন্তু তাঁর সন্তানদের দ্বারাই একশ্রেণীর বয়োবৃদ্ধ লোকজন মূর্তি সংস্কৃতি চালু করছে। তরুণ-যুবকদের এমন সভ্যতার দিকে সুকৌশলে এগিয়ে দিচ্ছে যে, তারা নিজের অজান্তেই তাওহীদের সীমারেখা অতিক্রম করে শিরকের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) দুঃখ করে বলেছেন .

ان کو تہذب نے ہر بند سے ازاد کیا

لا کے کعبے سے صنم خانے میں ابلد کیا

উন কো তাহজীব নে হার বন্দ ছে আযাদ কিয়া

লা কে কা'বে ছে সনম খানে মেঁ আবাদ কিয়া।

তাদের ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতি মুসলমানদেরকে ইসলামের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কা'বা ঘর থেকে বের করে এনে এদেরকে দিয়েই মূর্তির ঘরসমূহ আবাদ করা হচ্ছে।

হযরত লূকমানের উপদেশ মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এতই ব্যাপক যে, সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, অসীম শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত মানবমন্ডলীর তরুণ-যুবসমাজের জন্য একান্ত অনুসরণীয় করে দিয়েছেন। হযরত লূকমানের কথাগুলো যেন ছোট্ট একটি ঝিনুকের মধ্যে এক মহাসমুদ্র লুকায়িত থাকার মতো।

এ কথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তরুণ ও যুবক বয়সে মানুষ যে চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যে অভ্যাস রপ্ত করে, তা-ই পরবর্তী জীবনে অনুসরণ করে। এ কারণেই হযরত লূকমান এই উপদেশের মাধ্যমে তাঁর তরুণ সন্তানের জীবনের ভিত্তি গড়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেনো তার পরবর্তী জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গুণ, বৈশিষ্টসম্পন্ন এক সফল মানুষ হিসেবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে আখিরাতের জীবনেও কল্যাণ লাভ করতে পারে।

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ যেসব বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হয়েছে, এর মধ্যে একমাত্র ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য জীবন বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো, অপরাধ সংঘটিত হবার পর তার শাস্তি বিধান করা। সেই সাথে এসব বিধান মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়ার যাবতীয় পথও উন্মুক্ত করে দেয়। অপরাধ সংঘটিত হবার পূর্বে অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার মতো কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। কিন্তু একমাত্র ব্যতীক্রমধর্মী মহান আদর্শ হলো ইসলাম, যে যে ছিদ্র পথে অপরাধ অনুপ্রবেশ করতে

www.pathagar.com

পারে ও করার সুযোগ পায়, তার প্রত্যেকটিই বন্ধ করে দেয়ার বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলাম। মানুষের অভ্যন্তরে যে অপরাধ প্রবৃত্তি রয়েছে, তা দমন করে রাখার মতো অনুকূল পরিবেশও ইসলাম মানুষের জন্য সৃষ্টি করে। এরপরও যদি কোনো মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়, তার শাস্তি-বিধানও করে। ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার ওপর অথবা তার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করে দেয়ার ওপর।

সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পাবার কারণে অথবা ভ্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তরুণ ও যুবসমাজের দ্বারাই সর্বাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। তরুণ ও যুবকদেরকে আখিরাত ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বোত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষে পরিণত করা যায় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তরুণ-যুবকদের দ্বারাই তিনি ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হযরত লূকমানও তাঁর সন্তানকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদালতে আখিরাতে সরিষা দানার থেকেও ক্ষুদ্র কিছু– কোনো মানুষের দ্বারা সংঘটিত হলে তা বের করে নিয়ে আসবেন।'

এই উপদেশের মাধ্যমে তিনি তরুণ-যুবকদের হৃদয়ে আখিরাতের ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তরুণ-যুবকরা যেনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে এবং নিজেদের চিন্তা-চেতনার জগতকে অপরাধ-কল্পনা থেকে মুক্ত রাখে, সেদিকে ইশারা করেই নিজের সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সবকিছুই অবগত আছেন।'

ইসলামের পরিপূর্ণ বিধান এই পৃথিবীর কোনো একটি মুসলিম দেশেও বাস্তবায়িত নেই। মাত্র কয়েকটি দেশে ইসলামের কিছু কিছু বিধি-বিধান চালু রয়েছে। এসব দেশের অপরাধ চিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয়, সে তুলনায় এসব দেশে এক মাসেও সে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয় না।

এর কারণ হলো, ইসলামের যে সামান্য প্রভাব এখন পর্যন্ত মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের ওপরে কার্যকর রয়েছে, তা তাদেরকে অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হযরত লূকমানের ন্যায় সন্তান-সন্ততিকে কোরআনের বিধান অনুযায়ী গড়ার মন-মানসিকতা দান করুন এবং তরুণ-যুবকদেরও কোরআনের রঙে নিজেদের রঙিন করে সমাজ ও জাতি গঠনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

সহায়িকা গ্রন্থপঞ্জি

١- تفسير الجامع الاحكام القران
٢- تفسير جامع البيان
٣- تفسير درالمنثور
٤- تفسير فتح القدير
٥- تفسير قرطبى
٦- تفهيم القران
٧- فى ظلال القران
٨- تفسير ابن كثير
٩- تفسير روح المعان
١٠- تفسير روح البيان
١١- تفسير البغوى
١٢- تفسير الفخر الرازى
١٣- تفسير الطبرى
١٤- بخارى
١٥- مسلم
١٦- ابوداؤد
١٧- ترمذى
١٨- ابن ماجه
١٩- نسائ
٢٠- البيهقى
٢١- رياض الصالحين
٢٢- طبرانى
٢٣- مسند احمد
٢٤- الرض القران
٢٥- زاد المعاد
٢٦ - حسن معاشرت
٢٧- الحلال والحرام فى الاسلام
٢٨- تفهيمات حصّه اول اور حصّه دوم

29. Siratun-Nababiya by Abul Hasan Ali Nadvee.
30. Siratun-Nabee by Allama Shibli Noomani.
31. Al-Zihad by Allama Moududee.
32. Sirat-A-Sarwar-e-Alam by Allama Moududee.
33. The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal.
34. Encyclopeadia of Religion and Ethics
35. Al-Quran the Ultimate Miracle by Ahmed Deedat.
36. The Expanding Universe by John Gribbin.
36. Stars and Planets by Ian Ridpath.
37. History of the Arabs by Phlip K. Hitty
38. Emotion as the Basis of Civilization
39. The oldest code of Law
40. Space Time Physics-Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler.
41. Light Upon Light by Ferdous Khan.
42. Nature, Spirituality and Science by Sukhraj Tarneja.
43. Dawn of A New Era by Sir Barnard Lovell.
44. The Study of The Physical World-Cheronis, Parsons & Ronneberg.
45. The Story of our Earth by Richard Carrington.
46. The Stars by Roger Hall.
47. The Solar Family by Peter Francis.
48. The Origin of Man by Dr. Maurice Bucaile.
49. Astronomy The Cosmic Journey by W. k. Hartman.
50. Biological Science by D. E. Meyer and R. Buchanan.
51. Medical Embryology for Medical colleges.
52. The Creation of the Universe by G. Gamow.
53. The Life and Death of Stars by Geoffery Bath.
54. The Framework of the Stars by Nigel Henbest.
55. To the Edge of Eternity by John Gribbin.
56. A Brief History of Time by Stephen Hawking.
57. Galaxies and Quasars by William J. Kaufmann.

www.pathagar.com

তাফসীরে সাঈদী

تفسير سعيدى

সূরা লুক্‌মান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com